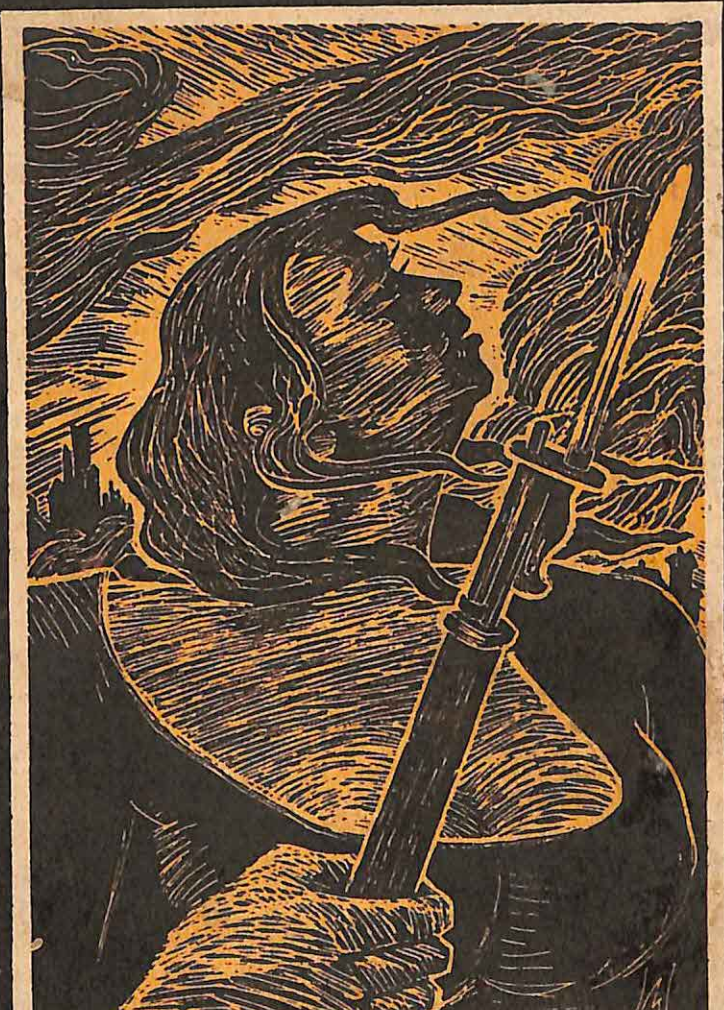
ঝড়



ইলিয়া এরেনবুর্গ

ইলিয়া এরেনবুর্গ

ঝড়

(চতুর্থ ভাগ)

স্তালিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
The Storm এর বাংলা অনুবাদ—

অনুবাদঃ **অশোক গুহ**

ভারতী লাইব্রেরী
১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সাহা
১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর—
শ্রীদুর্গাপদ দাশগুপ্ত
ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টার্স এণ্ড ষ্টেশনার্স লিঃ
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন,
কলিকাতা—৫

মূল্য—তিন টাকা

এক

এক বার্চবনে সেনাবাহিনীর সদরঘাঁটি। পাখীরা গান গাইছে, চারিদিকে ব্লুবেল ফুলের সমারোহ। খাতগুলিতে বেশ আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, কর্ণেল গেবলার একটা লেখার টেবিল আর বইয়ের তাকও পেয়েছেন।

কর্ণেলের মন বিষণ্ণ। রিক্‌টার একটি কথাও না বলে খামখানা তাঁর হাতে দিলে, তিনি হাত পেতে নিলেন।

রিক্‌টার জুতোয় জুতো ঠুকে সামরিক কেতায় কুর্ণিস করে দরজার দিকে চলে যাচ্ছিল। কর্ণেল তাকে থামালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটু দাঁড়ান! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

ভাল আছেন। ধন্যবাদ হের্ কর্ণেল, কাল আমি তার চিঠি পেয়েছি।

আপনি তাঁকে লিখে জানাবেন তিনি যেন বার্লিন ছেড়ে চলে যান। আমার পরিবার ঠিক সময়ে ছেড়ে চলে গেছে। আপনি আমাকে যে বাড়ীখানা তৈরী করে দিয়েছিলেন, সেখানা আর নেই। একেবারে সোজাসুজি আঘাত আর কি।…

কর্ণেলকে সান্ত্বনা দেওয়া ঠিক হবে কিনা রিক্‌টার বুঝতে পারলো না। সে বললে,

এই বর্বর বিমান আক্রমণ সত্যই ভয়ঙ্কর, যদি আমাকে অনুমতি দেন তো বলি, আমাদের জয়লাভের পর আপনার জন্যে আমি অমনি আর এক-খানা বাড়ী তৈরী করে দেব। স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আমার কতগুলি নতুন মত আছে, আমি সেগুলি কাজে খাটিয়ে দেখতে চাই……

রিক্‌টার চলে যেতে কর্ণেল হাসলেন,—বিষণ্ণ সে হাসি, মুখবিকৃতিরই নামান্তর। আমাদের জয়লাভের পর…… ওরা পরিস্থিতি যে কি তা বোঝে

না। একটা বোমা পড়ে তাঁর বাড়ীখানা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে গেবলারের এই বিষণ্ণতা দেখা দেয় নি। হাঁ, এই বাড়ী তৈরী আর তা সাজানো-গোছানোর ব্যাপারে তিনি তাঁর আত্মা যেন এর ভিতরে আরোপ করেছিলেন ; প্রতিটি খুঁটিনাটিও তাঁর নজর এড়ায়নি ; কিন্তু বর্তমানে তো তাঁর মন আগত অভিযানের ভাবনায় বিভোর। এবার আমাদের তোড়জোড় আগের চেয়ে ভালো, আক্রমণের পরিধিও সংকীর্ণ,·· তবু সফল হব কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বইকি! গত দু' বছর ধরে তো ভুলের পর ভুলই হয়ে আসছে···এমন কি রিকৃটারের মতো একজন শিক্ষিত মানুষও বর্ষপঞ্জীর জাদুতে বিশ্বাসী; ওরা মনে করে আমরা বছরকে দুভাগ করে দিয়েছি—শীত লালঝাণ্ডাওয়ালাদের, আর গ্রীষ্ম আমাদের। কিন্তু এই মোহ তবু আমাদের জীইয়ে রাখতে হচ্ছে, মানুষ নিরাশ হয়ে পড়ছে। বাড়ী থেকে বিমান হামলার খবর আসছে চিঠিতে চিঠিতে, সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, মিত্রশক্তি কি করবে। সবাই শ্রান্ত—কয়েকদিন পরেই তো পূরবে চার বছর······আগে যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছি আমরা, আর এখন ঢেউয়ে ভেসে চলেছি।

সন্ধ্যায় কর্ণেল গোয়েন্দা দপ্তরের মেজর হিল্ডেব্রাণ্ডের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। গেবলার সোজাসুজি তাকে প্রশ্ন করে বসলেন, অভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

ভালই! আমার মতে এই অভিযানের ফলে আমাদের আর পশ্চাদাপসরণ করতে হবে না।

কর্ণেল আর মেজর ছেলেবেলা থেকেই দুজনে দুজনের কাছে পরিচিত, একসঙ্গে তাঁরা স্কুলেও পড়েছেন। কর্ণেল তাই তার মতামত খোলাখুলি ভাবেই জানালেন।

আমি তো সেটুকু আশা করতেও পাচ্ছিনা, সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, আগে আমাদের সৈন্যেরা যা ছিল, এখন আর তা নেই। ·· আমরা সেরা

মানুষদের হারিয়েছি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে নীতিবোধ আগে ছিল, এখন আর তা নেই। গত শীতটাই সাংঘাতিক গেছে। আমি নিজেই ভাবি, সেনাবাহিনী এর জন্য দোষী নয়, শুধু আনাড়ি রাজ-নীতিজ্ঞের দল নাক ঢুকিয়ে এমনি ব্যাপার ঘটিয়েছে। হাঁ, তোমার কথা সত্য। কিন্তু তবুও, এ আমাদেরই দোষ। গোয়েন্দা দপ্তর যে ভাবে কাজ করছে, তাও একেবারে বিরক্তিকর।

তুমি কি মনে কর, আমরা রাশিয়ার সংরক্ষিত সৈন্যদলের খবর রাখি না? স্টারি অস্কল-এ যখন ছিলাম, তখনই তো তোমাকে লালঝাণ্ডাওয়ালাদের পরিকল্পনার কথা বলেছি; তখন তো সবে আমরা সেখানে বদলি হয়ে গেছি···তখনই আমরা জানতাম: রুশেরা পূবে আর উত্তরে সৈন্য জড়ো করছে। জেনারেল গ্রীম্‌কে এ খবর আমি দিই, কিন্তু দিয়েই বুঝতে পারি, আমার বলায় কিছুই হবেনা···অবশ্য, রুশদের ঐ পল্টনগুলো না থাকলেই ভাল হোত···জেনারেল গ্রীম্ ঠিক করলেন, লেফটনেণ্ট জেনারেল ফন্ সালমুথকে চোটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আর ফন সালমুথও লালঝাণ্ডাওয়ালারা বিরাট সৈন্যসমাবেশ করেছে এই বিবরণ জানিয়ে ফ্যুরারের অপ্রিয় হতে রাজী নন্, তিনি রিটারক্রুজ সামরিক-সম্মানের বদলে ভর্ৎসনা শুনতে চান না। তাছাড়া, তাঁর নাম শুনলেই ফ্যুরারের মনে এমন অনেক অপ্রিয় স্মৃতি ঘনিয়ে আসবে যাতে··· যাহোক, আমরা পরস্পরকে ঠকাচ্ছি, আর রুশরা তারই সুযোগ নিচ্ছে। এতো অতি সহজ ব্যাপার। তুমি না আসন্ন অভিযানের কথা বলছিলে···কাল জেনারেল গ্রিম্ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর কাছে বিবরণ পেশ করি, তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, এসব তেমন জরুরী ব্যাপার নয়। ঝঞ্ঝাবাহিনী ডানদিকে আমাদের সহযোগিতা করবে···আমি তাঁকে জানাই যে, লালঝাণ্ডাওয়ালাদের কাছে আছে আপনা থেকে চলে এমনি কামান। আমার কর্তব্য আমি করেছি। আমি না বললেও তিনি

ঝঞ্ঝাবাহিনীর কথা জানতেন। কিন্তু আমার কথা তিনি শেষ করতে দিলেন না ··· জানো, কেন আমরা হেরে যাচ্ছি? তার কারণ, আমরা বড় সহজে জিতেছিলাম। এই হিতোপদেশটি পৃথিবীর বহু পুরানো।

এবার অন্তত আমাদের সেনারা সংখ্যায় বেশী হবে বলেই মনে হয়। জেনারেল তো বললেন, পশ্চিম থেকে বহু সৈন্য সরিয়ে আনা হয়েছে বটে!

খবর পেয়েছি, ফ্রান্সে এবছর কিছু হবেনা।

তবু এখনো ভয় আছে···দুই রণাঙ্গনে আমরা যুদ্ধ চালাতে পারবনা। রিবেনট্রপের মতো একটা বাজে লোকের হাতে কূটরাজনীতির ভার দেওয়াটাই ভুল হয়ে গেছে।··· আর লালঝাণ্ডাওয়ালাদের সঙ্গে এখন একটা বোঝাপড়া করতে যাওয়াও মুশকিল। আমরা এখানে যে নীতি চালিয়েছি তাতে ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ক্ষেপে গেছে। আমাদের কূট-রাজনীতিবিদের দল যদি আলাদা ধরণের হতেন, তাহলে পাশ্চাত্যের শক্তিগুলির সঙ্গে আমরা একটা চুক্তি করতে পারতাম···অবশ্য সেখানেও ঐ একই কথা— যদি আমরা আমাদের কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সরিয়ে দিতে পারতাম— ওরা তো মূর্তিমান অসঙ্গতি।···

মেজর হিল্ডেব্রাণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি করা উচিত?

যা করছি তাই...অন্য উপায় নেই। অন্যের ভুলের জবাবদিহি করতে হবে আমাদের ··· সেনাবাহিনীর উপর আমার বিশ্বাস আছে, জার্মানীর এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান; আর করতে হবে চেষ্টা—সে জয়লাভের না হোক, টিকে থাকার তো বটেই। তাতেই আমাদের দেশ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবে। ঐতিহাসিকরা হয়তো আসন্ন অভিযানকে কার্স্ক-এর যুদ্ধ বলবেন না, বলবেন জার্মানীকে বাঁচাবার যুদ্ধ ···রিক্‌টার গেবলারের মনের কথা টেরও পায়নি, সে ভেবেছিল, কর্ণেলের আজ মনটা ভার আর তাঁর বাড়ীর খবর শুনেই তা' হয়েছে। রিক্‌টার নিজেও পলটনে তাই মনমরা হয়ে ফিরে এল। হিল্ডাকে সে কয়েকবার লিখেছে,

সে গিয়ে কিছুদিন তার বোন জোহানার ওখানে হাৎ´স-এ থাকুক, কিন্তু হিল্ডা জবাব দিয়েছে যে, বিমান-হানার খবরটা অতিরঞ্জন ছাড়া কিছুই নয়। আরো লিখেছে, ওখানে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব, তোমার জন্য আমার ভাবনার অন্ত নেই। এখানে প্রতিটি ছোটখাটো জিনিস আমার মনে ফিরিয়ে আনে শান্তি·····চিঠি পেয়ে রিক্‌টার অভিভূত হয়ে পড়লো, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হোল, হিল্ডা তার সঙ্গে প্রতারণা করছে, এটাতো স্পষ্ট কথা যে, বিমান-হানা দিন দিন বাড়ছে। এখনো সে যদি বার্লিন ছাড়তে রাজি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে এক নাগর জুটিয়েছে। বিমান-হানার সময়েও ঐ মেয়ে মানুষটা প্রেম করতে পারে! ··· রিক্‌টার ঠিক করলো হিল্ডাকে একখানা কড়া চিঠি লিখবে: তাকে এখনি চলে যেতে হবে হাৎ´স-এ। যেই চিঠি লিখতে বসেছে, অমনি আরশুলা এসে হাজির।

কর্ণেলের সঙ্গে কিছু কথা হোল?

এই সামান্যই, তিনি বললেন, তাঁর হিলোনসীর বাড়ীখানা চুরমার হয়ে গেছে।

আরশুলা গাল দিলে:

বেজন্মার দল! ওরা নিরস্ত্র মানুষকে মারছে··· আমার গিন্নি তো কোন রকমে হামবুর্গ থেকে পালিয়ে এসেছে। যা বল ভাই, এ তো যুদ্ধ নয়, নরক গুলজার···আর দু-এক দিনের ভিতরে এখানেও একটা কিছু শুরু হয়ে যাবে এটাও সত্যি। কর্ণেল তোমাকে একটু ইঙ্গিতও দেন নি?

না, তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন···

কি নিয়ে ব্যস্ত জান···আমার কি মনে হয় জান, আমাদের তরফ থেকেই শুরু করতে হবে···লালঝাণ্ডাওয়ালারাও তোড়জোড় করছে··এখন জিততে পারলে হয়। ···এখন যদি ওদের সাবড়ে দিতে না পারি, তাহলে শীতে তো আবার লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে···

রিক্‌টার আরশুলার দিকে তাকিয়ে ভাবলে·· আরশুলার মত লোকও

তাহলে গাড্ডায় পড়েছে। ব্রেষ্টের কাছে চল্লিশজন রুশবন্দীকে সে কিভাবে হত্যা করেছিল, সেকথা আর বড়াই করে বলেনা, মেয়েদের পিছনেও আর ধাওয়া করেনা, মাঝে মাঝে নিজের স্ত্রীর কথা বলে ; গিন্নি বলে ডাকে, লড়াইয়ের উপর বিরক্তি ধরে গেছে বলে গজরায়, আর খালি বলে—এ এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বুড়িয়েও সে গেছে—উনত্রিশ তার বয়েস, কিন্তু দেখতে মনে হয় যেন চল্লিশ···

আরশুলা বললে, যুদ্ধের শুরুতে যে সব তাগড়াই ছোকরারা এসেছিল, অমনি ছোকরারা এলে তবু মনটা একটু খুশি হোত। কিন্তু কিসব রদ্দি মাল পাঠিয়েছে ভাই ! কারে বা হাঁপানি, কেউবা বাদুড়ের মতো কানা—আর এক-একটা তো মুখসর্বস্ব ভয়-কাতুরে—এতদিন ভিয়েনায় কোন্ এক কোটরে লুকিয়ে ছিল। এখন সব ধরে ধরে চালান করছে। আমি তো এখন টাইগারের উপর নির্ভর করে বসে আছি। ওগুলো খাঁটি যন্ত্র, ওরাই আমাদের বাঁচাবে···জোর কামানের গোলার ভিতরেও নাকি ওরা টিকে থাকতে পারে··হয়তো টাইগারই আমাদের বাঁচাবে···যাই-ই হোক আমরা সংস্কৃতিবান জাতি, আমরা যুদ্ধ ভালবাসি নে—ওসব ইভানদের ব্যাপার। ওদের আমরা শুধু যন্ত্র দিয়েই হারাতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কতগুলি টাইগার আমাদের আছে ?

রিকটারের আরশুলার জন্য দুঃখ হোল, সে উত্তর দিলে,

কর্ণেল তো বললেন, আমাদের বহু যন্ত্র আছে।

আরশুলাকে একথা সান্ত্বনা দিতে পারল না। সে যে মরতে পারে একথা আগে কখনো ভাবেনি, বরং মৃত্যুর ভাবনাকেও সে ভীরুতা বলে ভাবতো; কিন্তু এখন সে মনে মনে ভাবলে, আমার ভয় হচ্ছে হয়তো এর থেকে আর মুক্তি নেই। চারদিকে বন, সূর্যাস্তের সোনায় সোনালি। যে শহরে সে জন্মেছে, সেখানকার বনের কথা তার মনে পড়লো। পাইন-গাছ—আর আছে পাইনের কুঁড়ি, গালচের মতো পড়ে আছে ; বড় বড়

হল্‌দে শামুক ; এখানে-ওখানে-সবুজ রং-করা বেঞ্চিগুলি। বিষাদে তার মন ছেয়ে গেল—এ বিষাদ তো ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। সে তার 'গিন্নি'কে চিঠি লিখতে বসলো, কিন্তু কলমটা রেখে দিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল : কেন আমি মরব? পৃথিবীতে মানুষের কি এত ভীড় যে মানুষ পরস্পরকে হত্যা করবে? ···সে কলম তুলে নিয়ে আবার লিখতে লাগলো : আমার অনুরোধ, আমার টাকাকড়ি আর ঘড়িটা আমার স্ত্রী ফ্রাউ আনাক্রনকে যেন পাঠানো হয়। তার নিবাস লিমারউইজ-এ। তার কাছে যেন লেখা হয়, আমি প্রকৃত খৃষ্টানের মতোই মরেছি। আমি আমার প্রিয়তমা পত্নীকে অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি যেন আমাদের সন্তানদের এমনভাবে লালন-পালন করেন, যাতে তারা তাদের পিতার স্মৃতি ও ধর্মকে হৃদয়ে জাগরুক রাখে। আরগুলা দশবছরের ভিতরে একবারও গীর্জায় যায়নি, সে নিজেও বুঝতে পারলেনা, হঠাৎ সে কেন ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠলো। হয়তো, সে তার 'গিন্নী'কে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই তা করলো। সে নিজে তো বলতো, তার স্ত্রীর গায়ে ধূপ-ধুনার গন্ধ লেগে আছে। নয়তো তার মনে এল সন্দেহ —যদি বিনা কারণে কেউ মরতে বসে, তখন তো তার কাছে ভগবানের অস্তিত্ব থাকবেই···খামের উপর সে লিখলে, 'আমার মৃত্যুর পর যেন খোলা হয়'।

রিক্‌টারও হিল্ডাকে অনুরোধ করে লিখলে, সে যেন বার্লিন ছেড়ে চলে যায়। একটু শাসালোও।

যদি কারো সঙ্গে এর মধ্যে তোমার প্রেম হয়ে থাকে, আমি মরে যাব, একথা মনেও ভেবোনা, আমি আছি ঢের পিছনে, শীগ্‌গিরই ছুটি পাব, তারপর নিজের প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লিখলে, আমি ঘুমুতে পার্চ্ছিনা, আমার মনে এক অশুভ চিন্তা, আজ রাতে বুঝি বার্লিনে বিমান-হানা হবে···

চিঠিতে তারিখ দিতে গিয়ে সে মারাবুকে জিজ্ঞেস করলে, আজ

কত তারিখ ?

৪ঠা। ঠিক একবছর আগে দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের অভিযান শুরু হয়েছিল। আমার ডায়েরীতে এইমাত্র দেখলাম—পাঁচই জুলাই সে তারিখ। আমর তখন ঝাতস্কে। সেইটাই ছিল সবচেয়ে সেরা যুদ্ধ—সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল…আমাদের সেনাবাহিনী কারকভ থেকে ককেশাস পর্যন্ত একেবারে না থেমে এগিয়ে গেল।

রিক্‌টার বিদ্রূপের হাসি হাসলো,

তারপরে, না থেমে ছুটলো ককেশাস থেকে কারকভ। তুমি এমনি ছুটে হাঁপিয়ে ওঠনি ?

রিক্‌টার, এসব নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়…

আমি ঠাট্টা করছি না। এই নাচনে আমার ভাইকে হারিয়েছি।

রিক্‌টার, আমরা বহু লোক হারিয়েছি। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জান, জার্মান বাহিনী যেন অশরীরী বাহিনী। এখন শুধু বেঁচে আছে ভীরু আর ভণ্ডের দল। কর্ণেল গেবলার তো এক বুদ্ধিজীবী ক্লীব—নিজের পেশা হিসেবেই সে লড়ছে।

রিক্‌টার চটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে,

তুমি কেন লড়ছ, সেকথা জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে ?

আমি ?…আমি ফ্যুরারে বিশ্বাসী। গত শীতে শোচনীয় পরিণাম এসেছিল আমাদের—আমরা বড় বেশী জয়ের নেশা আর মেয়ে নিয়ে মেতে উঠেছিলাম, কেমন যেন কোমল হয়ে পড়েছিলাম—মনে হচ্ছিল আমরা যেন ঘরে স্থিতু হয়েছি—তখন লালঝাণ্ডাওয়ালাদের সঙ্গে ভাই-বেরাদরিভাবও দেখা-দিয়েছিল। রেজেভ-এ তুমি রুশদের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেমন খেলা করতে, ভাব জমাতে সেকথা আমার মনে আছে…

তাতে অন্যায়টা দেখলে কোথায় ? দস্যুদের ফাঁসি লটকানোই রীতি, কিন্তু বে-সামরিক অধিবাসীদের সঙ্গে তো আর আমরা লড়ছিনা।

এখানে বে-সামরিক কেউ নেই। কথাটাই এখন অচল।

মারাবু একটা ফুল তুললে।

এটা কি ফুল বলতো?

ডেইজি নিশ্চয়ই।···

ঠিকই বলেছ। এই ফুল যেখানে-সেখানে হয়, গোয়ালার মেয়েরা পর্যন্ত একে দেখে তারিফ করে। এডেলউইস যে ফ্যুরারের ফুল সেটা হঠাৎ হয়নি। ও ফুল তুলতে পাহাড়ে উঠতে হবে ...।

রিক্‌টার জোরে হাই তুললো।···

তোমার কবিতার জ্বালায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছি মারাবু আমি তোমার ডেইজিও চাইনা, এডেলউসও চাইনা। আমি চান করে, ড্রেসিং গাউন পরে কাউচে গা এলিয়ে দিতে চাই। রুশ কামানের শব্দ চাইনা, চাইনা ঐতিহাসিক অভিযান, এমন কি তোমাদেরও চাইনা। বুঝেছ?···

সেদিন সন্ধ্যায় আরশুলা পড়লে সামরিক বিজ্ঞপ্তি। আর তাকে চেনা যায়না, তার বিষণ্ণতা মিলিয়ে গেছে, সে গোঁফে তা দিতে দিতে বেশ খুশি হয়েই বললে, এবার আমরা সত্যিই তৈরি হয়েছি। এবার রুশদের আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের সামরিক পদ্ধতি কাকে বলে। 'টাইগার'ই এসপার-ওসপার যা হয় করবে।

পরদিন সকালে শুরু হয়ে গেল। বার্চবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেল কামান আর মর্টারের গোলা। প্রথমে বেরুলো ট্যাঙ্কের সার। কয়েক ঘণ্টার জন্য রিক্‌টারও যেন খুসি হয়ে উঠলো। সবকিছুই আবার তাকে মনে করিয়ে দিল বিজয়ীর সেই জ্বরের ঘোর। চার কিলোমিটার তারা এগিয়ে গেল। কিন্তু কে জানতো রুশরা তখনো ট্রেঞ্চে টিকে থাকবে?···

পরে রিক্‌টারের মনে হোল খণ্ডযুদ্ধ হোক, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সে লড়েনি। কিন্তু শীতের প্রথম অভিযানে সে ছিল, কান্তোরানায়ার

যুদ্ধে সেও পালিয়ে এসেছিল, ইভানদের কামানের গোলার স্বাদ সেও পেয়েছে। তবু এতো তার চেয়েও ভয়ানক। এমন এক মুহূর্ত এল, যখন ভয়াবহতা সবকিছু ছাপিয়ে উঠলো। একটা রুশ মারাবুর দিকে টমিগানের বাট উঁচিয়ে এল। রিকৃটার ভয়ে পালাল। সে নিজেই জানেনা কি করে সে বাঁচলো।

হতাহতের সংখ্যা গোনা হোল, সেতো হতাশাজনকই ব্যাপার। এই একফালি একটু জায়গার জন্যে তারা দিয়েছে বড়বেশী মূল্য···আরগুলা নিজেকে আর সঙ্গীদের চাঙা করে তুলতে চাইল। এই সবে শুরু কিনা তাই একটু শক্তপাল্লায়ই পড়া গেছলো। রুশদের এমন প্রতিরোধ করবার শক্তি আর কোথাও হবেনা···

রিকৃটার ভাবছিল মারাবুর কথা। সত্যিই ভাবতে ভয়ানক মনে হয়। ওর মৃত্যুর আগে রিকৃটার কিনা দুর্ব্যবহার করলো!···হাঁ, মাঝে মাঝে ওকে সহ্য করা যেতনা এও ঠিক, কিন্তু তবু ওর ছিল আদর্শ। তাছাড়া পুরানো সাথী-লড়াইএর প্রথম থেকেই একসঙ্গে ছিল।···দর্শন, কবিতা আর শিল্প নিয়ে আলাপ-আলোচনার কথাও তার মনে পড়লো। মারাবুর মতামত ছিল অদ্ভুত; সে বলতো, য়ুরোপ দখল করবার পর জার্মানরা থাকবে মধ্যযুগের যোদ্ধাদের মতো তাদের সুরক্ষিত দুর্গ-প্রাসাদে, স্থপতি গড়ার এক নতুন ভঙ্গী বার করবেন—সে ভঙ্গী প্রকৃতির উপর মানুষের বিজয় ঘোষণা করবে। কিন্তু সেও আজ অশিক্ষিত উন্মাদদের আঘাতে মৃত··· এযেন পশুশক্তির সঙ্গে চিন্তাশক্তির এক চরম সংঘাত···

পরদিন ওরা আরো তিন কিলোমিটার এগিয়ে গেল। তৃতীয় দিনে দু'বার অক্রমণেরও চেষ্টা করলো। একটা ছোট্ট পাহাড়ের কাছে এল, আবার সেখান থেকে ওদের ছুঁড়ে ফেলা হোলো নীচে। আরগুলার তখনও টাইগারের উপর আশা, চতুর্থ দিনে সে আশার ভিৎ নড়ে গেল। সে দেখলো একখানা টাইগারের বর্ম বিদ্ধ হয়েছে। পাজিগুলো থার্মাইট গোলা

ব্যবহার করছে।

এখনো কাঁপছে মাটি, তবু সবারই মনে ধারণা, লড়াই থেমে গেছে। সবাই ক্লান্ত, আপন মনে ভাবছে গোল্লায় যাক কার্স্ক···ট্রেঞ্চের গর্ত যেন এক আরামের নীড়। কামানের গর্জন আর বর্ষণের মাঝে মাঝে বিরতি। সেই বিরতি ভরে উঠেছে ভাবালুতায়। এমনি এক বিরতির সময় আরশুলা কোকিলের স্বর শুনতে পেল। কোকিলটাও বুঝি ক্ষেপে গেছে। এই ছিন্নভিন্ন বনে কি করে সে আছে? আরশুলা এবার মৃত্যুর দিন গুনতে লাগলো। কোকিলও ডাকছে, তার শোকার্ত ধ্বনিতে ভরে উঠেছে বনভূমি।

হটাৎ রিকৃটার হেসে উঠলো।

আরশুলা জিজ্ঞেস করলে, কি হোল তোমার?

শোন। যুদ্ধের আগে এক কর্ণেল বলেছিল, যুদ্ধ না করেই আমরা রাশিয়ার ভিতর এগিয়ে যাব। সেটা নাকি হবে অর্ধ শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ—এখন একবার ভাব তো কথাটা, খাঁটি তামাসা নয় কি?

তার উপরওয়ালারা যা বলেন, তাতে আরশুলা হাসেনা। এ তার শিক্ষা, অভ্যাস। সে তাই গম্ভীর স্বরে বললে,

দেখ, ভবিষ্যৎ তো আর দেখা যায়না, অমনি করেই বলতে হয়।··· তবু আমরা তো রাশিয়ার ভিতরে ঢূকে পড়েছি। ভাবতো, জার্মানীর বুকে এমনি লড়াই চললে তার কি দশা হোত?···কাল একখানা কাগজে পড়ছিলাম এইযে এতগুলো অঞ্চল আমরা দখল করেছি, এর মানে হচ্ছে জার্মানীকে আমরা আক্রমণ থেকে বাঁচাচ্ছি। কথাটা ঠিক। আমরা কার্স্ক দখল করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে—ইভানদের আর নড়তে-চড়তে হবেনা। আমরা ওদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছি।

কিন্তু তবুও আরশুলাও আর সবার মতোই উদ্‌বিগ্ন, অস্থির। ধর, রুশরা যদি পাল্‌টা অক্রমণ করে? কি হবে তখন?

আর সত্যিই রুশরা এগারোই জুলাই সকালে আক্রমণ করলো। প্রচণ্ড বেগে গোলা বর্ষণ শুরু হোল। সবাই রুশদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল তবু কয়েকঘণ্টা কাটলো দারুণ অস্বস্তিতে। পরে রুশরা থেমে গেল।

আরশুলা রিকৃটারকে অভিনন্দন জানিয়ে বললে,

দেখছ তো, ওরা তেড়ে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কেমন ঘা-টি খেয়েছে! এতে মনে হয়, গ্রীষ্মটা ভালই যাবে। রুশরা মিত্রশক্তির অপেক্ষায় বসে অছে। কিন্তু আমরা তো সবকিছুর জন্য তৈরী—তা কি এখানে, কি ওখানে···

কর্ণেল গেবলারও সপ্তাহের ভয়ঙ্কর ধকলের পরে একটু শান্ত হয়েছেন। পেসেন্স খেলতে তিনি বসে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ওরা আমাদের থেকে খুববেশি একটা ভাগ্য করে আসেনি। এখন তো যাহোক একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল।

পরদিন ভোরের দিকে রুশরা আবার গুলী চালাতে লাগলো। এ যেন গুলির ঝড়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে অশ্রান্ত গর্জনে গর্জে চললো কামান; এবার আরশুলা দূরে রুশদের ট্যাঙ্ক দেখতে পেল। আমাদের ট্যাঙ্ক প্রতিরোধকারী গোলন্দাজবাহিনী এমন অক্ষম কেন, ওপরে আকাশেও তো ওরা, আমাদের বিমান তো দেখা যাচ্ছেনা! সে টমি-বন্দুকধারী পণ্টনকে হুকুম দিলে তারা আবার ট্রেঞ্চের গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়ুক। লালঝাণ্ডাওয়ালারা যদি সেখানে গিয়েও সেঁধোয় তারা তাদের পা লক্ষ করে গুলী ছুঁড়বে।···

কিন্তু আধঘণ্টা পরে আরশুলা চেঁচিয়ে উঠলো, আর উপায় নেই!

কর্ণেল গেবলার জেনারেল গ্রিমকে টেলিফোনে ডাকলেন:

পল্টনে আর তিন -চারজন লোক আছে, আর তো লড়াই চালানো সম্ভব নয়।…

গরম! গ্রীষ্মের বৃষ্টি এল। আবার সূর্য উঠেছে মেঘের ফাঁকে। গাছের পাতায়-পাতায় জলের চিক্‌চিকানি। রিক্‌টারের মনে পড়লো, হিল্ডা রেলষ্টেশনে কি কান্নাই না কেঁদেছিল। মেয়েরা বুঝতে পারে, ওরা বেড়ালের মতোই বিপদের গন্ধ পায়।

দুই

প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, পৃথিবী যেন ঘননীল হয়ে আছে। এবার বৃষ্টি কমলো, মিহি ধারা ঝরছে, কেমন এক ঔজ্জ্বল্যে ছেয়ে গেছে। মিনায়েভের মনে হোল, এত ফুল সে আগে কখনো দেখিনি। ব্লুবেল, স্ন্যাপড্রাগস, ডেইজি, কারনেশান আর কাউহিটের সমারোহ। এ যেন স্বর্গ!—হেসে উঠলো সে—চমৎকার স্বর্গ। কাল একটা টমি-গানার তো আমার নাগাল পেয়েছিল আর কি! আর রাতে তো এখানে নরক গুলজার। ছোট্ট গ্রামখানা আবার দখল করবার জন্যে ফ্রিৎসগুলোর কি চেষ্টা! টাইগার ও ওরা দুখানা ছেড়ে ছিল। কিন্তু ঐ ফুল—ওরা তো তাদের গ্রাহ্য করেনা।…

পল্টনের অধ্যক্ষ কোথায়?

পথ শেষ হয়ে গেছে গাছপালার ভিতরে। সার্জেণ্ট গছের ডালপালা হাত দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে লাগলো। এই ছোট্ট গ্রামখানি তারা দখল করেছে কাল। জটিল হয়ে উঠেছিল অভিযান। ট্যাঙ্ক গাড়ী চলার সড়কে এসে পৌছয়, ওসীপ ছিল অধ্যক্ষ, সে গ্রামখানার উপর আক্রমণ চালায়। ছোট্ট নদীর উঁচু পাড়ের উপর গ্রামখানি। জার্মানরা একে বেশ ভাল করেই সুরক্ষিত করে রেখেছিল। কর্ণেল মেদভিদেভ হুকুম দিলেন মিনা-য়েভের পল্টন বনের পথ ঘুরে গিয়ে যেন গাড়ী চলা পথ আগলে দাঁড়ায়—জার্মানরা তাহলে আর পিছু হটতে পারবেনা। দক্ষিণ দিক দিয়ে ওরা গ্রামে এসে পৌছলো। জার্মানরা দুপুর পর্যন্ত বাধা দিলে, বাড়ীর চিলে-কোঠা থেকে গুলী ছুঁড়লে। একজন ক্যাপ্টেন আর একশো লোক বন্দী হোল ; একজন মেজরের মৃতদেহও পাওয়া গেল।

ওসীপকে দেখতে পেয়ে মিনারেভ হেসে উঠলো ঃ
যুদ্ধের আগে একখানা ছবি দেখেছিলাম, তাতে ছিল একজন আমেরিকার ফেরারী আসামী—তোমাকে ঠিক তার মতো দেখাচ্ছে ···

ওসীপের মুখ সত্যিই ধুলোমাখা, দাড়ি গজিয়েছে, ক্লান্তিতে চোখ লাল, স্বর ভেঙ্গে গেছে ; উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদের পরে এমনি হয়। দিনের পর দিন গোলাগুলির ভয়ঙ্কর গর্জনের ভিতরে চেঁচিয়ে সে হুকুম দিয়েছে তাই তার এমনি অবস্থা। গালে হাত বুলিয়ে সে বললে,

কি জান, যখনি কোন ব্যাপার ঘটে, দাড়ি তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।

ওর একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি—যখন কোনো ব্যাপার চলে, তখন দাড়ি কামানো বন্ধ রাখ বলেই অমনি হয়। ওরা তো ক্যাপ্টেইনকে এখুনি নিয়ে আসবে, দেখবে তারও দাড়ি গজিয়েছে। তবে তার দাড়ির ফসল অজন্মা, আর তোমারতো একেবারে ফসলে ভরতি—যেন গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফসল আর কি ? আরো -একদুটা

এমনি লড়াই চললে তুমি ফেরারী আসামী থেকে একেবারে গোষ্ঠিপতি হয়ে দাঁড়াবে।

এবার জার্মান ক্যাপটেনকে একজন সৈন্য নিয়ে এল। চল্লিশ বছর তার বয়েস,—পাকা পল্টনি অফিসার; ফরাসী অভিযান আর হেমন্ত অভিযানের তক্‌মাও মিলেছে, উর্দি'র উপর সেই তকমার সার। তিনি যুদ্ধ-বন্দী হলেও তার সামরিক পদমর্যাদাবোধ হারাননি। ভদ্রভাবে, সংযত হয়ে তিনি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। জেরা শেষ হলে ওসীপের দিকে তাকিয়ে বললেন,

হের্ মেজর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

বলুন? ওসীপ জবাব দিলে,

আগে উপরওয়ালা রুশ কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার আমার সুযোগ হয়নি। আপনি তো চমৎকার ভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেছেন। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, কোথায় আপনি এসব শিখলেন?

ওসীপ হাসলোঃ

স্তালিনগ্রাদে······

যুদ্ধ-বন্দীকে নিয়ে চলে গেলে মিনায়েভও হেসে উঠলো।

ও তোমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তোমার তো ফেরারী আসামীর মতো চেহারা—অথচ ওই হচ্ছে যুদ্ধ-বন্দী। ওর তাই মনে হয়েছে, তুমি সামরিক বিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া ছাত্র, ক্লসেউৎস পড়েছ। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান? আমাদের মানুষরাই সত্যিকারের যোদ্ধা। তারা ক্লান্ত, গালাগাল তারা দেয়, তারা যেন হাঁফিয়ে উঠেছে, কিন্তু তবু লড়ছে বটে! আমার লোকেরা আজ আটজন জার্মানকে ধরে এনেছে। ওরা এমন প্রকাণ্ড আক্রমণ করেছিল যে, জার্মানরা তো ভেবেছিল আর কিছু না হোক, একটা গোটা পল্টনই ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু লোক তো মাত্র তিনজন। যৌথ খামারের চাষী আরাপভ, সে ট্রাক্টর চালায়নি

জীবনে, খেলার দলের কর্তাও কখনো হয়নি—একেবারে অতি সাধারণ। আর ছিল ক্লোচকো। সে এক সময়ে ছিল রাঁধুনি, কোথায় কোন হোটেলে কাজ করত। রান্নায় কাঁচা, কিন্তু খেতে দড়। আর তৃতীয়টি হচ্ছে কোথাকার এক খাজাঞ্চি, চোরও তাকে বলতে পার। কিন্তু এখনো ওকে পরখ করে দেখা হয়নি। সে তোতলা চুরি অপবাদ সম্বন্ধে কি বলবে এখনও বোলবার সময় পাইনি। এখন ব্যাপারটা শোন। একজন সার্জেন্ট ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে। ওকে দেখলে বুঝতে! দশবছর ফৌজে কাটিয়েছে, চার-চার খানা তকমা, চুল খাড়াখাড়া, কথা কয়না যেন ঘেউঘেউ করে উঠে, যেন নিজেই ফন পলাস্ আরকি·····তাহলে সোজা কথাটা কি হোল—জার্মানদের হয়ে এসেছে।

ওসীপের মনে পড়লো সেই ১৯৪১-এর হেমন্তের কথা। এই বনে ছিল ওরা, কি ঠাণ্ডা আর অন্ধকার তখন বন। সে ব্রিয়ানসক থেকে আসছিল, ওরা পল্টনের সৈন্যরা তখন পালাচ্ছে। ওরা বালকভ-এ এসে পৌঁছল, কিন্তু সেখানে জার্মানরা আগেই এসে গেছে। লোকে বললে, জার্মানরা এরই মধ্যে, ট্যুলাও দখল করে নিয়েছে। কেউ কিছু জানে না। একজন জেনারেল পথে দাঁড়িয়ে গাল পাড়ছিলেন, কিন্তু ওকে কেউ ভ্রূক্ষেপই করলেনা; ফিরে তাকিয়েও দেখলে না।···

আমরা ওরেলের জন্য যুদ্ধ করছি, এ হচ্ছে রাশিয়ার কেন্দ্রস্থল, মস্কো থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে, কিন্তু দেখে যেন মনে হবে আমরা সীমান্তের কাছে এসে গেছি। সত্যিই ব্যাপারটা ভাল নয়। আমাদের ক্ষতি হচ্ছে প্রচুর, তার উপরে এখনো ওরেল দখল হয় নি। কিন্তু তবু দেখেই মনে হয়, একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু কাজটা ফতে করবার ওয়াস্তা। মিনায়েভ বলছে, জার্মানরা সাবাড় হয়ে এসেছে। হোক, নিপাত যাক কিন্তু এখনো যে ওরা শেষ লড়াই লড়ছে। জার্মানরা বুঝি বদলায়নি, আমরাই বদলে

গেছি। এক বছর আগেও আমরা যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে লড়ছিলাম। এখন তো আমরা শান্তভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি, নির্ভুল ভাবে লড়ছি···

আমরা এখন আর ভুল করছিনা, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা, ওসীপ মিনায়েভকে বললে।

ওরা দুজনে গেল রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষের কাছে। আবার জোরে এসেছে বৃষ্টি। গরমকালে এমন বর্ষা বহুদিন হয় নি। কাদা থেকে কারা যেন বহু কষ্টে একটা ট্রাক তোল্‌বার চেষ্টা করছে। চীৎকার করছে, চীৎকারে সঙ্গতি নেই।

একটা জার্মান পর্যবেক্ষণকারী উড়োজাহাজ দেখা দিল আকাশে।

আরে কাঁধ লাগাওনা ভাই, ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

ঘামে আর বৃষ্টিতে সবাই ভিজে গেছে। জার্মান উড়োজাহাজ গাছপালার উপরে ডজন খানেক বোমা ফেলে চলে গেলে কয়েক মিনিটের জন্যে কথায় ছেদ পড়েছিল। মিনায়েভ আবার বললে,

আমাদের ভুলের কথা নয়। আমি বলছিলাম, ওদের দফা রফা হয়ে গেছে।··· সেই প্রথম গ্রীষ্মের কথা তোমার মনে আছে? ওরা তো আমাদের উড়োজাহাজ আকাশে উঠলেই তাড়া করতো। যা কিছু দেখতো, তারই উপর বোমা ফেলতো···আজকাল একবার অবস্থাটা দেখ না! আকাশেও ওরা এখন হোঁচট খায়। ···দেখ না, ঐ যে আমাদের ওরা ছুটে এল!

নটি বোমারু বিমান দক্ষিণ দিকে ছুটেছে।

ওরা কি সুন্দর, তাই না? ওসীপ বললে।

টাইগার দেখতে চাও? এই তো কাছেই, এক কিলোমিটার দূরে পড়ে আছে। সিনেলনিকভ একটাকে আটকেছে।···

টাইগার ভেঙ্গেচুরে গেছে—লোহার স্তূপ যেন। একেবারে পেট্রল ট্যাঙ্কে গিয়ে গুলী লাগে, মিনায়েভ বলে।

ওসীপ ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। কেউ নেই, শুধু ফুল, ফুলের মেলা। এক কবিতা, কাব্য যেন।···

ওসীপ আর মিনায়েভ এবার এল ছাউনিতে। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল মেদভেদেভ একটা কাঠের বাক্সের উপর শুয়ে আছেন। ছাউনি পড়েছে বাদামের বনে। তিনি নাক ডাকাচ্ছেন। ওরা আসতেই চোখ মেলে তাকালেন। এবার গা ঝাড়া দিলেন, যেন জল থেকে উঠে এসেছেন।

আমাদের এবার সদর সড়কে পৌছতে হবে। জেনারেল ইনালভও ফোন করেছেন, ওরেল ছেড়ে জার্মানরা চলেছে কারাচেভের দিকে···

বহুক্ষণ ওরা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো। ওরেলের চারদিকে লাল তীর আঁকা। একটা তীর ক্রমির দিকে চলে গেছে, একটা আসছে মিনৎসেস্ক থেকে; আর একটা বোলকভ থেকে; আর একটা স্তানোভয় কোলোদিয়েজ থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। আরও একটা আছে—একেবারে সিধে গিয়ে সদর সড়কে বিঁধে আছে।

মেদভেদেভ বলে চললেন, আমরা খোটিনিৎস্ দিয়ে সদর সড়কে পড়ব। কাজটা অবশ্য সহজ নয়। বন এখানে শেষ হয়ে শুরু হয়েছে খোলা মাঠ। তা ছাড়া চারধার সুরক্ষিত। পাশের পল্টন সেদিক থেকে খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে।

কে—গুরোভ্?

না, আমি পেত্রিয়াকভের কথা বলছি।

আধঘণ্টা পরে পেত্রিয়াকভের কাছ থেকে একজন স্যাপার এসে হাজির হোলো। সে সার্জি। সার্জি এসে জানালে, মেদভেদেভ-এর পল্টনের পথ তারা করে দিতে পারে।

সার্জি বসে পড়ে একটা টুকরো পেন্সিল দিয়ে মানচিত্রে দেখিয়ে দিলে। এই যে···এইখানে···শুনছেন···আমি যে সিগারেট না খেয়ে মরতে বসেছি।···

কারো কাছে সিগারেট নেই। মেদভেদেভ তার তামাকের থলেটা দিলেন;

তামাক নিয়ে খবরের কাগজ ছিঁড়ে সিগারেট পাকিয়ে নিলে সবাই···তারপরে টিনের শুয়োরের মাংস খাওয়ালেন। ওসীপ আর সার্জি এবার আলাপ শুরু করলে। কথায় কথায় জানা গেল, তারা দুজনেই ফেব্রুয়ারীতে ছিল কাতারঝায়।

ওরা সেই কাতারঝায় কি বোমা ফেলেনি!

ওসীপ যদি সার্জিকে বলতো, সে কে, সার্জির হয়তো মনে পড়তো, ভালিয়া তাকে কিয়েভ-এর বন্ধুদের কথা বলেছিল ; তাদের পিকউইক ক্লাব, খামখেয়ালী রায়া, যার দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ আর নির্জীব স্বামী। কিন্তু ওসীপ নিজের পরিচয় দিলে না। তাই তারা শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারা রাসকী-ব্রড আর কাতারাঝায় একই সময়ে ছিল, আবার এখন খোটিনিৎস-এর কাছে দেখা হোল। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো।······

সার্জি এবার পেত্রিয়াকভের সঙ্গে দেখা করতে ছুটলো। তিনঘণ্টা পরে তার স্যাপার দল হামাগুঁড়ি মেরে ভিজে মাটির উপর দিয়ে চললো—জার্মানরা মর্টারের জাল বসিয়েছে পথে। স্যাপারদের হাতে কাঁচি। তার কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সার্জি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তাই তার বাইরেটা এত শান্ত, মনে হয় সেখানে বুঝি চঞ্চলতা আসবে না। দু-রাত তার ঘুম হয়নি। ঘুমোবার ইচ্ছেও নেই। শুধু মুখ আর হাতের তালু গরম হয়ে আছে। স্যাপাররা নিরাপদে ফিরে এলে, সে হাই তুলে ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিলে। ঘুম এল সঙ্গে সঙ্গে।

সার্জি চলে যেতে ওসীপ মিনায়েভকে বললে,

মেজরের কাণ্ডজ্ঞান আছে হে···এখন স্যাপারদের উপরই অনেকখানি নির্ভর করছে। কাল আমাদের দুটো ট্যাঙ্ক ওদিনেৎস-এর কাছে উড়ে গেল। তার কারণ কি জান, মাইনগুলো ভাল করে আগে তুলে ফেলা হয় নি।···

মিনায়েভ হেসে বললে, ওকে কিন্তু সৈন্যের মতো দেখায় না। তার মনে পড়লো, সার্জি ভিজে পোষাকে কি ভাবে দাঁড়িয়েছিল। জবজবে ভিজে পোষাক, মাথাটা একপাশে হেলানো। মিনায়েভ বলে উঠলো, সত্যি, ও যেন সৈনিক নয়, পুশকিন যেন দারজাভিনকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। ঐ ছবিটা তুমি

নিশ্চয়ই দেখেছ ?

তোমার কাছে তো সবারই সঙ্গে কারো না কারো মিল আছে। আমাকে দেখায় ফেরারী আসামীর মতো ; মেজরকে দেখায় পুশকিনের মতো। আর তোমাকে কার মতো দেখায় বলতো ?

বোধহয় লেনস্কীর মতো। প্রথমেই ধর না, কাল একটা জার্মান আমাকে প্রায় সাবাড় করে দিয়েছিল। গুলীটা ফস্‌কে গেল বলে, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ও আর যাই হোক, অনেগিন নয়। তার উপরে আমি নাচতেও জানিনা। তাছাড়া বহু দিন থেকে এটা প্রমাণিত হয়ে আছে যে, তুমি যেমন এক চাঙড় বরফ, আমি তেমনি প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা ···

সিগ্‌ন্যাল দেয় যে মেয়েটি, সে ওর মনে আসন বিছিয়েছে। তার নাম ওল্‌গা। মিনায়েভ তাকে কিছু বলে নি। ওল্‌গা সাহসিকা, কিন্তু সবসময়েই কেমন যেন শঙ্কিত দৃষ্টি তার মুখে। জুলাই মাসটা যদি এমন না হোত, মিনায়েভ হয়তো তাকে বলেও ফেলতো যে, যুদ্ধের ভিতরেও এসব ঘটতে পারে। কিন্তু এখনতো কাব্য করবার সময় নেই।···এখন ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ শুধু তার চীৎকারে প্রকাশ পায়। সে চেঁচিয়ে বলে, এখুনি ঘুমুতে যাও। আমি ফোনের কাছে থাকবখন···তার ম্লান, ব্রণ-ওঠা, শিশুর মতো মুখখানি মনে পড়লো বারবার ; আপন মনে সে ভাবলো, লেনস্কীর কথাটা বলা উচিত হয়নি—ওতে তো সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।···

দুঘণ্টা পরে আক্রমণ শুরু হোল। ওরা ঢালু জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। জার্মানরা জোর কামান চালাচ্ছে। ওসীপের পল্টনকে ডান দিকের একটা ঝোপে ভরা পাহাড় দখল করতে হবে। কিন্তু বড় শক্ত ব্যাপার। জার্মানরা নতুন রেজিমেণ্ট আমদানি করে পালটা আক্রমণ চালাচ্ছে। ওরা বন অবধিও এসে গেল। রাতে ওসীপের পল্টন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। ভোরের দিকে মিনায়েভ আবার এগুতে লাগলো। পাহাড়ের নীচের দিকে ওসীপের পল্টন আবার আক্রমণ চালালে। বেলা এগারোটার সময় জার্মানরা হটে গেল।

এবার তারা এসে গেছে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় লাইনে।

ওসীপ বললে, আস্তে আস্তে, কিন্তু নির্ভুল ভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি (কথাটার সে ভক্ত হয়ে পড়েছে)।

মিনায়েভ বিরক্ত হয়ে উঠলো,

তোমার কাছে তো সবই নির্ভুল। তুমি একেবারে ঠিক জার্মানদের মতো মাপা-জোপা কথা বলছ···

তিন

সার্জি এখন আরো সংযত। মৃত্যু আসন্ন হলে ঘনিয়ে আসে আত্মার নগ্নতা। আর সবার সঙ্গে সে অনুভূতি ঘনিয়ে এসেছে তার মনে। মানুষকে যেন সে আরো ভাল করে বুঝতে শিখেছে। কিন্তু আগের সার্জির সঙ্গে তার মিল নেই—এ তার ভুল বিশ্বাস। বাইরের প্রশান্তির নীচে আছে কামনা, অস্থৈর্য—আশা নিরাশার দোলা। এখনো তার মনে আশা এসে দেখা দেয়, আবার হঠাৎ বদলে যায় আশা—নিরাশায় ঢেকে যায় মন।

তার মনে হচ্ছে, আক্রমণের শেষ প্রচণ্ডতা নিঃশেষিত। আমরা বসে আছি··· আবার কি সেই ফেব্রুয়ারীর পুনরাবৃত্তি হবে? তখন তো ওরেল সম্পর্কেও একথা বলা হয়েছিল।

জেনারেল পেত্রিয়াকভ সার্জিকে বললেন,

তোমার সময় আসছে···নদীর সমস্যা তো এল···

সার্জি বোঝে না। নদী এখানে কোথায়? এখানে আছে ছোট নদী। ভিয়েতেবেৎ আর রাসভিয়েতার মতো ছোট নদী···

পেত্রিয়াভক হেসে বললেন,

দেসনা, নিপার। আর তার পরে ভিস্তুলা···

সার্জি হাসলো···হয়তো সত্যি কথা—সত্যিই কি তাই···আমি যা দেখি তাই নিয়েই বিচার করতে বসি—একটি সেনাবাহিনী নিয়েই আমার কারবার। হয়তো বা সেখানেও দেখায় ভুল থাকে। যেমন—রাইকাচভের দলে তো কখনো যাইনি···জেনারেল আমার থেকে ভালই বোঝেন। মা তো লিখেছেন, মস্কো এখন অটল আশায় উদ্বুদ্ধ। মজার ব্যাপার নয়—আমরা যুদ্ধকে অনুভব করছি, যুদ্ধের স্বরূপ আমরা জানিনা—জানতে হলে বাইরে থেকে দেখতে হয়। যারা পিছনে আছে তারা কি আক্রমণের সময় দশটি মিনিটের তাৎপর্য বুঝতে পারে—কিন্তু তারা যুদ্ধের ওঠা নামা দেখে, গতি বোঝে—পরিপ্রেক্ষিত তাদের আয়ত্তে।

সেনাবাহিনীর সদর ঘাঁটি থেকে ফিরছিল সার্জি; তার পল্টনের বদলির হুকুম হয়েছে। জিপে সে ফিরছে। ভোর থেকেই অবিরাম বৃষ্টি—তার সারা গা ভিজে চপচপে। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ, উলটে-পড়া গাড়ি, উপড়ে-পড়া টেলিগ্রাফের থাম, কাঁটা তার। চিরাচরিত যুদ্ধক্ষেত্রের পটভূমি, অথচ এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা শক্ত। যখন লড়ছ, তখন তো দেখতে পাচ্ছ না, বা দেখছ চোখে, ভাবতে পারছ না; কিন্তু দর্শকের চোখ নিয়ে দেখ, অমনি শিউরে উঠবে। সার্জি কিছুই ভাবছে না। শুধু মন বিষণ্ণ, মনে হয়, এই ভাঙাচোরা, তুরমুস করা রাস্তা আর যুদ্ধ—এর আর বুঝি শেষ হবে না।

গাড়ি থেমে পড়লো।

লুব্রিকেশন নেই, চালক বললে।

সার্জি নেমে দেখলে, পিষ্টন আলগা হয়ে গেছে···

হঠাৎ শুনলো, কে ফরাসি ভাষায় কথা কয়ে উঠলো। সে চারদিকে তাকালো-

ক'জন বৈমানিক কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। দু-সপ্তাহ আগে, কে যেন বলেছিল, নরম্যাণ্ডির পল্টন এসে ওরেলের যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। তখন আমরা জার্মানদের অবরোধ ভাঙছিলাম, স্মৃতি নিয়ে ভাববার সময়ও ছিল না। কিন্তু আজ পারীর ছবি ভেসে উঠলো। এই ভাঙাচোরা রাস্তায় সে দেখলে প্লাস দ্য লা কর্কোর ল্যাম্পের থাম, মূর্তি, কুজন-গুঞ্জনরতা তরুণীর দল, ঝরনা, খবরের কাগজবিক্রেতার ভিড়। সবকিছু যেন জীবন্ত হয়ে এসেছে—ভাষা, স্বর আর মুখের সার যেন বয়ে নিয়ে এসেছে।

চালক বললে,

ওদের কাছে লুব্রিকেশনের তেল চেয়ে নিন না কমরেড মেজর, আর কিছুটা গ্যাস। তা না হলে ফিরে যেতে পারব না। ··

বৈমানিকরা সার্জিকে গাছপালার আড়ালে নিয়ে গেল। একজন রুষ ভাষায় কথা চালাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছে, তার উচ্চারণ অদ্ভুত, হাসি পায়। সার্জির মনে পড়লো, মাদো অমনি উচ্চারণ করতো ঃ—কে চোরতু পশলিয়ৎ···

বৈমানিকরা হাসতে হাসতে বললে, কেমন করে একটা হূন বিমানঘাঁটিতে নেমে ফরাসীদের দেখে অবাক হয়ে গেল; একজন রুশ জেনারেল ওদের আবার এক কেস শাম্পেন উপহার পাঠিয়েছেন। এগুলি জার্মানদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জিনিস, আর তাই দিয়ে তারা চৌদ্দই জুলাইয়ের উৎসব করেছে। তারা রুশ মেজরকে ফরাসী ভাষায় অমন চমৎকার কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে গেল। সার্জি হাসলো—ঠিক এমনি ফ্রান্সের স্মৃতিই আছে তার মনে—সাহসী, আনন্দোচ্ছল, বিষণ্ণ ফ্রান্স—বৈমানিকদের হাসি তামাসায়ও তিক্ততার রেশ বেজে উঠছে—আগের দিন ওরা হারিয়েছে দুজন সাথীকে।

আমাকে চিনতে পারছেন না? একজনা লম্বা যুবক জিজ্ঞেস করলে। কালো তার চোখ, লেফটেনাণ্টের চাপরাস তার কাঁধে আঁটা—আপনি তো করবেইয়েতে আমার বাবার সঙ্গে সেবার দেখা করতে গিছলেন···

সার্জি হকচকিয়ে গেল। লুইকে সে জড়িয়ে ধরতে গেল। মনের অধীরতা দমন করতে পারছেনা তাই তার লজ্জা।

হয়তো আমারই ভুল হয়েছে সার্জেন্ট-মেজর, লুই বললে।

না, না, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনাকে—এখানে-এমনভাবে আশা করি নি…

জুনের গোড়া থেকেই আমরা এখানে আছি। তিরিশটা জার্মান-বিমান নামিয়েছি—আপনাকে দেখে খুবই খুশি হলাম—পারীর পরিচিত মানুষের সঙ্গে এই প্রথম এখানে এসে দেখা হোলো।

লুই সার্জিকে জিজ্ঞেস করলে, সে কোথায় লড়েছে। যখন শুনলে, সার্জি-ছিল স্তালিনগ্রাদে—সে বললে,

আমিও সেখানে যাবার স্বপ্ন দেখতাম। লণ্ডনে আমরা পড়তাম স্তালিন-গ্রাদের কথা—আমরাতো তো অস্থির হয়ে উঠেছিলাম…কিন্তু এলাম যে দেরিতে নভেম্বর মাসে …কিন্তু তবু দিন খারাপ কাটছেনা—আমরা রোজই আক্রমণকারী বিমানগুলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। বিমানের সে নাম করলে। ষ্টর্মোভিকস্ —ঝটিকাবিমান।

এবার সার্জির পালা, সে লুইকে জিজ্ঞেস করলে, সে কি করে রাশিয়ায় এল। লুইর মুখে ভ্রূকুটি। সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ছে—সেই উপপ্লব। বোর্দো, বাবার সঙ্গে তর্কবিতর্ক।

যখন যুদ্ধের নামে ভান চলছিল, তখন আমরা ছিলাম সুইস সীমান্তে। আত্মসমর্পণের পর আমি তখুনি ফ্রান্স ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসি। প্রথমে কিছু কিছু লড়াইও করেছিলাম—হুনরা প্রায় রোজই বোমা ফেলত। কিন্তু তার পরে একবছর বসে কাটলো। কিছুই করি নি। কিন্তু—আমাদের ফরাসীদের পক্ষে সে তো অসহ্য ব্যাপার।…

এখন ফ্রান্সের খবর কি ? নিশ্চয়ই সবাই ওদের সঙ্গে মিলে যায় নি…

কেউই মিলে যায় নি। শুধু মিলে মিশে গেছে সামান্য ক'জন বিশ্বাসঘাতক

…এই তো গত হেমন্তে আমাদের একজন বৈমানিক ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। সে তো বলে, হূনগুলো রোজই খুন হচ্ছে। প্রতিরোধের লড়াই দিন দিন বেড়ে চলছে। ও তো বলে, ফরাসীদের এখন আর চেনা যায় না।

লুই এবার সার্জিকে ফরাসী প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের কথা বললে। হয়তো বা সে একটু অতিরঞ্জিতই করে বললে। ফ্রান্সকে সে যে ভাবে দেখতে চায়, সেই ভাবেই বর্ণনা করলে।

কমরেড মেজর, তেল ভরে নিয়েছি। চমৎকার তেল।

যাবার সময় হয়েছে…কিন্তু সার্জি আসল কথাই এতক্ষণ জিজ্ঞেস করে নি। লুই কি মাদোর কথা কিছুই বলবে না?…কিন্তু না তো। লুই বলে গেল স্যাভয়ের ফ্রাঁস—ত্যিয়েয়ুর কথা, 'মেসার'-এর কথা—মেঘের ভিতরে ডুবে গেল মেসার বিমান—ষ্টর্মোভিক্স-এর কথাও এল—জানেন, কাল আমরা ওরেল-কারাচেভের পথে একটা গোটা পল্টনকেই সাবাড় করেছি…

এবার সার্জি সাহস করে জিজ্ঞেস করলে,

আপনাদের বাড়ির খবর কি?

আমি ফ্রান্সে থাকতেই মা মারা যান। এসব দেখে তার মন ভেঙে পড়ে… বাবা…আপনি তো তাঁকে জানেন…উনি কিছুতেই বুঝবেন না যে…

আপনার বোন?

মাদো? সে বিয়ে করেছে। আমিও জানতাম না, হঠাৎ শুনলাম। ওরা পারীতেই আছে, প্রতিরোধ সংগ্রাম করছে…

সার্জির ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল, খেই ধরতে পারছে না। চালক গজর-গজর করছে, আগেই জানি, পিষ্টন আলগা, কিন্তু বদলাই কখন! আপনি যেরকম রোজই দৌড় করাচ্ছেন। তার অভিযোগ কানে যাচ্ছে না। এবার আঁধার হয়ে এল। সার্জি মাদোর কথা ভাবতে চাইলে, কিন্তু পারল না। কিন্তু তবু তো তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য এক বন্ধন রয়েছে। বনে যেন তারই সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবনা তো রাশ মানে না, খেই হারিয়ে যায়—একসঙ্গে

ছুটে আসে, তালগোল পাকিয়ে যায়—স্মৃতি, ব্যথা, আনন্দ, ক্রোধ সব কিছু। তাকে যদি এখন কেউ জিজ্ঞেস করে সে সুখী না দুঃখী—সে বলতেও পারবে না। মাদো গাইত সেই গান।

সৈনিক, তোমার সৌভাগ্য তুমি ফিরে পেলে
সৈনিক, তোমার সৌভাগ্য হারালে তুমি···

জানি না, মাদোকে হারালাম—না, তাকে খুঁজে পেলাম।···নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে পেয়েছি। সে তো শুধু বেঁচেই নেই, সে আছে আমাদের সঙ্গে। মাদো এখন অন্তরালে—এতো কল্পনাও করা যায় না! তাহলে যুদ্ধ সবজায়গায়ই এমনি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। মাদো সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল কেন? আমি ওকে আদুরে মেয়ে বলে ভাবতাম—নরম মেয়ে। কখনো কখনো ও আমার চেনা নয় বলেই মনে হোত। কিন্তু তবু ও ছিল আমার কাছে। আমি ভাবতেও পারিনি যে, ও ছিল এত কাছে। শুধু পরিবর্তনই তার হয় নি—আমিও তো আগে যা ছিলাম তার থেকে অন্য মানুষ হয়ে গেছি। অথবা সময়ই এমনি করেছে··· অনেক কিছুই তো আগে বুঝতাম না—শুধু বাইরেটা দেখেই বিচার করতাম। কিন্তু যুদ্ধ উপরের গিল্টিটুকু ঘসে ঘসে মুছে ফেলেছে, জৌলুস আর নেই। এখন সবকিছুই অনাবৃত, উলঙ্গ···মাদোকে আমি চিনতে পারিনি। আমি ভালবেসেছি, কিন্তু কাকে বেসেছিলাম তা জানতাম না···এখন যদি দেখা হয়, সবকিছুই অন্যরকম হবে—বিচ্ছেদের পরে, পরস্পরের সন্দেহের পরে, যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষার পরে সবকিছুই অন্য রূপ নেবে। যখন প্রথম দিন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, তখন বৃষ্টি পড়ছিল। পথের গাছপালার উপর বৃষ্টি ঝরছিল।

তাহলে মাদো বিয়ে করেছে। আমাকে ভুলে গেছে। না, না, আমি কি পাগল হলাম নাকি! আমিই তো তাকে বলেছিলাম, আমাদের মিলন হবে না—হতে পারে না। আমি তো বিয়ে করছি—আবার ঈর্ষাও করছি! ও যে আবার ভালবাসা পেল—এতো ভাল কথা—ও পেয়েছে আবার জীবনকে ফিরে। জিজ্ঞেস করলাম না কেন, ওর স্বামী কে? হয়তো ওর মতোই একজন

শিল্পী। ওরা এখন লড়ছে — এখন হয়তো ওদের পক্ষে দুঃসময়—শান্ত জীবনের মোহ ঘিরে আছে ওদের চারদিকে, আছে উদাসীনতা, আছে বিশ্বাসঘাতকতা। তবু ভাল, মাদো এমনি দুঃসময়ে একা নয়। সাথী সে পেয়েছে। আমি তো 'ভাল' বলছি, কিন্তু মনে কি হচ্ছে? যা—তা ব্যাপার, বিশ্রী—আমি ঈর্ষা করছি। না, না, আমি তো তা চাই না! আমার নিজের জীবনধারা তো রয়েছে, আছে ভালিয়া। মাদো তো অতীত। আমি এখানকার জীবন নিয়েই তো বাঁচবো—ভবিষ্যতের জীবনই তো আমার কাম্য।—

মাদোর ভাবনা মন থেকে সে তাড়িয়ে দিতে চাইল, কিন্তু পারলোনা। গাড়ির হেডলাইটগুলো জ্বলে উঠেছে; ভেজা গাছগুলির উপরে আলো ঝলসে উঠছে। সার্জির মনে হোল, মাদো তার পাশে বসে আছে। সে আপন মনে ভাবলে, ভাবতেও ভয়ংকর লাগে যে, এর প্রতিকার অসম্ভব। আমি আগেও বুঝিনি, কি করে অতীত নিয়ে ভাবা সম্ভব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি—যা করেছ তার জন্যে তো দুঃখ হয় না, যা করনি, তার জন্যেই তো মানুষের দুঃখ। কেন এমন হয়? আমাদের অনুভূতি গভীর নয় বলে কি? না—তাতো নয়! আমার তো সন্দেহ হয়, কেন এমন হয়? আমাদের মতো এমন উদগ্র ভালবাসা আর কারো ছিল না। বিদায় নেবার সময় মাদো বললে, এর মতো মুহূর্ত তো আর আসবে না। ভালবাসার চেয়ে বড় আর কিছু যেন ছিল, তবুও যেন ছিল কিসের অভাব—হয়তো বন্ধন ছিল না সরল। মাদো বলেছিল, আমরা নিজের নিজের জীবন কাটাব, কিন্তু সে ভালবাসা তো নিঃশেষ হয়ে যাবে না। সে সবই বুঝেছিল। হাঁ, একথা তো সত্য, আমি আজ জেনেছি, তার স্বামী আছে—কিন্তু তবু তো ব্যাথা পাইনি। আমারও তো আছে ভালিয়া। কিন্তু সেতো আলাদা কথা—আমি মাদোর কাছে বিশ্বাসঘাতক হই নি। মাদোও হয় নি। এখানে তো বিশ্বাসঘাতকতা চলে না। এখন পারীতে ঘনিয়ে এসেছে রাত, বৃষ্টি পড়ছে। হয়তো মাদো চলেছে এক সংকীর্ণ গলি দিয়ে। এ যেন এক অরণ্য, একটা জার্মান পা টিপে টিপে চলেছে পিছনে। কিন্তু সেদিন বিদায়

নিলাম কেন? এক প্রবল আকর্ষণ ছিল, আর ছিল প্রচণ্ড বিমুখতা—যার বিচার চলে না। মেজর শিলেইকো হয়তো বলবেন, 'ভাগ্যহীন'···কিন্তু ভাগ্য তো মানুষের হাতে। এতো দৈবশক্তিতে বিশ্বাস—তাই কি?

গাড়ি থামলো।

চালক মুখ গোমরা করে বললে, লুব্রিকেশনের ব্যাপার আছেই, পিষ্টন আবার বদলাতে হবে। সার্জি একটু শঙ্কিত। দেরী হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যে একখানা মোটর ট্রাক এসে গেল, সে সেখানা থামালে। কয়েক মিনিট পরেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ট্রাকের মানুষদের সঙ্গে আলাপ চলছে। গোলন্দাজ সৈন্য। ওরা খবর দিলে, ওরেলের শহরতলিতে চলছে লড়াই।

আকাশে শীগ্‌গিরই দেখা দিল লাল আভাস। সবাই চেঁচাচ্ছে, গর্জন ছাপিয়ে উঠছে চীৎকার। সার্জি ভাবছিল লুইর কথা—তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। সে যেন মাত্র চার ঘণ্টা আগে নয়—বহু বহু দিন আগে। শুধু বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডালে অনেকখন পরে পরে ঝলসে উঠছে হেডলাইটের আলোয়—আর তার মনে পড়ছে মাদোর কথা।

তাহলে ওরেল আমরা দখল করতে যাচ্ছি···সার্জি আর মাদোর কথা ভাবছে না, ভাবছে সুমুখের প্রশস্ত নদীগুলির কথা—ডেস্‌না, নিপার আর ভিশ্চুলা

চার

সার্জি চলে যেতে লুই আপন মনে ভাবলে, ওকে কেন বলতে গেলাম যে মাদো আর বার্তি প্রতিরোধ-সংগ্রামে আছে! ওকথাটা তো খবরের কাগজে ওদের বিয়ের খবর পড়ে আমার মাথায় এল। এতো নিজেকে সমর্থন করবার একটা তুচ্ছ চেষ্টা মাত্র। রেনে তো বলে, বার্তির মতো মানুষরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে—আর সে বার্তির নামও দেখেছে খবরের কাগজে সেখানে; আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। বাবা পেতাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন, ওঁর তো ছেলেমানুষের মতো যুক্তি। কিন্তু আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, মাদো একটা বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলবে। হয়তো ওখানে এখন সবাই টিকে থাকবার কথাই ভাবছে, একজন আর একজনকে ঢালের মতো আড়াল করে আছে? এযে এক ভয়ানক ধাঁধা।

লুই আর রেনে প্রায়ই অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে। কখনো বা ভাল লাগে বলেই করে—কখনো বা রেগে ওঠে; ওরা যাই-ই বলুক—ইস্কুলের মজার ব্যাপার, মিছেমিছি যুদ্ধ, উপপ্লবের পরে তাদের কেমন লাগলো—সব কিছু থেকে প্রশ্ন এক নির্দিষ্ট খাতে গড়িয়ে পড়ে: ফ্রান্সের কি হোল? কি হয়েছে, ওরা বুঝতে চায়, পারে না। একদিন লুই বললে, ফিরে গেলে হয় তো বুঝতে পারব, না বিদেশীদের অবস্থা হবে? ওর এই মনের সংশয় কি ও সার্জির কাছে প্রকাশ করতে পারত? ভ্লাকভ বন্ধু, বোঝা যায় সে ফ্রান্সকে ভালবাসে কিন্তু তবু তো সে বিদেশী। যখন স্তালিনগ্রাদের কথা বল্‌লে, ও হয়তো ভাবছিল তোমরা তো যুদ্ধ না করেই আত্মসমর্পণ করলে। ও জানুক, তারা খাঁটি ফরাসীদেশের মানুষ—তা এখানে বা ফ্রান্সে যেখানেই থাকুক! আর বিশ্বাস-ঘাতকদের কথা যদি ধরা হয় (একি সত্যি যে বার্তি বিশ্বাসঘাতক? আমার তো বিশ্বাস হয় না। রেনের হয়তো ভুল হয়েছে।), সে তো আমাদের

ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। তা নিয়ে বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করা চলে না।

লুই হাসলোঃ আমরা কিরকম বদলে গেছি! একথা আগে মাথায় ঢুকইতই না। যখন রুশরা তাদের দেশের কথা বলে, তখন অনুভব করা যায় ওদের গর্ব। ভ্লাকভ নিজের জায়গায় নিভেলকে এনে বসায়। হয় তো নিজেরা এ নিয়ে ঠাট্টাও করে না, কিন্তু আমরা ফরাসী দেশের মানুষ বলে কখনো গর্ব করেছি? কেউ তো তা ভাবেও নি। আমরা হাসির গানে ফ্রান্সকে নিয়ে ঠাট্টা করেছি, ভাঁড়ামি করেছি। মা যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কি সত্যিই তাহিতি দ্বীপে যেতে চাই, আমি উত্তর দিয়েছিলাম, ফ্রান্সের থেকে যে কোনো জায়গা ভাল। শুধু লণ্ডনে গিয়েই প্রথম আমি টের পেলাম, আমি কি হারিয়েছি।

রুশরা আমাদের সঙ্গে ইংরেজের চেয়ে ভাল ব্যবহার করেছে, ওরা নিজেরাই প্রচণ্ড দুঃখ সইছে; ওদের পক্ষে আমাদের মন বোঝাতো এখন সহজ।… ইংলণ্ডে তো আমাদের ভাড়াটে সৈন্য ছাড়া কিছু ভাবতো না। কিন্তু এখানে সবাই বলে, 'নর্মাণ্ডি' মিত্রশক্তির বাহিনীরই একটি পল্টন, বেশ জোর দিয়েই বলে। হয়তো এও রাজনীতি। জানি না, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তো ওদের বন্ধুত্বের স্বাদ পেয়েছি। আমাদের দিয়ে ওদের প্রয়োজন নেই, একথা তো সবাই বোঝে, এমনি ভীষণ যুদ্ধে, গুটি কয়েক বৈমানিক তো কিছুই নয়-- হোক না তারা পয়লা নম্বরের। কিন্তু তবু সাথীর মতোই ওরা আমাদের বরণ করে নিয়েছে, ওদের 'য়্যাক-য়্যাক' দিয়ে বলেছে, পারীর জন্য আমাদের আকাশে তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও।

যখন মিছেমিছি যুদ্ধের সময় আমরা বসে বসে ভাবছিলাম, আমাদের লড়াই করতে পাঠানো হবে কি হবেনা, কেউ তখন বুঝিনি, কিসের জন্য আমাদের এই যুদ্ধ; তবু তখন ছিলাম ফ্রান্সে…এখন ফ্রান্স তো সুদূরে—তার কথা ভাবতেও পারি না, কিন্তু এখন তো আমরা জানি, পারীর জন্য আমরা লড়ছি। একসময় বিমান চালানো ছিল খেলা—রেকর্ড ভাঙতে হবে, খ্যাতি অর্জন করতে হবে

যুদ্ধে, কিন্তু এখন খ্যাতির আর আকর্ষণ নেই। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুলভ জিনিষের জন্য লড়ছি—একখানা বাড়ি, তার পাশে লাইম বা এল্ডার গাছ, জানালায় সবুজ শার্সি, ছোট্ট লাল গোলাপের দল, তার উপরে ভ্রমর গুণগুণিয়ে ওঠে···। কিন্তু এখানে সবই আলাদা—গাছপালা, বাড়িঘর—এমন কি আকাশও—সেও বিবর্ণ। কতদিন হয়ে গেল, টালি-ছাওয়া বাড়ি, ধূসর পাথরের দেওয়াল, উইস্তারিয়া তারপাশে লতিয়ে আছে; ছোট্ট কাঠের ছাদ, নীল ফুল, পিনাফোর পরা ইস্কুলের মেয়ে আর কালো টুপী-পরা মেয়েমানুষদের দেখিনি! উঃ কতদিন!

আগে, লুই ভাবালুতা দেখাতে ভয় পেত, কিন্তু যুদ্ধ তাকে বদলে দিয়েছে। সে তার মার কবর থেকে যে একটু মাটি এনেছিল তা রেণেকে দেখাতে লজ্জাবোধ করেনি। এই মাটি লণ্ডন থেকে সিরিয়া, ইভানোভা হয়ে ওরেলের কাছে এই গ্রামে এসেছে। এক মুঠো মাটি—ধুলো—সাধারণ জিনিস, কিন্তু ওই এক মুঠো ধূলোর দিকে তাকিয়ে লুই-এর মনে পড়ে পাহাড়ের কথা, নীচু মার্টল গাছ মৃত্যুর খোসবাই নিয়ে আসে; আর আসে নীল নিতল দক্ষিণ অঞ্চলের আকাশ।

হাঁ, আমরা এখানে পারীর জন্য লড়াই করছি। এখনও কি ওরা নামবে না? এক বছর তো হয়ে গেল, জার্মানরা স্তালিনগ্রাদে চূর্ণ-বিচূর্ণ, এখানে চলছে দু'সপ্তাহ ধরে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ। এখনো ওরা কেন সিসিলিতে বসে আছে? রুশরা বলে, ওরা নাকি শেষ হবার মুখে এসে যোগ দিতে চায়। রুশরা কি মনে করে তা আমি বুঝি—মনে করবেনা কেন, ওদের যে হাজার হাজার মানুষ রোজ মরছে। ফ্রান্সও প্রতীক্ষায় ক্লান্ত। জার্মানরা ওখানে তিন বছর ধরে জাঁকিয়ে ব'সে আছে। আমি যে চলে এসেছি, ভালই করেছি, এখানে আমি ফ্রান্সের কাছাকাছি আছি—আমি যুদ্ধ করছি।

লুই এমনিতে আমোদপ্রিয়, একটু বা উদ্দাম, কিন্তু সে কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লো। সে তার সাথীদের সঙ্গে সেদিন দেখা পর্যন্ত করলে না। রেণের সঙ্গেও না। সার্জির সঙ্গে দেখা হতে ওর বুকের ক্ষত-মুখ যেন আবার আলগা

হয়ে গেছে। অতীত ভেসে উঠলো চোখের সুমুখে। মা, মাদো, আর পারী …যাই, খেয়ে আসিগে। মেসিনের কাছে তৈরী হয়ে থাকতে হবে এই হুকুম। সে খানা-কামারায় গেল, কয়েকটা নতুন-তৈরী টেবিল গাছের নীচে পাতা—পাইন কাঠের গন্ধ আসছে। কেউ নেই দেখে সে খুশি হোলো, তার দেরি হয়ে গেছে। ক্লাভা তাকে বকলে, শীগ্‌গীরই তো সন্ধ্যের খাবার সময় হবে।

ক্লাভা, রাগ কোরো না, আধ ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে মাত্র, কিন্তু মিত্রশক্তি তো এক বছর দেরী করে ফেলেছে—দ্বিতীয় রণাঙ্গন এখনো দূরে।

তুমি খালি ঠাট্টা কর!

ক্লাভা হাসি চাপতে পারছে না। মোটাসোটা মেয়েটি, ভ্রূর রেখা এত সূক্ষ্ম যে দেখা যায় না। আর ধূসর চোখে মায়া আছে। সুপ আর রোষ্ট-সে নিয়ে এল।

খাচ্ছ না কেন?

সে অপরাধীর মতো বললে, শিশুর মতো বললে, ইচ্ছে করছে না, ক্লাভা।

লুই অন্য সব ফরাসীদের চেয়ে রুশ ভাষা ভালই বলে। এর জন্যে সাথীরা তাকে ঈর্ষা করে। সে একজন রুশ বৈমানিককে বলতে পারে, কি করে সে 'মেসারের' পিছনে ধাওয়া করেছিল। অন্য সবাই হাবেভাবে, অঙ্গভঙ্গী করে বলে, মাঝে মাঝে দু-চারটে রুশ কথারও ফোড়ন দেয়। কিন্তু লুই সব কথাই বলতে পারে—এমন কি খ্‌ভোস্ত (লেজ) কথাটাও—এতে ফরাসীরা তো অবাক হয়ে যায়।

ক্লাভার সঙ্গে সে তো প্রায়ই গল্প করে, তাকে রাশিয়ার জীবনধারার কথা জিজ্ঞেস করে, ফ্রান্সের কথা বলে। ক্লাভা মন দিয়ে শোনে বলেই খুশি হয়, মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে ও চেঁচিয়ে ওঠে—সত্যি! না, না, বিশ্বাস হয় না! লুইর ভালই লাগে।

প্রথমে ক্লাভা বুঝতে পারেনি, ফরাসীরা কেমন মানুষ। বড়দিনের আগের দিন ওরা একটি ভোজের বন্দোবস্ত করেছিল, পান-ভোজন আর সমবেত সঙ্গীত—

এমন গম্ভীর তার স্বর—শুনে মনে হয় যেন স্তোত্র। ক্লাভা দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলে, ওরা কি প্রার্থনা করছে? দোভাষী হাসলো, না, এ একটা হাসির গান, কথাগুলো শুনবে:

পায়জামা কিনতে ঠাকুমা দিলে খরচা
আমি তা ভাই মেয়ের পেছনে
দিলুম তো গরচা।…

ক্লাভা তো চটে লাল; সে ঠিক করলে, এই ফরাসীগুলো ভারি অভদ্র। ওদের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হোলো, সে ভাবলে, না, কথাটা তো সত্যি নয়। যা মাথায় আসে তাই বলে, কিন্তু হাত অমনি নিস্‌পিস্ করে তা করতে ছোটে না। যদি একটু ছেনালি করতেও চায়, তাও অতি সুন্দর ভাবেই করে; কোনো দোষ ধরা যায় না। ফরাসীদের তার ভালোই লাগলো। আমুদে মানুষ, পোষাক-আষাকে ফিটফাট—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। আবার সাহসও তাদের কম নয়—আমাদের কর্ণেল তো বলেন, ওরা লড়িয়ে ভালই, তবে একটু বেসামাল-উড়নচণ্ডী।…বুঝি না, কি করে ওরা ফ্রান্সে অতো সহজে ঘায়েল হয়ে গেল…কাল তো ওদের একজন আর ফেরেনি…ওর নাম পিয়েরী…রুশ পিতর আর ফরাসী পিয়েরী একই নাম। ও তো ক্লাভাকে বলেছিল, রুশ ভাষায় ওর নাম হচ্ছে, পিতর গাস্তোনোভিচ। সকালবেলা বসে বসে কত মস্‌করা করলে… বললে, পুলিশকে নাকি ফ্রান্সে বলে—'লে ভাসে'—তার মানে গোরু। আর এমন হাম্বাহাম্বা শুরু করলে যে, লেনা তো চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে এল, কি করে এখানে গোরু এসে ঢুকলো?… ও আর ফেরে নি…ক্লাভা সারারাত ঘুমোতে পারেনি, ভেবেছে পিয়েরীর কথা।

ক্লাভার বোধহয় সবার চেয়ে লুইকেই বেশী পছন্দ…ওর চোখ দুটো যেন কথা কয়, যখন ও হাসে, না বুঝলেও তোমাকে হাসতে হবে। রুশ ভাষাও জানে লুই…আজ ও কেন যেন মনমরা হয়ে আছে। ক্লাভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

খাও, না খেলে যে শরীরে বল পাবে না…

ক্লাভা, খেতে ইচ্ছে করছে না।

সে ওর পাশে বসে পড়লো। ওর চকচকে কালো চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলে ক্লাভা, ফ্রান্সে তোমার বৌ আছে?

না।

ভাবী বৌ? ও 'নেভেস্তা' কথাটা বুঝতে পারলে না, ক্লাভা বুঝিয়ে দিলে। ভালবাসার মানুষ গো, ভালবাসার মানুষ!

না, কেউ নেই। মা মারা গেছেন, এখন শুধু আছে ফ্রান্স।

মনে মনে ভাবলে, ফ্রান্সের মাটির উপর মরতে কি সুখ…সেই ফ্রান্স যেখানে আছে পাহাড়, আঙুর-বাগিচা, শ্লেট আর টালি-ছাওয়া বাড়ি…চোখে বিষাদের ছায়া আরো ঘন হয়ে এল।

ক্লাভা বললে, দুঃখ কোরোনা। যখন যুদ্ধ থামবে, তুমি বাড়ি ফিরে যাবে, ভালবাসার মানুষও জুটবে গো, জুটবে…।

নারীর ভালবাসা লুইকে মাটি করে দিতে পারে নি। তাকে দেখে মনে হয় সে আত্মস্থ, একটু বা খেয়ালী, কিন্তু আসলে সে বড় লাজুক। যখনই কোন মেয়েকে তার ভাল লাগে, সে মনে মনে তর্ক জুড়ে দেয়, মেয়েটা হয় আস্ত বোকা, নয়তো অতি চালাক। তার সঙ্গে নিরিবিলিতে একা থাকতে ওর ভয়, পাছে ও নিজে উপহাসের পাত্র হয়ে বসে। ক্লাভার দিকে ও প্রশংসার চোখে তাকায়—ও কত কোমল, কত স্নেহশীলা। নারীর কোমলতা ওকে ঘিরে আছে। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে যায়, ক্লাভার চওড়া, কর্কশ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে চুমু খায়, ক্লাভা লজ্জায় পিওনি ফুলের মতো লাল হয়ে উঠে বলে, এই—অমনি করে না!

এমনি সময় রেণে ছুটে আসে।

মেজারের হুকুম, আমরা 'ষ্টর্মোভিকস্'-এর সঙ্গে যাব।

লুই বৈমানিক হিসাবে সরেশ। এরই মধ্যে তিনখানা বিমান নামিয়েছে। মেজর শুধু তাকে অতি ব্যস্ততার জন্য ভৎর্সনা করেন। এবারেও তিনি বললেন, মনে

রেখো, হূনদের তাড়া করতে তুমি যাচ্ছ না, তুমি যাচ্ছ বিমানগুলিকে রক্ষা করতে।

ভোরবেলাই লুই আপন মনে ভেবেছে, লেনার বদলে ক্লাভা যদি খাবার ঘরে থাকে তো বেশ হয়। সে হাসলো, সত্যি, দিনকে দিন কি রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। পথের পাশে ফার গাছগুলি গুনতে-গুনতে যাই। 'কাল' একথাটা উচ্চারণ করতেও ভয় পাই। কি জানি কখন পড়বে শয়তানের দৃষ্টি, ঘুমের ভিতরেও বুঝি কাঠ ছুঁয়ে দিব্যি গালি। ক্লাভাও ঠিক আমারই মতো···কি চমৎকার মেয়ে···পৃথিবী কত সুন্দর হতে পারত, কিন্তু সব উলটে-পালটে গেছে···।

লুইরা চললো। জার্মান সৈন্যদলের ছাউনি ব্রায়ানস্ক রোডে, সেখানে ওরা আক্রমণ চালালে। লুই দেখতে পেলে, জার্মানরা ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। আকাশে শত্রুর বিমান নেই। তাই সে খেয়ালখুশী মাফিক একটু দাগরাজি করে নিলে। হঠাৎ ছ'টা 'মেসার' আর দুটো 'ফক্‌স' মেঘের ভিতর থেকে এসে হাজির। লুই ষ্টর্মোভিকস্'দের জানালে, শত্রুর বিমান সংখ্যা বেশী, ঘাটিতে ফিরে চল। মাঝখানে চলেছে বিমানগুলি, লুই আর রেণে শত্রুর বিমান আক্রমণ করছে না, ষ্টর্মোভিকস্‌দের অরক্ষিত রাখা যাবে না। লুইর পক্ষে এতো অসহ্য। একটা জিনিষের গর্ব সে করে না, সে হচ্ছে 'ঠাণ্ডা মেজাজ'। তিনখানা মেসার তাকে হঠাৎ ঘিরে ফেললো। সে ঘোড়া টিপলে মেসিন গানের, একটা মেসার আগুন ধরে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল। দ্বিতীয় মেসারখানা পালিয়ে গেল ; আর তৃতীয়খানা লেগে রইল তার পিছনে। রেণে ঘুরে এসে তাকে তাড়িয়ে দিলে। আবার দুখানা 'মেসার' আর দুখানা 'ফক্‌স' লুইকে আক্রমণ করলে। তার বিমানখানা কেঁপে উঠলো ; একটা ভীষণ ব্যথা তার দেহে। সবকিছু মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে—অন্ধকার ঘিরে ধরছে। সমস্ত শক্তি জড়ো করলো লুই। বিমানখানা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে···না, পারব না···কিন্তু পারতে হবে···তার মনে হোল, নিচে সে দেখছে ফ্রান্সের টালি-ছাওয়া ছাদের সার আর আঙুর ক্ষেত।

রেণে একখানা ফক্‌সকে পেড়ে ফেলে ঘাটিতে নির্বিঘ্নে ফিরে এল। সে মেজরকে জানালে, লাঁসিয়ে একখানা বিমান ফেললে, তারপরে ওরা তাকে ঘিরে

ফেলে, এবার সে আরো উপরে উঠে এল, শত্রু বিমানগুলি ছুটলো তার পিছনে। আমার মনে হয় ও কোথাও না কোথাও নেমে পড়েছে।

মেজর হুকুম দিলেন, রাতে নামবার বন্দোবস্ত রাখতে। রেণে সারারাত প্রতীক্ষায় রইল, কিন্তু লুই ফিরে এল না। পরদিন সকালে খবর এল ট্যাঙ্কবাহিনী একখানা 'ইয়াক' বিমান ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় দেখেছে। তাতে ফ্রান্সের তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ছিল। বিমানঘাটি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে পড়েছিল বিমানখানা।

সার্জির সঙ্গে যেখানে দেখা হয়েছিল, সেই ঘন গাছপালার ভিতরই ওরা তাকে কবর দিলে। বহু বার্চ গাছ সেখানে। সাদা, সরল গাছ, সতেজ, সরু গাছ—হয়তো বা একটু বেশি সাদা আর সরুই হবে তাদের বয়সের তুলনায়···রুশ কর্ণেল সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, হে সাথী, ঘুমাও। 'সাথী' কথাটায় সবাই যেন আরো মনমরা হয়ে গেল, এতে বুঝি এক তীব্র অনুভূতি আছে। বৈমানিকরা ঘিরে দাঁড়ালো সমাধি। সবারই মনে সেই সুদূর দেশের ভাবনা—যেখানে তারা বেড়ে উঠেছে, খেলা করেছে, করেছে প্রেম। সাইপ্রাস, মার্টল, গোলাপে ভরা সমাধির ছবি তাদের মনে পড়লো। ফরাসী দেশের সমাধিক্ষেত্র···রূপালি জলপাই বনে ঘেরা, পপলার আর ডুমুর গাছে ঘেরা সমাধিভূমি। একজন বৈমানিক একটা বার্চ গাছ দেখিয়ে দিয়ে বললে, আমার শহরেও অমনি গাছ আছে···রেণে সবার শেষে এল সমাধির কাছে, সে বন্ধুর কবরে একমুঠো মাটি ঢেলে দিলে। এই মাটি লুই ফ্রান্স থেকে সঙ্গে করে এনেছিল। তাকে বিদায় অভিবাদন জানালো বন্দুকের শব্দ।

ক্লাভা তার খাতে বসে বহুক্ষণ কাঁদলো। ওর জন্যে এত দুঃখ করছি কেন? আমাদের কেউ ও নয়, তবু যেন মনে হয়, ও আমার কাছে সবার চেয়ে বেশি··· হয়তো, ঘর থেকে এত দূরে এসে মরলো বলেই আমার এই দুঃখ। ও বলেছিলো, ওর বৌ নেই, ভালোবাসার মানুষও নেই, শুধু আছে ফ্রান্স। আর তো ও ফ্রান্সকে দেখতে পেল না···!

পাঁচ

একথা বলা হয় যে, সুশৃঙ্খল জীবন যাত্রায়, দৈনন্দিন জীবনে পদ্ধতি আর পরিবেশে শান্তি থাকলে খুব দুঃখও সওয়া যায়। নাতাশাকে কিন্তু এ শক্তি জোগাচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ঘটনার শোচনীয় পরিণতি, উনিশশো একচল্লিশ আর বিয়াল্লিশের তিক্ততা, আর এই যে জীবনের সঙ্গে খাপ খায়না এমনি জীবনধারা ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একমাস আগে তার মনে ভাবনার অন্ত ছিল না; তখন খবর বেরুত যে জার্মানরা আবার আক্রমণ শুরু করেছে। সবাই অস্থির, উদ্‌বিগ্ন। মার্চে জার্মানরা কারকভ দখল করে নিলে। আবার কি তারা সফল হবে ?··· নাতাশা জানত, দিমিত্রি আলেক্‌সিয়েভিচ কার্স্ক-এর কাছে কোথাও আছেন। কিন্তু বেশীদিন এ উদ্‌বিগ্নতা রইল না। এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল, কেউ আর কার্স্ক-এর কথা বলে না। সবাই তখন অপেক্ষা করছে, ওরেল আক্রমণের ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। দিমিত্রি আলেক্‌সিয়েভিচ নাতাশাকে লিখলেন, ওদের 'বাঘ' আমি দেখেছি, অতবড় দৈত্য তৈরী করতে কত সময় আর টাকা লাগে তাও ভেবে দেখেছি, তবুও তো ঐ বাঘকে চূরমার করে দিলে আমাদের গোরোকভ। বেচারা যুদ্ধের আগে এক মুরগী-হাঁস পোষা খামারে কাজ করতো। কাল ওর অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অস্ত্র করলাম···।

নাতাশা বসন্তে ফিরে গেল মস্কৌতে। আস্তে আস্তে শহর যেন শান্তির সময়ের ভাবটা ফিরে পাচ্ছে, বহু থিয়েটারের দরজা খুলেছে, পথে মোটরেরও মেলা। কিছু লোক শান্ত হয়ে নিজের নিজের কাজকর্ম করছে। বাড়ির কথাও এখন ওঠে—কেউবা বাড়ি থেকে উৎখাত হোল, কেউবা নতুন এল। দু'বছর বাদে আবার রান্নাঘরে ঝগড়া শোনা যাচ্ছে। বাজারও এখন মিলছে, কেনা-বেচা চলছে পুরোদমে, ষ্টোরে আবার শুরু হয়েছে বেচা-কেনা। আর এরই পাশে

পাশে আছে তারা—যাদের বিবেক বাঁধা পড়ে গেছে রণাঙ্গনের সঙ্গে—যাদের হৃদয় আর বুকের রক্ত দিয়ে তার সঙ্গে যোগসূত্র গাঁথা—তারাই করছে অমানুষিক পরিশ্রম। মস্কোর বাড়িগুলির ভিতরে তাকিয়ে না দেখলে ওরেলের অভিযানের কথা বোঝা যায় না। কারখানায় মেয়েরা নুয়ে পড়ে টেনে তুলছে ভারী বোঝা ; টিফিনের সময় ছেলেমেয়েরা খেলছে চাকাওলা গাড়ি নিয়ে—ছেলেমেয়েরা তো খেলবেই—না খেলে ওরা থাকবে কি করে। বুড়োরা যাদের পা কি হাত গেছে, তাঁরা ইস্কুলে পড়াচ্ছেন। মস্কো যুদ্ধের ঘামে জবজবে। নাতাশার পড়শী মারিয়া এক বারুদের কারখানায় কাজ করে। সে ঘুমোবারও সময়টুকু তেমন পায় না, নাতাশাও পায় না। যখন দেখা হয়, ওরা মিউনো আর ফোলা ফোলা চোখ তুলে তাকায়। চোখে তাদের ইচ্ছাশক্তি ক্লান্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝছে।

নিজের শহরে ফিরে এসে দুঃখ তার যেন আরো বেড়ে গেল। এইখানেই সে বড় হয়েছে, মার সঙ্গে এইখানেই কাটিয়েছে জীবন, গোগল বুলেভারে বালির খাদে বসে করেছে খেলা, স্কুলে গেছে আবার এইখানেই ভাস্যার সঙ্গে তার দেখা। তাইত তার দুঃখ যেন নতুন করে আবার দেখা দিলে। সব আশা সে ছেড়ে দিলে। তার বাবা যখন প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের দলের কথা লিখলেন, সে ভাবলে, বাবা, আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন···সে তো জানে ভাসিয়া আর নেই, মরে গেছে। কিন্তু তার ভালবাসা তো মরে যায়নি, বরং তার শিখা আরো উজ্জল, এমন বুঝি আগে কখনো ছিল না। মাঝে মাঝে সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে বসে : মরা মানুষকে কি এমনি করে ভালবাসা যায় ?···

তার ঘরে সে পেল তাকে লেখা ভাসিয়ার চিঠি আর ভাসিয়ার টোকবই, তাতে আবার ছবি আঁকা। যখন মিনস্ক-এ যায়, তখন ওগুলি ভুলে ফেলে যায়। প্রতিটি তুচ্ছ জিনিস ওর দুঃখ বাড়িয়ে তোলে ; মনে পড়িয়ে দেয় ওর স্মৃতি। একটা চকোলেটের খালি বাক্সও স্মৃতি জাগায় (ভাসিয়া ওর জন্মদিনে ওকে ঐ বাক্স কিনে দিয়েছিল)। ও এত লাজুক, কিছুইতে ওর হাতে তুলে

দেয় নি, বইয়ের পাতার ভিতরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল। ওতো ভেবেই পায়নি, কে দিল; অনেক পেড়াপীড়ি করে তবে কথাটা বার করে; একটা ভাঙ্গা ফুলদানিও আছে (ভাবধারা সমন্বিত ব্যালে নৃত্য হয় কিনা এই নিয়ে তুমুল তর্ক করতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে ভাসিয়া টিপয়টা উল্টে দিয়েছিল।)...

নাতাশা ভাবে, কি ছেলেমানুষ ছিলাম আমরা। ভাসিয়ার সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের কথা মনে পড়ায় অমনি ভাবে। এক রাতে মৃত্যু নিয়ে আলোচনা চলছিল। নাতাশা বললে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী একথা ভেবেই তো মানুষের জীবন আরো কঠোর হ'য়ে ওঠে; ভাসিয়া উত্তর দিলে, বিজ্ঞানীরা তো মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়ছেন। আর একবার নাতাশা বলেছিল, দুঃখকে ও ডরায়। অমনি ভাসিয়া উত্তর দিলে, দুঃখবাদী হওয়া সোজা কিনা। ওরা বহু বই পড়ত তখন, যা পড়ত তাই নিয়ে ভাবত···কিন্তু জীবন যে কি সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না···।

তার বন্ধুরা বলে, ও নাকি দেখতে আরো সুশ্রী হয়েছে; চেনাই নাকি যায় না। কিন্তু বাইরেই শুধু পরিবর্তন হয়নি। গোরেভ এল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ক্রাইলভদের এখানে যুদ্ধের আগে থেকে ওঁর যাতায়াত ছিল। নাতাশাকে তখন ও খুদে মেয়ে বলে মনে করতো। এবার তো প্রেমেই পড়লো। মনে মনে সে ভাবলে—তাইত, ও যে এমন অদ্ভুত—এতো আগে লক্ষ্য করিনি। হাঁ, একেবারে অদ্ভুত মেয়ে নাতাশা।··· সে ভাষাতত্ত্ববিদ্, এখন গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর, বুদ্ধিজীবী; আবার কেমন অদ্ভুত ধরণের মানুষ—যুদ্ধে সাহসী, কিন্তু হৃদয়ের খেলায় ভীরু। বিদায়ের আগে ছাড়া সাহস করে ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারেনি। নাতাশা তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে কোমল অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, না, ওকথা বলো না। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো; ভাবলে নাতাশা বুঝি তাকে যা-তা ভাবলে। কিন্তু বিদায় নেবার সময় নাতাশা তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, রাগ কোরোনা, অন্য কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি একজন খাঁটি বন্ধু—তাই একথা বলছি···নাতাশা জানে, জীবনে আর সুখের মুখ দেখবে না। সে যে স্বামীর স্মৃতিতে বিশ্বাসী সেজন্যে নয়, সে জানে

প্রেম আর ফিরে-ফিরতি করা যায় না, যতটুকু প্রেম ছিল ভাসিয়ার জন্যে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছে।

নাতাশা এখন বোঝে, দুঃখ মানুষকে মারতে পারে না। মানুষ দুঃখ করে, আবার বেঁচেও থাকে। দুঃখ বরং ভিতরের সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে আত্মাকে উন্নত করে। সার্জন, নার্স, রোগী—সবাই নাতাশাকে হাসিখুশি মেয়ে বলে জানে। তারা বলে ওর মতো কেউ সান্ত্বনা দিতে পারে না; পারে না স্নেহের উষ্ণতা ছড়াতে। মারিয়া বহুদিন স্বামীর চিঠি না পেলে নাতাশার কাছে আসে। নাতাশা তাকে বলে দেয়, কাল সে নিশ্চয়ই চিঠি পাবে। না হয়তো পরশু—আরো বলে, পিতর ইভানোভিচের কিছুই হয়নি। নাতাশার কাছ থেকে সান্ত্বনা পেয়ে মারিয়া চলে যায়। নাতাশা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রহস্য মৃত্যু নিয়ে ভাবতে বসে। আমাদের ওর কাছে আত্মসমর্পণ তো করতে হবেই—সত্যিই কি তাই?··· না, ভাসিয়ার মতো এই বলে সান্ত্বনা দেব নিজেকে যে, আমাদের বিজ্ঞানীরা একদিন অমরতা আবিষ্কার করবেন।··· সবকিছু যখন সহজ ছিল, ঠাকুরমা তখন ভাবতেন জন্মান্তরের কথা···কিন্তু মানুষের আলাদা কোনো ভাগ্য বোধ হয় নেই। তোমার নিজের ব্যক্তি-সত্তার কোটরে যখন জীবন কাটাচ্ছ তখন মৃত্যু তো ভয়ংকর। একটা বন যদি জীবন্ত থাকে, একটা গাছ মরলে কি আসে যায়। মারিয়া যে কাল চিঠি পেয়েছে এতে আমি খুশী। ও যে সুখী এতেই আমার সুখ···জার্মানদের কাস্ক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে···খুদে ভাসিয়া বাড়ছে···।

নাতাশা বোঝেনা, খুদে ভাসিয়া তার কতখানি অবলম্বন। সে ভাবে, তার বুঝি আর ব্যক্তিগত জীবন নেই। কিন্তু যখন সে ছেলেকে কোলে নেয়, আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়, আর হাসে। সে হাসি অস্পষ্ট আবার বিব্রত; ভাসিয়া এমনি হাসিই দেখেছিল তার মুখে। ভাসিয়া সেই জ্বলন্ত শহরে সেদিন কি বলেছিল, তাও প্রায়ই মনে পড়ে: আমরা একত্র থাকব—চিরদিন একত্র থাকব।··· জুনের সেই রাতটি এখনো নাতাশার বুকে বেঁচে আছে, আর আছে খুদে ভাসিয়ার

প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীতে। নাতাশা ওর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে গল্প করে। ও যখন হাসে, তার মনে হয়, ও সবই বোঝে, ও জানে ওর দাবী আছে হাসবার আর বাঁচবার। কেমন হবে ওর জীবন? এখানে ফ্যাশিষ্ট শাসন বসবে, বিশ বছরের ভিতরে বোমা আর ঘৃণায় এদেশের বুক কালো হয়ে উঠবে, একথা তো বিশ্বাস করা যায় না।

হাসপাতালের কাজে তার বহু সময় চলে যায়; চলে যায় আত্মার অনেকখানি শক্তি। যুদ্ধের পরিস্থিতি বদলে গেছে, জার্মানরা আর মস্কো হানার দেওয়ার ভয় দেখায় না; তবু গোলা, মর্টার, বোমার কামাই নেই, মানুষকেও তারা ধ্বংস করছে। তার নার্সের ঢিলে পোষাকটি পরবার পর নাতাশা তার দৈনন্দিন জগতে চলে যায়। এখানে যুদ্ধ সামরিক কৌশল বা উন্মাদনার রূপ নিয়ে আসে নি, এখানে নেই আয়াসসাধ্য শ্রম; শুধু আছে দুঃখ, সে দুঃখের বিরতি নেই।

বৈমানিক রায়াজান্তসেভকে নিয়ে আসা হোল হাসপাতালে। মাথায় পেয়েছে আঘাত। আর একজন রোগী বললে, রায়াজান্তসেভ বোমারু বিমানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ব্রায়ানস্ক এলাকায়; একটা গোলা এসে তার বিমানে লেগে আগুন ধরিয়ে দেয়; বৈমানিক জ্বলন্ত বিমানখানা আমাদের কোটে এনে ফেলে। রায়াজান্তসেভের খুলিতে চোট লাগে। সার্জন বলেছেন, এযাত্রা ও রক্ষা পাবে। এখন তো প্রলাপ বকছে।·· আমি ঘুরিয়ে দিলাম···টিনি···; আমাকে আড়াল করে দাঁড়াও।··· ইসেঙ্কা তো গড়িয়ে পড়ছে···কোটে পড়ছে ···আবার সে চেঁচিয়ে উঠলো, মাশেঙ্কা, ঐ মাছিটাকে তাড়াও, ও এখুনি তোমাকে কামড়ে দেবে···ওরা ফুলের গন্ধ পায়···ওখানে অতো গিলিফুল এল কি করে?··· কিন্তু কোথায় টিনি, মাশেঙ্কা আর গিলি ফুল, শুধু আছে হাসপাতালের সাদা দেয়াল আর নাতাশা—রায়াজান্তসেভের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে—তার মনে হোল, ভাসিয়া ওখানে শুয়ে আছে। ভোর অবধি সে বসে রইল বিছানার পাশে, ভোরে মারা গেল রায়াজান্তসেভ।

তোপ দাগা হোলো, নাতাশা তারই শব্দ শুনে অবাক হয়ে গেল, সে সেদিনের বিজ্ঞপ্তি শোনে নি। মারিয়া নিকোলায়েভ্না জানালে, ওরা ওরেলের জন্য তোপ

দাগছে,···দেখ, দেখ! কি সুন্দর!··· তোপের শব্দে খুদে ভাসিয়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ; নাতাশা তাকে কোলে তুলে নিতে সে চুপ করলে। দৃশ্যটি চমৎকার, সবুজ আর লাল হাউই আকাশে উঠে এল তারপরে নিবে গেল, প্রতিবারেই ভ্রাম্যমান তারার মতো তারা খানিকক্ষণ আকাশে ছড়িয়ে রইল, তারপর নিবে গেল। ওরা নিবে যেতে বুঝি চায় না, তাই এই আকুতি। নাতাশা হাততালি দিলে। খুদে ভাসিয়ার মুখেও হাসি। নাতাশার চোখের সুমুখে এবার ভেসে উঠলো রণাঙ্গনের ছবি—ওখানকার হাউয়ের চেহারা আলাদা, আর বন্দুকও অমনি করে গর্জে ওঠেনা—অমনি করে, আবার অমনি করে বুঝি নয়···এই মুহূর্তে একজন মরছে··· একটা সবুজ হাউই বাড়ির ছাদগুলি আলোয় আলো করে দিলে। নাতাশার মনে পড়লো রায়জান্তসেভের ভয়ার্ত চোখ। আবার বিস্ফোরণ, আবার হাউই উঠলো। ওরেল দখল করেছি আমরা, চমৎকার নয়? নাতাশা শুধু আঁউড়ে গেল, চমৎকার, চমৎকার!···

অন্ধকার আর নীরবতা। মনে হয়, এত শান্ত তো ছিল না প্রকৃতি, রাতও ছিল না এত ঘন আর কালো—তোপ দাগবার আগে তো এমন ছিল না। মুহূর্তের জন্য নাতাশার মনটা দমে গেল—সুখ আর আসবে না···সে তার নিরাশার আবেগ আবার দমন করলে ; প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে বেশ খুশী মনেই বললে,

চমৎকার ব্যাপার কিন্তু, আমাদের ভাস্কা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে,···আর কি, শীগ্‌গিরই এসব শেষ হয়ে যাবে—দেখো মারিয়া—আমি ঠিক বললাম। শুধু ওরেলই আমরা দখল করিনি ; জার্মানদেরও হয়ে এসেছে···পিতর ইভানোভিচ শীগ্‌গিরই বাড়ি ফিরবেন। হাঁ, এই আমার বিশ্বাস।···

পরদিন সকালে দিমিত্রি আলেক্‌সিয়েভিচকে সে চিঠি লিখলে,

বাবা,

ওরা তোমাকেও অভিবাদন জানিয়েছে। আমি ভাস্কাকে নিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, সব দেখেছি। কি সুন্দর। সকলের মনে যা হচ্ছিল, তাই যেন ওরা প্রকাশ করলে। একটি হৃদয়ে যখন স্পন্দন ওঠে, তখন তো

সবাই তা শুনতে পায় না। কিন্তু ঐ তোপে সকলের মনের কথা প্রকাশিত হোলো। এমন সুখের দিনের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি বাবা।…

ছয়

ওসীপ হাসছিল। সবকিছু দেখেই সে খুশী হচ্ছে—সাদা কুঁড়েঘর, কালোরাত, ইউক্রাইনের ধরণে 'জি' কে, 'এইচ'-এর মতো উচ্চারণ, আর ওরা কিয়েভের প্রতিদিন কাছে এসে পড়ছে—এই সব মিলেই তো আনন্দ… জার্মানরা আক্রমণ প্রতিরোধ করবার বৃথা চেষ্টা করছে। কখনো বা এত তাড়াতাড়ি পিছু হটছে যে বাড়ি-ঘর পোড়াবার বা অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেবারও সময় পাচ্ছেনা। গ্রামের পর গ্রাম, মানুষ বাস করছে সেখানে। মেয়েদের চোখে কোমলতা, খানিকটা বা দুষ্টুমি; আতিথ্যপরায়ণা গৃহিণীরা ঘরে চোলাই-করা মদ, সর আর লাউ-কুমড়ো সেদ্ধ পরিবেশন করছেন অতিথিদের আর বলছেন, অমন যে বর্বর জার্মান, ওরাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল।

এক বুড়ী ট্যাঙ্ক, কামান আর ট্রাকের সার দেখে বুকে ক্রশের চিহ্ন আঁকছিল। সে বললে, সেই সকাল থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, ওরা আসছে তো আসছেই, একটু কামাই নেই। অথচ জার্মানরা বলতো, রুশদের সৈন্য নেই!…সবাই এখন প্রতিরোধ-যোদ্ধা। আসল প্রতিরোধ-যোদ্ধারা বন থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা নকলদের দিকে চেয়ে আছে। ওসীপের মনে হোল,

চোখ তার আনন্দের ঢেউয়ে ভিজে গেছে। আনন্দের বান তো বয়ে চলেছে।

এবার এল তিক্ততা। জার্মানরা বাকি কিছু রেখে যায় নি। রাতে দেখা যায় জলন্ত গ্রামের আগুন চারদিকে। ধোঁয়ার জন্যে নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। জার্মানদের গুলী করে মারা গোরুগুলি পড়ে আছে, পেট তাদের ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। দগ্ধ গ্রামে এখানে ওখানে অধিবাসীদের ভিড়। মেয়েরা বলছে, জার্মানরা যেন পাগলের মতো ছুটে পালাল, আমরা শনের ক্ষেতে পালিয়ে রইনু গো···এক গ্রামের কারখানায় এক বুড়োর সঙ্গে ওসীপের দেখা। জার্মানরা সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে, অধিবাসীরাও পালিয়ে গেছে; শুধু রয়ে গেছে এই বুড়ো। যাদুকরের মতো ঝুলেপড়া তার ভ্রূ; পৃথিবীর সম্বন্ধে সে উদাসীন। আর এক গ্রামে ওসীপ দেখলে কাটা আপেল গাছ; পাতা এখনো বিবর্ণ হয়ে যায় নি, শাখায় এখনো সতেজ সবুজ দলমেলে তারা কাঁপছে, ডাঁসা আপেলগুলো আগষ্টের রোদে পাকছে। এই যে ইচ্ছে করে গাছ কেটে রেখে গেছে, এ যেন বাড়িগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার চাইতেও ভয়ংকর। ওসীপ মুখ ফিরিয়ে নিল,···মানুষের ক্রোধের অন্ধতা দেখে সে ক্ষুব্ধ হোল।

আহত সার্জেণ্ট সেলেৎসকী হাসপাতালে যেতে নারাজ। সে ওসীপকে বললে, ওদের একেবারে তাড়িয়ে দিয়ে তবে যাব···সবার মুখেই এককথা, এরই জন্য যেন তারা বেঁচে আছে। ক্লান্তি, হৃদয়ের ব্যথা ভুলে গেছে; মানুষের মনের আনন্দ যেন এসেছে জরের ঘোর নিয়ে, তারা কাঁপছে সেই ঘোরে। ক্রোধ আর অসহিষ্ণুতাও আছে।

জার্মানরা আবার দেসনায় গিয়ে আর একবার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে এমনি আশা করা গেল—সে এক প্রকাণ্ড নদী—ডান পার বেশ উঁচু। জার্মানরা তাদের ইশতাহারে যে "পূর্ব দেয়ালের" কথা বারবার বলেছে, এখানে বুঝি সেই দেয়ালের শুরু। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল মেদভেদভ সদর সামরিক ঘাঁটিতে জরুরী কাজে গেছেন, ওসীপ এখন পল্টনের অধ্যক্ষ। সে মিনায়েভের

পন্টনে গেল, নদীর ওপারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা জায়গা আবিষ্কৃত হোলো, পার এক জায়গার ঢালু হয়ে গেছে, তারই নীচে বালুর সংকীর্ণ বিস্তৃতি ; এখানেই ওরা নৌকা ভাসাবে। স্যাপাররা টেলিফোন পোষ্ট আর কাঠ নিয়ে এল। ভেলা তৈরী হোল। ওরা দেস্না এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে এল যে, জার্মানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। যুদ্ধ হোল খুবই কম।

মিনায়েভ একখানা বেঞ্চে বসেছিল—নীচে দেস্না বয়ে যাচ্ছে, তার চারপাশে চর্নিগভের ধ্বংসস্তূপ। উনিশশো একচল্লিশে জার্মানরা এই শহর ধ্বংস করে দেয়। ইঁটের পাঁজায় এখন ঘাস গজিয়েছে, আগাছায় ধরেছে ফুল—এযেন পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ? যেন রোম।··· শুধু এখানে ওখানে মরচে-ধরা সাইন-বোর্ড, এতেই মনে পড়িয়ে দেয় কিছুদিন আগেও এ নগর ছিল জীবন্ত। পাঠাগার, মদ আর ফলের দোকান এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। গরম দিন, প্রথম হেমন্তের আভাস। বাদাম গাছের পাতায় পাতায় সোনালি রঙ। মিনায়েভ হাসলো···দেস্না পার হয়ে এসে ভালই লাগছে···আগে সে কখনো ইউক্রাইনে আসে নি, তার উজ্জ্বল রং, পটভূমি, উত্তরের মানুষের চোখে যেন অভিনব ঠেকে, মুগ্ধ করে দেয়।

বুলেভার ধরে সে চললো। ওলিয়ার সঙ্গে দেখা। সেও একা বসে আছে, দৃশ্য দেখছে প্রশংসমান চোখে। সে বসলো তার পাশে, ওকে ক্ষেপাতে ইচ্ছে হোল, কিন্তু কি বলবে ভেবে পেলনা। ভারি মজা না, সে ভাবলে। পন্টনে আমার মতো এমন আর কেউ ক্ষেপাতে পারে না। ওসীপ তো আমাকে সেনাবাহিনীর সেচেভ্রিণ (বিখ্যাত রুশ হাস্যাভিনেতা) বলে, কিন্তু ওলিয়ার কাছে আমি যেন ভীরু বাছুর বনে গেছি।···

সে তার পাশে বসে পড়ে শুকনো একটা ডাল নিয়ে বালির উপর আঁকি-বুকি দিতে লাগলো, এবার রুমাল বার করে মুছলে মুখ, ভারি অবাক কাণ্ড, গরম লাগছে, অথচ এখন তো বেশ ঠাণ্ডা। শেষে সে বললে,

চমৎকার দৃশ্য না !···

ওলিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলে, হাঁ। সে সুচতুরা, নিজেকে সামলে নিয়েছে। কখন ক্যাপটেন ক্ষেপাতে শুরু করবে কে জানে, সবাই মিনায়েভের ভয়ে তটস্থ—এমন ধারালো তার জিভ ; আবার ওলিয়ার তো আরো ভয় ; সে নিজের মনে মনে স্বীকার করেছে, ক্যাপটেনকে তার ভারি ভাল লাগে। ওলিয়ার উনিশ বছর বয়েস ; যুদ্ধের আগে বার বার প্রেমে পড়েছে—প্রথমে এলেন এক ইতিহাসের অধ্যাপক, তারপর ভাগতানভ থিয়েটারের এক অভিনেতা—তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ; ডায়েরীতে সে লিখেছিল, এবারে নিয়তি এল আমার, সারা সন্ধ্যেটা ও ভারিয়ার সঙ্গে নেচে কাটালে, ওকে এর জন্যে কথনো ক্ষমা করা হবে না। একমাস পরে আবার নোটবুকের মার্জিনে লিখলে, এসব ছেলে-মানুষি—ক্ষণিকের মোহ, আর কিছুতো নয়···হাঁ, যুদ্ধের আগে ভালবাসার কামনা ছিল ওর উগ্র ; বইয়ে যে ভালবাসার কথা সে পড়তো সে তো কত মহান আর রহস্যময়। সেই রহস্যময়তা ওকে টেনে নিয়ে গিছলো ভালবাসার পথে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তো স্বপ্ন চলে না। যা সে দেখছে, তাতে তো ভালবাসা জুড়িয়ে গেছে, নিবেই বুঝি বা গেছে। সিগন্যালের মেয়ে লুদা মেজর কোসকারিয়ভ-এর সঙ্গে প্রথমে রইল, তারপরে জুটলো লেফটেনাণ্ট নেস্তেরভের সঙ্গে। ক্যাপটেন জোলুৎকীন নার্স আব্রামসেভার সঙ্গে ভাব করে নিলেন। তিনি তো বলতেন, ইয়ারোশ্লাভল্-এ তার বৌ আর ছেলেমেয়ে আছে, যুদ্ধ জয়ের পর তাদের কাছে ফিরে যাবেন, নার্স তার যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গিনী—যুদ্ধসঙ্গিনী। এই যে একমাস বা এক বছরের স্ত্রী এদের বলে "তাঁবুর স্ত্রী", ওদের সম্বন্ধে মানুষ যা-তা ঠাট্টা করে। ওলিয়ার মা লিখেছেন যে, কোভ্রিজিনের বউ আর একটা নতুন স্বামী জুটিয়েছে। সে বলে বেড়াচ্ছে, ও তো মরতেও পারে, কিন্তু এতো মরবে না···বিরক্তি ধরে যায়! এই যদি ভালবাসা হয় তো সে নাচার। ভালবাসা ছাড়াই তার চলে যাবে। ক্যাপটেন মিনায়েভ কিন্তু ভাল লোক, মেয়েদের দিকে তার নজর নেই। আর এমনই লোকটি চালাক-চতুর, মেজর আলপের্ত ঠিকই বলেন, পল্টনে নাকি উনিই সবচেয়ে শিক্ষিত।··· কিন্তু ক্যাপ-

টেনের একটা বড় দোষ, যখন উনি ঠাট্টা শুরু করেন, মনে হয় যেন তুমি জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছ। আবার এক মুহূর্ত পরেই সব ভুলে যান।…

মিনায়েভ জানতেও পারেনি যে, সে ওলিয়ার হৃদয় জয় করেছে; সে তার পাশে বসে বিব্রত হয়ে পড়লো। সে বলতে চাইল, সে শুধু লম্বা-চওড়া কথাই বলেনা, অন্তঃসারশূন্যও সে নয়, ওলিয়াকে তার ভাল লাগে; কিন্তু কি করে কথা পাড়বে তাই সে জানে না। কত রোমান্টিক ঘটনা, কত হাসির গল্প, লারমান্তভ আর হাইনের কবিতা মনে পড়লো, কিন্তু কিছুই যেন যুতসই নয়। ওলিয়াকে তার ভয়, পাছে সে রেগে যায়। ওরা কত সময় কাটিয়েছে খাতে, মিনায়েভ বলতে চেয়েছে মিষ্টিকথা, কিন্তু সাহস পায়নি। পল্টনের সেচেন্ত্রিণ বড় লাজুক, হয়তো যখন তখন ঠাট্টা করাটা ওর মুখোস, অমনি করে ও আড়াল করে রাখে নিজের লাজুক স্বভাব। কিন্তু আজ হঠাৎ—যখন দেস্না পার হয়ে তারা এসেছে, চারদিকে যখন ছড়িয়ে আছে সুন্দর দৃশ্য—

এই মূহূর্তে যে কথা সে বললে—অবাক হয়ে গেল সে নিজেই।

ওলিয়েন্‌কা জান? যখন যুদ্ধ শেষ হবে, যদি বেঁচে থাকি, আর তোমার অমত না থাকে—আমরা তাহলে বিয়ে করব। কি বল তুমি?:……..

ওলিয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো; সে জানতো এমনি হবে। ক্যাপটেন টের পেয়েছেন তার মনের কথা। তাই ঠাট্টা করছেন। সে উঠে দাঁড়ালো।

আমি যাই।

মিনায়েভ পরে ভাবলে, আমি একটা হাঁদা। কি করে ভাবলাম, ও রাজি হবে? ও তো ভাল মেয়ে, ওর হয়তো কত ভক্ত আছে। আমি কি একটা লোক! এখন পল্টনে কেউকেটা বনে গেছি; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে আমি তো আবার সেই উকীল বনে যাব। অর্ধ শিক্ষিত উকিল। আর প্রাদেশিক শহরের পার্কের খেলার সর্দার হব। আর তা ছাড়া চেহারাও তো সরেশ। নাকখানা যেন টার্কির মতো, নাচতেও জানিনা, তাই না ও প্রস্তাব

করবার সময় উঠে পালালো। আর কি বোকার মতোই কথাটা পাড়লাম। এ যেন তেমনি বলা ঃ যুদ্ধের পর আমরা সিনেমা দেখতে যাব···কি আফশোষ, ওর মতো মেয়ে আমার বরাতে আর জুটবেনা! মেয়ে তো আছে অঢেল, কিন্তু যাকে সবচেয়ে পছন্দ হবে, তাকে তো জীবনভোর খুঁজতে হয়। যাক কি আর হবে।- এখন কাজকর্ম করা যাক। বার্লিনে পৌঁছবার কাজই এখন আমাদের সামনে তারপরে না হয় অবিবাহিত জীবনের গর্ব করা যাবে, ভাবা যাবে।

মিনায়েভ নিজেকে ঠাট্টা করলে; ঠাট্টায়ও আনন্দ নেই। মেজাজ খিচড়ে গেছে। চার্ণিগভ এখন যেন বিষাদিত, ম্লান, তার ধ্বংসস্তূপ যেন বিয়োগান্ত কারুণ্যে ছেয়ে গেছে। একটা শহরও ঐ বর্বরগুলো আস্ত রাখেনি। খবরের কাগজে লিখছে; আমরা প্রতিশোধ নেব!···জার্মানদের শহরগুলি পুড়িয়ে দিলে যেন ভাল লাগবে!···

এক সপ্তাহ পরে একখানা কুঁড়েঘরে বসে সে খবরের কাগজ পড়ছিল। ওলিয়া কোণের কাছে বসে ছিল। বিবাহের প্রস্তাবের পরে এই প্রথম তারা একা আছে। মিনায়েভ বললে,

ভারি মজার খবর—জার্মানরা মুসোলিনিকে হরণ করে নিয়ে গেছে। ইতালী গেছে; এখন ইল্‌তুচে-কে রক্ষা করা চাই···তারপর হঠাৎ সে বলে বসলো, আচ্ছা ওলিয়া, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

ওলিয়া আরক্ত হয়ে উঠলো, ও যখন আরক্ত হয়ে ওঠে, গালে আভাস স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। স্কুলে মেয়েরা ওকে এই জন্যে কত জ্বালাত, বলতো, তুই তো মিছে কথাও বলতে পারিস না! ও ক্ষেপে যেত ঃ আমি মিছে কথা বলিনি, আমার রঙটাই অমনি।··· অনেক করে সে নিজেকে আজ সংযত করলে। মিনায়েভ তার মুখ থেকে চোখ আর ফেরাতে পারলো না। শেষে ওলিয়া ফিসফিসিয়ে বললে,

আমাকে ক্ষেপাচ্ছেন কেন ক্যাপটেন?

মিনায়েভ তার কাছে এগিয়ে এল।

আমি ক্ষেপাই নি ওলিয়া। আমার সুখের স্বপ্ন আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে।…

ওরা বুঝলো না কি করে কি হয়ে গেল। হয়তো ওলিয়ার হাত ধরেছিল মিনায়েভ, হয়তো তার বুকের অস্থৈর্য ঘুচাবার জন্যেই ওলিয়া ওর কাঁধে মাথা গুঁজে দিয়েছিল। হঠাৎ ওলিয়া বলে উঠলো, যখন যুদ্ধ শেষ হবে, তুমি তো আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ওলিয়েঙ্কা আমার দিকে তাকাও। আমি কি তেমনি লোক, যে মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে? সত্যিকথা কি জান, আমাকেই মেয়েরা ঠেলে ফেলে দেয়…কিন্তু তোমার আমার কথা আলাদা। আমরা কেউ কাউকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেব না। প্রথমে আমাদের অনুভূতি উঁচু সুরে বাঁধা, দ্বিতীয় কথা, আমরা বহুদিন পাশাপাশি লড়ছি। হয়তো আরো লড়তে হবে……

আমার মনে হয়, 'আপনি'টা ছেড়ে দিয়ে 'তুমি' বললেই ভাল হয়। আর একটা কথা, হিটলার যে পর্যন্ত না ফতে হয় ততদিন কেন অপেক্ষা করব?

মিনায়েভ ওসীপের সঙ্গে দেখা করতে যেতে যেতে নিজের মনে তর্ক শুরু করে দিলে, ওকে কি আমাদের বিয়ের কথা বলব, না, না বলাই ঠিক হবে?

ওসীপ উত্তেজিত হয়ে আছে—আর তাও যেন অস্বাভাবিক রকমের।

ইউক্রাউনের রণাঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনীকে পাঠানো হচ্ছে। এর মানে কি জানো? কিয়েভ অভিযানে আমরা থাকব। এখন নির্দেশ পাকুল-পাসেইকার দিকে চলার। তারপরে—নিপার।…

আমরা এবার এসে পৌঁছেছি, মোড় ঘুরেছে তা বোঝা যাচ্ছে। ফ্রিৎসদের আর সে বিক্রম নেই। আমাদের সৈন্যদেরও সাহস বেড়ে গেছে…এই তো আজ একজন প্রাইভেট বললে, আমি বড় ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করলাম, এত ব্যস্ততা কেন? ও জবাব দিলে, এখন যুদ্ধ ফতে করে দিতে হবে…ফ্রিৎসরা

ভেবেছে নিপারের পারে শীতটা কাটাবে, কিন্তু আমরা ওদের তা দেব না। মনে তো হয়, সব শেষ হয়ে এল বলে……

হাঁ, শেষ হবেই, মিনায়েভ বললে, আমি আর একটা প্রমাণও দিচ্ছি—আমি বিয়ে করব। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? একেবারে ঠিক। মেয়েটিকেও তুমি চেন—আমাদের ওলিয়া।

ওসীপ অবাক হয়ে গেল। হাঁ, হাঁ, ওলিয়া একটি মেয়ের নাম বটে—সেই যে যার লাল চুল,…হাঁ, কিন্তু বিয়ে করছে কেন?

ওর ভাবনার ধারাটা মিনায়েভ আঁচ করে নিলে।

তুমি যে কথা বলছ এই তো তার সবচেয়ে সেরা প্রমাণ। একবছর আগে কি একথা ভাবতে পারতাম?—সেই টিলাটার কথা মনে আছে? কেউ যদি তখন বলতো, এক বছর পরে তুমি একটি মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে, তাকে জাহান্নমে যেতেই বলতাম…… তখন বিয়ের বদলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাই ভাবছি।……তুমিই তো বললে, মোড় ঘুরেছে। হাঁ সত্যিই ঘুরেছে। আচ্ছা, আমার পছন্দ কেমন বল তো? তোমার কি মনে হয়?

ভালই। মেয়েটি বেশ। গম্ভীর স্বভাব। কিন্তু এ যে একেবারে অবাক করে দিলে। সবাইকে নিয়েই তুমি ঠাট্টা করতে আর বড়াই করে বলতে, তোমার ওসব বন্ধনের বালাই নেই—আর তুমিই কিনা হঠাৎ… তাও আবার দেস্না থেকে নিপারের মাঝখানে…এ যে রীতিমতো নভেল হে!…

মিনায়েভ চলে গেলে ওসীপের এই প্রথম মনে হোল, যুদ্ধ সত্যিই শেষ হয়ে এসেছে, সে এবার কিয়েভ-এ ফিরতে পারবে। রায়াও ফিরবে, আর মা আর আলিয়াস্কা। হয়তো মা মারা গেছেন। মা কেমন আছেন লেখায় রায়া জবাব দেয়নি। এমনি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মার টিঁকে থাকা সত্যিই শক্ত—প্রথমে বাস্তুহারার মিছিল, তারপরে তাদের দুর্বহ জীবন। চৌষট্টি বছর বয়সে এ ধকল সামলানো দায়…হঠাৎ ওসীপ ভয় পেল। রায়াও তো যুদ্ধক্ষেত্রে। আজকে কিছুক্ষণ আগেও এইটেই ছিল স্বাভাবিক,

কিন্তু এখন তো ভয় করছে। আমি লড়ব, কিন্তু রায়া কেন ছুটে এল?… সাধারণ সুখটুকু তার চাই—যুদ্ধ শেষে সে ফিরে যাবে বাড়ি, ফিরে পাবে তার স্ত্রীকে, এই তো তার কামনা।… হয়তো মিনায়েভ-এর কথায়ই ভাবনা হচ্ছে—নারী, ভালবাসা, আরাম, এ যে হানা দিয়েছে যুদ্ধমান এই দুনিয়ায়। হয়তো কিয়েভ কাছে বলেই বুকে এই তোলপাড় উঠছে? কাল সেনাধ্যক্ষ বলেছেন, আর বেশী দেরী নেই…হাঁ, কিয়েভ খুবই কাছে। আমরা অবশ্য আরো উত্তরে চার্নো-বিলের দিকে যাচ্ছি। তবু কাছে এসে গেছে। তিনি মানচিত্রে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মন তো মানে না। নিজের শহরের কথা মনে পড়ছে।—গাছপালা, আঞ্চলিক ভাষা, তারার দল। খাড়া পথ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐ পথে রায়ার সঙ্গে সে কত বেড়িয়েছে। আবার কি পার্কে ওরা একসঙ্গে যেতে পারবে?… রায়া না বলেছিল, এর সঙ্গে ইয়াসচেঙ্কোর সম্বন্ধ কি?… দীর্ঘ ঘন পক্ষ্ম তার আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল বার বার। তোমাকে কতখানি ভালবাসি, সেকথা কি ওকে বলতে পারি?

তুমি কিচ্ছু বোঝ না—কিচ্ছু না!…আর সত্যিই তাই—সে তখন বহু জিনিস বুঝতোনা—শুধু জানতো খসড়া-মাফিক সবই ঘটে। কিন্তু এ যে কত জটিল…স্তালিনগ্রাদে সে তিনমাস থেকে অনেক শিখেছে…তিরিশ বছরেও সে এতখানি শিখতে পারত না…শুধু রায়ার যেন কিছু না হয়! আর আমাদের যেন বিচ্ছেদ না হয়!…যদি বাঁচি, আর তো ছাড়াছাড়ি হবে না—একদিনের তরেও হবে না…

মিনায়েভ মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে লিখছিল,

মা,—

আমাকে অভিনন্দন জানাও—গত সপ্তাহে একশো কিলোমিটার এসে গেছি। জার্মানরাও অবশ্য তাই করেছে, কিন্তু ওদের অভিনন্দন জানালে ওরা মোটেই খুশি হবে না। কাল একজন জার্মানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ভাবে। সে উত্তর দিলে, ভাববার তার সময় নেই,

তার পায়ে পড়েছে ফোস্কা। কিন্তু আমি শুধু ভবিষ্যতের চিন্তাই করি না, আমি এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছি। একে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেম বলে ভেবোনা, এটা বাজে ব্যাপার নয়। ওলিয়ার মতো মেয়ে আমি আগে দেখিনি। সে বহু পড়াশুনো করেছে, তবে ওর বিদ্যার বহর গবেষণা প্রবন্ধে এখনো প্রকাশ পায়নি, আর এক জোড়া চশমাও ও নেয়নি। স্কুল থেকে পাশ করে ও সবে গুরু ট্রেনিং কলেজে ঢুকতে যাবে, এমনি সময় ভাগ্য আর হিটলারের দৌলতে সে হোল সিগন্যালের মেয়ে। আমার তো মনে হয়, তোমার ওকে ভাল লাগবে। সবারই ওকে ভাল লাগে। তা ছাড়া ও বলে, আমি নাকি হাস্যরসিকের ভাণ করি। একথা তো তুমিও বল। মা মণি আমরা শীগ্‌গীরই গিয়ে হানা দিচ্ছি। আমি খুব সাবধানে আছি, যাতে ফ্যুরার আমাকে হ্যুচের মতো উবিয়ে নিয়ে না যেতে পারে, আর যদি অবস্থা তেমন বেতরো দাঁড়ায়, তা'হলে ফ্যুরারকে খুন করে ফেলতে হবে। মা মণি, তোমার হাঁদা মিতিয়া আর তার বৌকে খুব শীগগিরই আশা করতে পার। তবে তোমার ছেলেটি যেমন, বৌটি মোটেই তা নয়।

সে বেরিয়ে গিয়ে এক বুড়ো চাষীকে জিজ্ঞেস করলে,

পাকুল কত দূর বলতে পার ?

চাষীর পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি ট্যাঙ্কবাহিনীর সৈনিক। আমুদে লোক। সে ওকে দেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকে গম্ভীর স্বরে বললে,

কমরেড ক্যাপটেন, আমি আর আমাদের বুড়ো ঠাকুর্দাটি বসে হিসাব করছিলাম বার্লিন এখন কতদূরে !···

সাত

বুধবার সেপ্টেম্বরের সাতই এক হপ্তা দেরী করে স্কুলের নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে। প্রধান শিক্ষক আলেক্সী নিকোলেভিচ স্তেশোস্কো স্কুলে ছাত্রদের কাছে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা এখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির পরিবেশে প্রবেশ করেছি, ফ্যুরার আমাদের যে কর্তব্যভার দিয়েছেন, আর শিক্ষাক্ষেত্রে মহান জার্মান বাহিনী যে পথ দেখিয়ে গেলেন, তাকে ফলবতী করবার প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে।…আগেই তিনি বক্তৃতাটা লিখে রেখেছিলেন, কিন্তু উত্তেজনায় বার বার থেমে থেমে যেতে লাগলেন। তোতলামি দেখা দিল। শেষ করে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, যা হোক, ব্যাপারটা চুকে গেল! এবার তিনি স্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন। বুলেভারের কোনে দাঁতের ডাক্তার লেভসীনের সঙ্গে দেখা। তিনি কাছে এসে বললেন,

খবরটা শুনেছেন?…কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোপন রাখবেন।…রেল ষ্টেশনের কর্তা এইমাত্র বললেন—আমি ওঁর দাঁতের চিকিৎসা করি কি না…ওরা নাকি ছেড়ে যেতে শুরু করেছে।

সেই থেকে আলেক্সী নিকোলেভিচের মনে শান্তি নেই। মনে হয়, কি যেন তাঁর শ্বাস রোধ করে দিচ্ছে। গলায় বেঁধে যাচ্ছে, নিশ্বাস নিতে পারছেন না। তাই তিনি মন দিয়ে বিজ্ঞপ্তি পড়তে লাগলেন; দশবারের বার বিজ্ঞপ্তি পড়া শেষ হোলো।…

দুই পক্ষেই সংগ্রাম অভূতপূর্ব্ব ভাবে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। লোকসংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ বেশী থাকা সত্ত্বেও, সোবিয়েৎ বাহিনী কোথাও জার্মান সীমারেখায় প্রবেশ করিতে পারে নাই…যেখানেই সংঘর্ষ এড়াইয়া যাইবার প্রয়োজন দেখা দিতেছে, সেইখানেই অতি সুষ্ঠুভাবে তাহা করা হইয়াছে। প্রধান সামরিক তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে…দোনেৎসের কয়লার

খনি ধ্বংস করিয়া আমাদের সেনাবাহিনী পরিকল্পনা অনুসারে সে এলাকা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে···সপ্তদশ গ্রেনাডিয়ার বাহিনীর তিন নম্বর পল্টনের অধ্যক্ষ প্রধান লেফ্‌টেনান্ট কেকুট এই এই বিষয়ে সব চাইতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।···

যখন অবস্থা খারাপ হয়ে আসে, তখন বিজ্ঞপ্তির এমনি সুরই দেখা যায়।

জার্মানদের এখন গলায় বেঁধেছে···ত্রাসচেঙ্কো কাল বলছিল, বোলশেভিকরা নাকি কোনোৎপ পর্যন্ত এসে গেছে, কিন্তু আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বা সত্যই হবে—জার্মানরা যে রকম পালাতে শুরু করেছে, হয়তো লালঝাণ্ডা-ওয়ালারা বাথমার্চ-এ এসে গেছে—কে জানে বল?

···প্রধান লেফটেনান্ট কেকুট বেটার কি, ওরা পালাবে, আবার মিলিটারী তকমাও পাবে···কিন্তু আমার উপায় কি হবে···পরামর্শ চাইবার মতো লোকও তো নেই···অমনি কেউ গিয়ে গেষ্টাপোতে খবর দেবে, আমি গুজব রটাচ্ছি··· আর সবাইতো লালঝাণ্ডাওয়ালাদের জন্যে বসে আছে, ওরা বলবে, ভয় পাবার কি আছে, এখানেই থেকে যাও। তারপরে ধরে ফাঁসি লটকাবে·· তানিয়া তো মারা গেছে···বেঁচেছে!

আন্তোনিনা পেত্রভ্‌না মারা গেছেন মে মাসে। সে দিন সকালবেলা রোজকার মতোই তিনি প্রাতরাশ তৈরী করলেন, স্বামীর সাদা কামিজটা ইস্ত্রী করে দিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, ভালিয়াকে আর দেখতে পাব না। তারপর কাউচে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, লিওসা, আমাকে একটু জল দাও তো! আমার শরীরটা কেমন করছে।··· জল নিয়ে ফিরে এসে স্তেশেঙ্কো দেখলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন; ডাক্তার এসে পৌঁছবার আগেই তিনি মারা গেলেন। আলেক্সী নিকোলেভিচ জানতেন, মানুষ শোকে মরে না; তানিয়া হৃদরোগে মারা গেছে; কিন্তু এই 'লণ্ডভণ্ড' ব্যাপার না হলে তো এমন হোতনা; আরো অন্তত বিশ বছর তিনি বাঁচতেন।

আলেক্সী নিকোলেভিচ স্ত্রীকে বিদ্রূপ করে বলতেন, রাজনীতির সে কি

বোঝে! এখন তিনি আপন মনেই বললেন, তানিয়া ঠিকই বলেছিল; জার্মানরাই আমাকে বোকা বানিয়েছে।···

বোলশেভিকদের তিনি সবসময়েই অপছন্দ করতেন। কিন্তু একথা কে আর জানত? এক তাঁর স্ত্রী ছাড়া। এমন কি মেয়ে ভালিয়ার সুমুখেও তাদের সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলতেন না। বড় জোর মায়াকোভস্কীর কবিতা নিয়ে, নয়তো ওসীপের উচ্চারণ নিয়ে একটু ঠাট্টা করতেন। অবশ্য আন্তোনিনা পেত্রভ্না সোবিয়েৎ-সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তার স্বামীর মতামত জানতেন, কিন্তু তিনিও এসব পছন্দ করেন নি। এ কি করে ভাবা যায় যে, স্বামী আর স্ত্রী—যারা ত্রিশ বছর ধরে একসঙ্গে রয়েছেন, তারা কিনা ঝগড়া শুরু করে দিলেন! অথচ তখন তো সবচেয়ে বেশি মনের মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। আন্তোনিনা পেত্রভ্না পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তিনি বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে গিয়ে ভালিয়াকে খুঁজে বার করবেন। অমনি আলেক্সী নিকোলেভিচ চেঁচিয়ে উঠলেন, কি! খড়ের গাদায় ঘুমোতে হবে! কেন আমাদের ভয়টা কিসের! আন্তোনিনা পেত্রভ্না ভরসা পেলেন না। তিনি এক কথাই বলতে লাগলেন: এই সময়ে ভালিয়ার সঙ্গে আমাদের থাকা উচিত···তার স্বামী জবাব দিলেন, কি বাজে বকছ! দেখো, শীতের আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।

জার্মানরা এবার এল, আলেক্সী নিকোলেভিচ তাদের অসংখ্য ট্যাঙ্ক আর ট্রাক দেখে ভড়কে গেলেন।

অফিসাররা কি চটপটে, লোকগুলো কি আমুদে! ওরাই সত্যিকারের বিজয়ী বীর! অতীত জীবন নিয়ে তাঁর ভাবনা শুরু হোল। খতিয়ে দেখলেন যেভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন, তেমনি করে বাঁচা হয়নি। অধ্যাপক হবেন বলেই তার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কি হলেন? এক ইস্কুলের মাষ্টার—কোনরকমে জীবন কাটাচ্ছেন। আলপের্ত-এর মতো লোকও তাঁর থেকে অনেক উঁচুতে···আর সভা-সমিতি, গবেষণা, মার্কস্‌বাদ, মাইনে কাটা যাওয়া—সবকিছুতেই তিনি অতিষ্ঠ···যাক, এখন তো ওসব আর রইল না। ভালই হোলো।

হানা ওদের বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় বলেছিলেন, তোমার বাড়ি আর আমি মাড়াব না! আন্তোনিন পেত্রভ্না তার স্বামীকে বললেন, ওগো অভদ্রতা করলে কেন? ওর দোষ কি? আলেক্সী নিকোলেভিচ জবাব দিলেন, ও একটা বোলশেভিকের মা!···বাবি আর-এর ঘটনা শুনে আন্তোনিনা কেঁদে বলে উঠলেন, এর জন্য ভগবান আমাদের শাস্তি দেবেন—ঠিক দেবেন··· আলেক্সী নিকোলেভিচ রেগে উঠলেন, এর ভিতরে ভগবানকে টেনে আনছ কেন? তুমিতো কখনো গীর্জেরও পথ মাড়াও না। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমরা কি করবো? বাবি-আর-এ তো আমি আর হাজির ছিলাম না।

এক মুহূর্ত বুঝি বা ইতস্ততই করলেন। মনে পড়লো যৌবনের কথা। তখন রোজই প্রায় সরকার বদল চলছে কিয়েভে। প্রথমে হেটমান সরকার, তারপরে পেতালিউরারা, তারপরে বোলশেভিক, তাদের পরে ডেনিকিনের দল; আবার বলশেভিকরা···জার্মানদের উপরে ভরসা করতে যাওয়াটাই বিপদজনক··· কে জানে কি হবে? কিন্তু যুদ্ধ সীমান্ত কিয়েভ থেকে সরে গেল, জার্মানরা চলে গেল মস্কোর কাছে। লেনিনগ্রাদ তখন তারা ঘিরে ফেলেছে! আলেক্সী নিকোলেভিচ এবার নিশ্চিন্ত হলেন, হিটলারের বিজয়ে আর তার সংশয় রইল না। তিনি সরকারী চাকরী নিয়ে ফেললেন, হলেন স্কুলের হেডমাষ্টার। বক্তৃতা দেওয়া আর 'মাজেপেইৎ' এই ছদ্মনামে খবরের কাগজে লেখাও চললো। জার্মানরা যখন গত বছর গ্রীষ্মে ককেশাসে গিয়ে পৌঁছলো, তিনি সোল্লাসে স্ত্রীকে বললেন, কিগো, এবার কে ঠিক? স্ত্রী অশ্রুমুখী হয়ে বললেন, আমাদের ভালিয়া এখন কোথায় কে জানে!

আন্তোনিনা পেত্রভ্না রইলেন চুপ করে, কিন্তু তার স্বামী বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা তার মনোমত হয় নি। একদিন স্ত্রী তার লেখা একটা প্রবন্ধ পড়লেন। প্রবন্ধের শিরোনামা, 'লাল যৌবনের মৃত্যু তাণ্ডব'। তিনি পড়েই বললেন, এ কিন্তু বড় খারাপ কাজ হচ্ছে আলিয়োশা···ওরা যাই হোক, আমাদেরই মানুষ···তিনি চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, নিজে বাড়িতে

ওসব চেকা-দপ্তর-মাফিক কথা শুনতে চান না! সে গত হেমন্তের কথা। আন্তোনিনা তার ছ'মাস পরে মারা যান।

তনিয়া সময়-মতো মারা গেছেন। এখন তো আলেক্সী নিকোলেভিচের তাই-ই মনে হয়। অবশ্য, রাজনীতির সে কিছুই বুঝতো না, কিন্তু মেয়েদের একটা কেমন যেন বোঝবার ক্ষমতা আছে। ওর পরামর্শ তখন নিলেই হোত, বাস্তুত্যাগীদের দলে ভিড়ে গেলেই পারতাম। এখানেও চুপচাপ থাকলেই হোত। লালঝাণ্ডাওয়ালারা লেভসিনের কিছুই করতে পারবে না, অথচও জার্মান রাজত্বে ওতো বেশ ভালই ছিল, গোষ্টাপোদের দাঁত দেখেছে, আর যেখানে থেকে পেরেছে লুটে-পুটে নিয়েছে। এই তো, মেণ্ডেলেভিচের পিয়ানোটি তো ওই নিয়ে গেল···কিন্তু আমি অমন এগিয়ে গেলাম কেন?···এখন ব্যাপারটা ঘটবার পরে বুদ্ধিমান হয়েছি···উনিশশো বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মে কোন লোকটার জার্মানীর বিজয় সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল—আমি তার সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই। হাঁ, কিছু ক্ষ্যাপালোক ছিল বটে, তারা ইশতেহার ছড়াত, জার্মানদের উপর দু-একটা গুলিও চালিয়েছিল। কিন্তু ওরা তো রাজনীতি করত, অমন ধারা লোক আর কটা? আমি যেমন স্কুলে যাই, ওরা তেমনি ফাঁসি কাঠে গিয়ে চড়ে বসে। ওদের কথাই আলাদা। আমার মতো সাধারণ মানুষ জার্মানদের সঙ্গে আলাপ করে আগের অফিসারদের বাড়িগুলো দখল করবার জন্য চেষ্টা করছিল। ইহুদিদের আসবাব পত্র কেনবার জন্যও তাদের ভিতর কাড়াকাড়ি পড়ে গিছলো। আমি শুধু রোপ্‌কেই বলেছিলাম, বোলশেভিকরা আমার উপর অত্যাচার করেছে-- আর সঙ্গে সঙ্গে চাকা ঘুরতে শুরু হোলো—ওরা আমাকে হেড মাষ্টার করে দিলে, সরকারী জমায়েতে ডাক পড়লো, একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিবৃতিতেও আমার নামের সই নিলে।··· এবার তো কমিউনিষ্টরা আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে। নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কি বলব? আমি যে জার্মানদের ঘৃণা করি, একথা ওরা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কথাটা তো সত্যি। জার্মানরা আমাদের তুচ্ছ করতো, আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছে। ওদের যেন

নিজের বাড়িঘর এমনি জুলুম করেছে। এবার তো ওরা আমাদের ফেলে রেখে পালাবে···ওরা ওদের লেফটেনাণ্টদের নিয়েই ব্যস্ত, আমাকে কে গ্রাহ্য করছে।···

সন্ধ্যেয় ইয়াসচেঙ্কো এসে খবর দিলে, কমিউনিষ্টদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে, জার্মানরা আত্মসমর্পণ করবে না, কিয়েভও ছাড়বে না—নিপারের পারে এইতো তাঁদের পূর্ব প্রাচীর। গত পরশু একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সস্ত্রীক এসে গেছেন··· তাহলে ছেড়ে যাবার কথা মিথ্যা। ···আলেক্সী নিকোলেভিচ খুশিই হলেন। তিনি শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজে শ্রমিক সংগঠন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়লেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ দেখবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে—হাঁ—বৃহত্তর জার্মানী তারা দেখুক!··· উনিশশো সাতাশ সালে যারা জন্মেছে তাদের ওরা এই দলে ভর্তি করে নেবে। আলেক্সী নিকোলেভিচ হাসলেন; লেভসীনের মেয়েটা এবার যাক তো! ওযে মজা মারবে তা হবে না। "সাদা ফুল" নামে একটি জার্মান ছবির সমালোচনা দেখেও তিনি খুশি হয়ে উঠলেন।··· কিছুই যেন ঘটেনি, এমনিভাবে ওরা যুদ্ধটাকে নিয়েছে। এরই ভিতরে চল্‌ছে প্রেম···না, জার্মানী একটা শক্তি বটে! বোলশেভিকরা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে কখনো পারবে না!

দশটি দিন কেটে গেল যেন জ্বরের ঘোরে। আলেক্সী নিকোলেভিচ ষ্টেশনের উপর নজর রাখলেন; জার্মানরা যাচ্ছে কি আসছে দেখতে লাগলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে দোকানে গিয়ে একটা সুন্দর ফারের টুপী কিনে ফেললেন!

ইয়াসচেঙ্কোই আবার সাংঘাতিক খবর নিয়ে এল

নিয়েঝিন-এ এসে গেছে বোলশেভিকরা···

একটু আগে আলেক্সী নিকোলেভিচ বুলেভারে ঘুরে ঘুরে হেমন্তের সৌন্দর্য দেখছিলেন। হঠাৎ সব যেন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। ইয়াসেচেঙ্কো ঠিকই বলেছে, জার্মানদের ট্রাকগুলোর দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। ওরা পাঁই পাঁই করে ছুটছে।···

সামরিক দপ্তরে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে এক চেনা লোক আছেন ঃ তিনি লেফটেনাণ্ট রোপ্।

আমাকে জার্মানী যাবার অনুমতি পত্র দিন।

লেফটেনাণ্ট জবাব দিলেন,

আমি দুঃখিত, এখন তা অসম্ভব।···

আপনারা তো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?

হের স্তেশেঙ্কো, আপনার কাছ থেকে এমন কথা আশা করি নি। আপনি গুজব রটাচ্ছেন।

আলেক্সী নিকোলেভিচের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো,

আপনারা তাহলে আমাকে ফেলে যাচ্ছেন ! আমি যেন লেবুর খোসা আর কি !

লেফটেনাণ্ট কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন,

সম্ভ্রান্ত লোক বলেই আপনাকে জানি, তাই এ কথায় কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না···

জার্মান মেয়েরা চলে গেল, সরকারী খাতাপত্র, ছবি, প্রাচীন পুঁথি, রসদ চলে গেল গাড়ি বোঝাই হয়ে। তারপরে কর্মচারীরা। হিবকাডোর কর্মচারীরা, খুদে ফিউরায়ের দল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা। কমিশন ষ্টোর আর কাফেগুলির দরজা একে একে বন্ধ হোলো। বোলশেভিকরা কোথায় এখন আর তা জানার দরকার নেই। ওরা এখন ঠিক মুখোমুখি এসে গেছে—আলেক্সী নিকোলেভিচ আবার যুদ্ধ এলাকার মাঝখানে পড়ে গেলেন। কিন্তু বোমা আর গোলার ভয় তার নেই। বোলশেভিকরা আসছে এই তার ভয়। অন্য ভাবনা তার নেই। লেভসীন একদিন তাকে খবর দিলেন, জার্মানরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। ভয়ে তার জবান বন্ধ হয়ে গেল।

লেভেসীন বললেন, যাই হোক, আমার দুনিয়া ঘোরবার ইচ্ছা নেই। ইয়াসচেঙ্কো ঝিতোমিরে চলে গেল। তাকে বিদায় দেবার সময় আলেক্সী নিকোলেভিচ বললেন, তোমার কি মনে হোল, ঝিতোমীরে গাছ নেই ? ফাঁসি কোথায় লটকাবে ; তা নিয়ে ভাবনা করে লাভ কি ?

ঝিতোমীরে যাওয়া তো বোকামি, রোভ্নোতেও তাই। বোলশেভিকরা যদি নীপার পার হতে পারে তারা যুদ্ধ-সীমান্তেও পৌছবে। ত্রদনিক ভাল কাজ করেছে,—সে চলে গেছে জার্মানীতে। সেখানে আর বোলশেভিকরা যেতে পারবে না···উনিশশো বিয়াল্লিশ সালেই ত্রদনিক জার্মান বলে এক সার্টিফিকেট করিয়ে রেখেছিল—তাতেই সুবিধেটা হোল। আহা, আমি দি অমনি একখানা সার্টিফিকেট এখন পেতাম!······

আলেক্সী নিকোলেভিচ করিৎকর্মা হয়ে উঠলেন, হতাশা থেকেই এল এই প্রেরণা। প্রতিদিন তিনি সামরিক দপ্তরে যেতে লাগলেন। শেষে মেজর রিষ্ট-এর সঙ্গে একদিন দেখা হোল। মেজর লোকটি ভদ্র, কিন্তু তিনি তাকে ঝিতোমীরে যেতেই বললেন। অবশেষে তিনি যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন্ সময় এল মুক্তি। কোভালেস্কো থিয়েটারে চাকরী করে। সে বললে কে-এক সাণ্ডার জার্মানীর সার্টিফিকেট বেচছে—কিন্তু কাগজের টাকা সে নেবে না। যদি দামী জিনিস কিছু থাকে···আলেক্সী নিকোলেভিচের কাছে তখনো তার স্ত্রীর মুক্তো আর চুনীর লকেটটা ছিল···ওর মা ওটি দিয়েছিলেন বিয়ের উপহার, তিনি ভাবলেন, তনিয়া স্বর্গে গিয়েছে, তবু সে আমায় বাঁচিয়ে দিলে। সার্টিফিকেট জোগাড় হোলো। তাকে তবু রোভনো যেতে হবে। কোভালেস্কো বললে, ওখান থেকে নাকি জার্মানী যাওয়া সোজা হবে। সার্টিফিকেট তো তার আছেই।

শহরতলীর গাড়ীর কামরায় অতি কষ্টে উঠে পড়লেন তিনি, বসবার জায়গাও পেয়ে গেলেন। ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এল, গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা বর্ষণের শব্দ তিনি শান্ত হয়েই শুনলেন। তারা ধ্বংস করে যাচ্ছে শহর। মেয়েরা কাঁদছে, সৈনিকদের হর্ষধ্বনি উঠছে। এবার ক'জন জার্মান এসে উঠলো কামরায়।

নেমে যাও!

আলেক্সী নিকোলেভিচের উঠতে একটু দেরী হোল। একজন জার্মান,

গর্জন করে উঠলো,

এই বুড়ো ঘোড়া, জলদি !

সার্জেণ্ট বললে, এ গাড়ি মিলিটারীর জন্যে। তোমরা কাল যাবে···

আলেক্সী নিকোলেভিচ বাড়ি ফিরে গেলেন। যে বাড়িতে তিনি ষোলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, সেই বাড়িখানা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। অপরিচিত অতিথির মতো সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে সঙ্কুচিত হয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে···কিন্তু কাল কি হবে? সার্টিফিকেটে আছে আমি জার্মান, কিন্তু জার্মান কথা তো ভাল বলতে পারি না। ওখানে আমার কি প্রয়োজন? না খেয়েই হয়তো মরবো···জার্মানরা তো ভারি তোয়াক্কা রাখে··· হয়তো পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে? এই সাতান্ন বছর বয়েসে কি ভিক্ষে পোষায়? আমি তো অধ্যাপকও হতে পারতাম। বোলশেভিকদের অধীনেও তো ছিলাম স্কুল মাষ্টার—প্রশংসাপত্রও পেয়েছিলাম।······

ভালিয়ার একখানা ফ্রেমে-আঁটা বড় ফোটো ছোট্ট টেবিলটার উপর রয়েছে। সে হাসছে। এত সুন্দর ওকে দেখাচ্ছে। আলেক্সী নিকোলেভিচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আমার মেয়ে ছাত্রী, হয়তো ও বিখ্যাত অভিনেত্রীও হবে—কিন্তু জার্মানরা একজন তিরিশ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষক আর মাতাল গ্রাম্য-মোড়লে তফাৎ বোঝে না···ভালিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করবে সে তো জানি, সে যুব কমিউনিষ্ট সংঘের সভ্য, তার স্বামী আবার পার্টিরও সভ্য···আর তনিয়া তো মারাই গেছে। ঐ যে বিছানায় একটা জায়গায় খানিকটা দাগ পড়ে আছে— ওখানে ও শুতো···কিছুইতো আর রইল না···প্রিয়জন গেল, বাড়িঘর গেল··· এখন যাই কোথায়?

তাঁর মনে পড়লো, সৈন্যটা তাকে আঘাত করেছিল! তিনি ব্যাগ খুলে সার্টিফিকেট নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। কত কষ্ট করে যোগাড় করেছিলেন। এবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বড় ক্লান্ত। ঐ বাজে কাগজের জন্য এত ছোটাছুটি। এতো বোকামি··· আর সব কিছুতেই তো বোকামি। তিনি উঠে পড়ে পর পর দুটো সিগারেট

খেলেন। ধোঁয়া টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বার করতে লাগলেন। এবার আলমারীতে আন্তোনিনার একরাশ পুরানো জিনিস ঘেঁটে ঘেঁটে একতাল দড়ি পেলেন। আস্তে আস্তে তিনি সেই দড়ি দিয়ে তৈরী করলেন এক ফাঁস। কোনো কিছু না ভেবে অভ্যাস বসে কারিগর যেমন কোন জিনিস তৈরী করে যায়, তেমনিভাবে যন্ত্রচালিতের মতোই তৈরী করলেন ফাঁস। তারপর টেবিলটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে তার উপরে উঠে পর্দার হুকগুলো মজবুত কিনা দেখে নিলেন। তেমনি কারিগরী চালেই তিনি ফাঁস পরলেন গলায়, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেবিলটা লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন। কাচ ভাঙার শব্দ হোল। ভালিয়ার ফোটোখানার শব্দ—মেঝের পড়ে গিয়ে কাচের ঝঙ্কার উঠলো। এবার এল গোলার শব্দ, কিন্তু আলেক্সী নিকোলেভিচ আর শুনতে পেলেন না।

আট

"কিয়েভ্ অভিমুখে" এই কথা বেতারে শুনে ভালিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো; তার মানে—বাবা আর মা এবার মুক্ত হবেন। জার্মানরা মেরে না ফেললে হয়···কিয়েভ-এ জার্মানরা আছে—এই ছবি সে বার বার কল্পনা করতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। তার চোখের সুমুখে হয় ভেসে উঠছে প্রাকসমর নগরের ছবি, হাস্যমুখর জনতা, ক্রেসচাতিকের ফুলওয়ালী, আর ঘন নীল আকাশ, নয়তো ভিড় করে এসেছে ধ্বংসের ছবি···পরিত্যক্ত ধ্বংসীভূত শহর, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।···

খবরের কাগজে সে পড়েছে, জার্মানরা বাসিন্দেদের চালান দিচ্ছে জার্মানীতে। কিন্তু কারকভ-এ জনগণ সম্বর্ধনা জানিয়েছে আমাদের সেনাদলকে···তাহলে সবাইকে চালান দেয়নি ! বাবা হয়তো লুকিয়ে আছেন। মাকে ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়ে যায় নি—তিনি তো রুগ্না···ভালিয়া তাই সেরিওঝাকে লিখলে, যদি কিয়েভ-এ যাও, আমার মা–বাবার খোঁজ কোরো।

সার্জি চিঠি লেখে কখনো-সখনো ; অনিয়মিতই আসে চিঠি, তবু তাতে থাকে আনন্দের আমেজ। এত স্নেহ আর প্রেম সে চিঠিতে সঞ্চিত থাকে, ভালিয়া অন্যের সামনে পড়তে পারে না, সাহস পায় না। তার যেন মনে হয়, ঘন বনে সে পথ করে চলেছে। চিঠি তো তার সেই সন্ধানী আলো।

দূরগামী ট্রেনের কামারায়ও সমাজজীবন সৃষ্টি হতে পারে। সহজেই সহযাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয়, কামরা আরামের নীড় হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় বুঝি বহুদিনই আছি। মানুষ দু'বছর বাস্তুত্যাগীর জীবন কাটিয়েছে, মেহনতি হয়েছে বেশি, খাবার মিলেছে কম—কিন্তু তবু তারা যেন এরই মধ্যে একটু স্থিতু হয়ে বসেছে। স্থায়ী বাসিন্দের ভাবটুকু এসেছে। কিন্তু ভালিয়াই একমাত্র অভ্যস্ত হতে পারেনি এ জীবনযাত্রায় ; তার হাসিতে এখনো অস্পষ্টতা, তার ভাগ্যও যেন তাই। লোকে বলে, মেয়েটা একটু কেমন যেন, কিন্তু কাজের মেয়ে···ইঞ্জিনিয়ার কোজলভ তো ওর দৃষ্টান্ত দেন। খবরের কাগজের এক ফোটোগ্রাফার এসে ওর ফোটোও তুলে নিয়ে গেছে। ফোটো তোলার সময় ফোটোগ্রাফারটি বলেছিল, একটু গম্ভীর হবেন তো, লোকে তা না হলে বিশ্বাসই করবে না যে আপনি একজন স্তাখানোভাইট···ভালিয়া হেসে বলেছিল, আমি নিজেই তো বিশ্বাস করি না···

অতীত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার জন্যেই সে কারখানায় কাজ নিয়েছিল; এতে ভাবনা কম হবে, নইলে বিচ্ছেদ তো অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এখন সে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, মাথাও তার ঠাণ্ডা ; মেসিনের কাছে যখন সে এসে দাঁড়ায়, মনে হয় সেরিওঝার কাছেই সে আছে। সেরিওঝা

কখনো বন্দুক ধরেনি. কিন্তু সেতু তৈরী করেছে, আবার কেউ তৈরী করেছে বন্দুক, তাই মেসিনগান ওর কাছে বুঝি মহামূল্য জিনিস। যুদ্ধ তাদের বিচ্ছেদ এনেছে ; উপায় তো নেই ; যুদ্ধে সে নিজেকে নিয়োজিত করবে, তারপরে আবার তাদের হবে মিলন। যখন ভালিয়া কাজে ডুবে যায়, কেউ বোঝে না কতখানি পরিশ্রম সে করছে, কিন্তু তার কাছে এ যেন খেলা। তেমনি এতে আনন্দ। রাতে যখন বাড়ি ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, তখন তো ভীষণ ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরে।

একখানা ছোট্ট ঘরে সে থাকে, দেখে মনে হয় যেন জেলের ডিগ্‌রী। শুধু সার্জির একখানা ছবি ছাড়া সেখানে নিজের বলতে কিছু নেই। ছবিখানা বিছানার উপরে টাঙানো। কখনো কখনো সে মাঝরাতে হঠাৎ জেগে উঠে ফোটো-খানার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকে—ভয়ানক স্বপ্ন দেখলেই এমন হয়। সে কি স্বপ্ন! সেরিওঝাকে ঘেরাও করেছে জার্মানরা অথবা সে হ্রদে ডুবে যাচ্ছে। সে যা-কিছু করুক, ওর ভাবনা চলে সঙ্গে সঙ্গে। সেরিওঝা হয়তো হাসবে, সে ওসব পছন্দ করেনা—এমনি ভাবনা···বিচ্ছেদের বেদনা যে তলিয়ে দেয় না, মিলিয়ে যায় না। যখন সেরিওঝা লিখলে, তিরিশ কিলোমিটার সে মার্চ করে গেছে, হঠাৎ তার মনে হোল, কারখানা থেকে বাড়ি ফিরতে পারবেনা, হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে···

সার্জি যদি তার পাশে থাকত, যুদ্ধের আগেকার বসন্তের সেই শান্তি সে ফিরে পেত। সেই তার জীবনের একমাত্র বসন্ত। সেদিন সে ভেবেছিল, অভিনেত্রী হবার নিষ্ফল স্বপ্ন সে কাটিয়ে উঠেছে। এক বছর আগেও সে এমনি ভেবেছিল, অরলোভস্কীর স্তুতি তাকে নাড়া দিতে পারেনি। এখন বিজ্ঞপ্তি আর সার্জির চিঠি আসন্ন মিলনের সূচনা করেছে, সুখের সে কামনা করছে, কিন্তু সুখ তো তার নেই। যে-কামনাকে সে পরাজিত করেছিল; মুছে ফেলেছিল জীবন থেকে—সেই শিল্পীর কামনা আবার জেগে উঠলো তার বুকে। এই প্রলোভনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম সে করছে, কিন্তু তবু ভিড় করে আসছে কবিতা, তার

নায়কদের স্বগতোক্তি, অঙ্গভঙ্গী, প্রত্যুত্তর, ধ্বনিময় শব্দ সমারোহ···

রবিবার উজ্জ্বল দিন—গ্রীষ্মের দিন। লিডা আর তার স্বামী গ্রামাঞ্চলে যাবার নিমন্ত্রণ করেছিল, সে প্রত্যাখ্যান করলে। নিজের ছোটঘরে বসে ডুবে গেল ভাবনায়। কি সে ভাবছিল, জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতোনা—সবকিছু গেল তাল গোল পাকিয়ে—সেরিওঝা, যুদ্ধ, কিয়েভ্, রঙ্গালয় সবকিছু···সে তো আর খুদে মেয়ে নয়, এখন তার মন স্থির করবার সময় এসেছে, কিন্তু এখনো তো মন অস্থির···সেরিওঝা এখানে নেই কেন—তা না হলে তো··· ?

শেষে, সে একখানা বই নিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো, কিছু সে ভাবছে না।

তারারা আগুনের কনা
থাক তাতে তোমার সন্দেহ
সূর্য যে ঘোরে
সেখানেও থাক সন্দেহ
সত্যকে মিথ্যে বলে কর সন্দেহ।
কিন্তু আমার প্রেমকে তো
কোরো না···

* * * *

ডেইজি তো আছে···ভায়োলেট ফুলও দেব···কিন্তু তারা তো মরে গেছে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে—ওরা তো তাঁর মহামৃত্যুর সাথী···

আর ফিরে আসবে না ?
আসবে না ফিরে

* * * *

কখন তার শৈবালে মালার, আর সে
···ডুবে গেল ক্রন্দনরতা নদীর বুকে।

···পাগল হলে নাকি ?

ভাবনায় টের পায়নি, লিডা ঢুকেছে। বন্ধুকে দেখে ছোট্ট একটা চীৎকার করে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। লিডা বইখানা তুলে নিলে।

হ্যামলেট, ডেনমার্কের যুবরাজ···তুমি কি থিয়েটারে নামবে নাকি?

ভালিয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, যেন সে কি একটা নিষিদ্ধ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কোনো রকমে সে অস্পষ্টস্বরে বললে,

বইখানা পেলাম কিনা, তাই জোরে পড়ছিলাম···

লিডা অবিশ্বাসভরে হাসলো।

বনে ভারি চমৎকার কাটলো। কত যে ব্যাঙের ছাতা তুলেছি—দেখ!

লিডা চলে যেতে আবার ভাবনায় ডুবে গেল ভালিয়া। কেন এমনি এক-একটা মুহূর্ত এসে দেখা দেয়?···বহু আগেই তো ঠিক হয়ে গেছে—আমি অভিনেত্রী হতে পারব না। সেরিওঝার সঙ্গে দেখা হবার আগে নিষ্ফল স্বপ্ন আঁকড়ে ধরে থাকতে পারতাম, তখন জীবনে আমি ঠাঁই পাইনি···কিন্তু এখন তো ব্যাপার আলাদা, যুদ্ধ শীগ্‌গিরই শেষ হবে, সেরিওঝা আসবে বাড়ি ফিরে··· সেই তো আমার বাস্তব।

দুসপ্তাহ আগে, ভালিয়া নিনা জর্জিয়েভনার চিঠি পেয়েছিল। তিনি মস্কো ফিরে এসেছেন, আর ভালিয়াকে এখানে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। নিনা লিখলেন; তোমার স্কুলও ফিরে এসেছে। আমি হলে কিছুতেই ছেড়ে দিতাম না। তুমি যখন লিখেছিলে, তোমার প্রতিভা নেই, তুমি ভুলই করেছিলে। একজন-আধজন অধ্যাপক ভুলও তো করতে পারেন। আমাদের চলে আসবার আগে তুমি ব্লকের কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলে, সেকথা আমার মনে আছে। সে তো অতুলনীয় আবৃত্তি! ভ্যালিয়া, আমার ভালিয়া, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষের পেশা—যদি শিল্পের প্রতি তোমার ঝোঁক থেকে থাকে, সাময়িক ব্যর্থতায় তোমার তো দমে যাওয়া উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত না সেরিওঝা ফিরে আসে তুমি আমার সঙ্গে এখানে এসে থাকতে পার। দুজনে বেশ থাকব। ··· খুব ভাল। এ শীতে যদিও বা যুদ্ধ শেষ

না হয়, সামনের গ্রীষ্মে হবেই।

ভালিয়া জবাব দিলে, সে আর চলচ্চিত্র বিদ্যালয়ে ফিরবে না, যুদ্ধের শেষ অবধি সে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে। তারপরে কোথাও একটা কাজ খুঁজে নেবে। তার চিঠিখানা সংযত, শান্ত ভাবেই সে লিখলে, কিন্তু চিঠি ডাকে দিয়ে এসে রাতটা কেঁদে কাটালো।

আর এখন তো লিডা তাকে দেখতে পেল, সে হ্যামলেট আবৃত্তি করছে। ···মাতালকে যেমন তার গেলাস টানে, তেমনি নেশা বা আকর্ষণ এতে আছে নাকি? ···সেরিওঝা ভাবে, আমি বুঝি বদলে গেছি। সে আমাকে কয়েকবারই লিখেছে, আমার ইচ্ছাশক্তির সে তারিফ করে। আমি কোথায় কোন্ সুদূরে এসে কারখানায় কাজে লেগে গেছি, এই জন্যেই তারিফ করেছে। কিন্তু আমি তো তাকে প্রতারণা করেছি, একবারও তো তাকে লিখিনি যে, আমি মঞ্চের স্বপ্নে বিভোর। ওকে আমি দেখাতে চেয়েছি, আমি আলাদা মানুষ, আমার মনের জোর যথেষ্ট। সেরিওঝা কি আমার মন বুঝবে না? বুঝবে! বুঝবে! একদিন তো ও আমাকে বলেছিল, তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনি। যখন জিজ্ঞেস করলাম, কি ভালবাসতে তুমি? সে উত্তর দিলে, স্বপ্ন···এখানে নয় পারীতে···হয়তো তার সে স্বপ্ন এক মেয়ে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু তাতে তো কিছু যায় আসে না, আমার ঈর্ষা তো হয় না, আমি জানি, অনুভব করি—ও আমাকে ভালবাসে···কিন্তু ওর মত শক্তিমান পুরুষ যখন স্বপ্নের মোহে আচ্ছন্ন হয়, তখন আমিই বা আমার স্বপ্ন নিয়ে লজ্জা পাব কেন?···এতে তো ওর কাজে বাধা হয় না, ও সেতুর পর সেতু তৈরি করে যায়, লড়াই করে, কিন্তু আমার তো তা নয়। মনে হয়, যদি এই মোহ ছুঁড়ে ফেলে না দিই, আমি নিজেকে হারাব, আমার সেরিওঝাকে হারাব।···

বেতারে কথা ঝরে ঝরে পড়ছে। এখন ছ'টা। এখুনি কাজে বেরুতে হবে···আমাদের সেনাবাহিনী বব্রিক রেল ষ্টেশনে প্রবেশের জন্য তুমুল যুদ্ধ শুরু

করেছে···দেখ দেখি, কি বোকা আমি! যুদ্ধ চলছে, তুমুল যুদ্ধ, হয়তো সেরিওঝা যেখানে আছে, ওরা ওকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে, আর এখানে আমি কাল্পনিক অস্বস্তিতে হাবুডুবু খাচ্ছি···বব্রিক! সেতো কিয়েভের একেবারে কাছে। শেষবার যখন ওখানে যাই, আমি তো জানলা থেকে একবারও সরে যেতে পারি নি। বব্রিক—তারপরে ব্রোভারী —তারপরে বন আর বালি—দার্নিৎসা। তারপর সেতু—নীপারের সেতু, মঠ। সুন্দর, সুন্দর।··· কি তাড়াতাড়ি এগুচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনী! আর ক'দিনের ভিতরেই বোধহয় কিয়েভ মুক্ত হবে। বাবা এখন গুলীর শব্দ শুনছেন, হাঁ এখন তো শুনবেনই। মা কাঁদছেন···প্রতীক্ষা করছেন···আর আমার মাথায় যতসব আজগুবী ভাবনা—থিয়েটার আর ওফেলিয়ার ভাবনা। শৈবালের মালার ভাবনা।···

ইঞ্জিনিয়ার কোজলভ বলেন, কারখানায় যদি সবাই লাকোভার মতো কাজ করতো তাহলে···ভালিয়া ওকথায় কান দেয় না, মুখে শুধু তার আবছা হাসি ফুটে ওঠে। হয়তো শোনে, কিন্তু ভাবে অন্য কথা। কাজ থেকে ফিরে সে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু ক্লান্তি চেপে রেখে লিখতে বসে সার্জিকে চিঠি। আজও লিখতে বসলো।

জাননা আমি কি সুখী! প্রতিদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে, দূরে সরে যাচ্ছ, কিন্তু তার মানে তো কাছে সরে সরে আসছ প্রিয়তম। শীগ্গিরই তো শেষ হয়ে যাবে যুদ্ধ। আমি ধৈর্য ধরে আছি, যদি আজগুবী ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে, তোমাকে বললেই তুমি তা বুঝতে পারবে। রাগও করবে না। তোমাকে যখন ক্রাইলভদের ওখানে প্রথম দেখি, জানো তখন কি মনে হয়েছিল? কেন যে তোমাকে কবি বলে ভেবেছিলাম। এমন আনমনা তুমি, এমন উচ্ছ্বল। আমার বুক সেদিন কেঁপে উঠলো দুরু দুরু করে। সেরিওঝা, প্রিয়তম, যদি তুমি জানতে আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, কেমন করে ভাবনা আমাকে ঘিরে থাকে, আমি কত ভাবি তোমার শ্রম, ব্যথা আর ক্লান্তির

কথা। আমি যেন দেখতে পাই তোমার গড়া সেতু আর তোমার বিজয় —সে যেন তোমার সেই ছবির মতই স্পষ্ট। সেই যে বর্ষাতি গায়ে টুপি পরে তুলেছিলে ছবি। আমার প্রিয়তম, আমার নিয়তি, আমার সবকিছু তো তুমি···

———

নয়

রিক্‌টার আকাশের দিকে তাকিয়ে গাল দিলে। আকাশে অগ্নির আভাস···আবার আমরা পালাচ্ছি···কর্ণেল গেবলার এগারো জনকে সামরিক দণ্ড দিয়েছেন, কিন্তু কিন্তু ফল হয়নি—তারা পালাচ্ছে। দেসনার পারে এসে গেছি আমরা—এইটেই তো পূর্ব দেয়াল'—একথাও বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু শ'খানেক রুশ ডান পারে এসে হাজির হতেই গোটা পল্টনই পালিয়ে গেল। এমন বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করবার পর, একি অপমান! এই তো সেদিন আমরা উঠে পড়েছিলাম ককেশাসের চূড়ায়···আমি আর সবার থেকে এমন কিছু সরেশ নই; 'ইভান' নামটা শুনলে আমিও খরগোসের মত ছুটে পালাই।

নতুন যারা এসেছে তাদের একজন কাল জিজ্ঞেস করছিল, 'পূর্ব' দেয়াল কোন দিক দিয়ে গেছে? রিক্‌টার জবাব দিলে, দেয়াল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, সবাই হাসলো। কিন্তু সত্য বলতে কি, হাসি-তামাসার কথা এটা নয়।

স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি পেয়ে রিক্‌টার ভাবলে, ওকে হার্জে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে আমি ভুলই করেছি।···হিল্ডা লিখেছে, এখানে সবই চুপচাপ, একটা বিমান হামলাও হয়নি, কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা তো সাংঘাতিক। প্রতিটি পরিবার শোক করছে, পুরুষ দেখাই যায় না। আর সবাই কি স্বার্থপর, আমরা যে এখানে এসেছি এতে ওরা অসন্তুষ্ট। ওরা খালি গজর গজর করছে, এখানে ভিড় বাড়াচ্ছে। জিনিস-পত্রের দাম চড়ছে। ওরা আমাকে দিয়ে কাজ করাবেই, রবার্ট আমাকে অনেক করে রেহাই দেবার ব্যবস্থা করেছে। বার্লিনে আর-একটা ভীষণ হামলা হয়ে গেছে, আগের থেকেও ভীষণ। বরাত ভালো যে, মার্গারেট মাসী গিছলেন পটস্‌ডামে, সেখানে ক্লারচেনকে দীক্ষা দিতে গিছলেন, ফিরে এসে বাড়ির তো আর চিহ্নই পেলেন না। এমন কি যে পথে থাকতেন, তারও চিহ্ন নেই। সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রিয় কার্ট, বলতো, এসব কি ঘটছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা! ইটালী আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; রুশদের সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারছি না; ওরা একেবারে সংখ্যায় অগুণতি। আমি তো সব সময়ে ভাবি, তুমি ঐ ভয়ানক দেশে কিভাবে আছ! এখানে এখন তো ইতালীয়ানরা ভীড় করে আছে। ওরা কি—যুদ্ধবন্দী না মিত্র—কিন্তু সবাই তো ছাড়াই আছে, কাজও করছে। জোহানা বলে, কমিউনিষ্টরাই নাকি ওদের সর্বনাশ করেছে, ডুচেকে তারা মানতে চায়নি, নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে চায়নি। তুমি জান রাজনীতি আমি বুঝি না; কিন্তু ইতালীর একজন মানুষ জোহানার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি বলেন, বাদাগলিওকে তিনি ঘৃণা করেন। ভদ্রলোকটি যুদ্ধের আগে ছিলেন নাট্য-সমালোচক। যখন তিনি কথা বলেন, জোহানা আর আমি তো হেসে বাঁচিনে। এই তো খবর। আমি একটু রোগা হয়ে গেছি, কিন্তু এতে নাকি ভালই দেখাচ্ছে। একটা সুন্দর সবুজ ক্রেপের জর্জেটের ক্লোক তৈরী করিয়েছি।

তুমি যখন, বাড়ি ফিরবে ছুটিতে আমি পোষাকটা পরবো···ঠিক ঐ লোকটাকে ও গেঁথে ফেলেছে! রবার্ট ওর কাছে যথেষ্ট নয়।···ইতালীয়ানরা আর লড়বে না, কিন্তু ঘাঘরা দেখলে আর ছাড়ে না। ইতরের দল! সবাই ইতর—পাজি!···আর সব চেয়ে খারাপ হচ্ছে, শীগ্‌গির আর ছুটি মিলবে না। রুশরা আমাদের একটুও বিশ্রাম দিচ্ছে না।

কর্ণেল গোলাবাড়ি, শস্য আর খামারের যাবতীয় জিনিস পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। রিক্‌টার হুকুম শুনে ভাবলে: একটা ভাঙা কুঁড়েঘর জ্বালিয়ে দিয়ে আমার মতো একজন সংস্কৃতিবান শিল্পী কি করে আনন্দ পায়? রুশরা তাদের ইশ্‌তেহারে লেখে, এ নাকি অমানুষিক বর্বরতা, এ নাকি পাপ। বাজে কথা! যুদ্ধে আইনের বয়েৎ চলেনা, আইনজ্ঞ সাজবার ফুরসৎ নেই। মানুষ ধ্বংস করবে, আবার গড়বে। এই তার স্বভাব। আমাদের হৃদয়ে অনেক কিছুইতো পুঞ্জীভূত হয়ে আছে···কত নিষ্ফল আশা, কত হারাণো বন্ধু। তাছাড়া কলোন আর হামবুর্গের ধ্বংসস্তূপের প্রতিশোধ চায়। যখন জ্বলন্ত গ্রামগুলির দিকে তাকাই, যেন হিল্ডার চোখ ওখানে দেখতে পাই—উজ্জ্বল, বিষণ্ণ, নির্লজ্জ দুটি চোখ। ও হয়তো এখন ওর ইতালীর নাগরকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করছে।···

কাল একটা রুশ মেয়েমানুষ কেঁদে কেঁদে ভিক্ষে চেয়েছিল, তার ঐ ভাঙাচোরা কুঁড়েখানা যাতে রিক্‌টার রেহাই দেয়। রিক্‌টার চটে গিয়েছিল। উন্টার ডেন লিণ্ডনের বিরাট বাড়িগুলি গেল, কর্ণেল গোলাবের জন্যে যে বাড়ি তুলেছিলাম তা গেল, আর এই মাগিটা ওর শুয়োরের খোঁয়াড়ের জন্যে মরা কান্না কাঁদছে। শুধু সে বাড়িখানাই জ্বালিয়ে দেয়নি, বুড়ির গরুটাকে গুলী করেছে, ওর আর সমস্ত জীবজন্তুগুলিকে মেরে ফেলেছে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠেই বলেছে: জ্যান্ত আর কিছু রাখবোনা! (মেয়েমানুষটাকে সে খুন করেনি, করেছিল কার্ল)

মাংস ছাড়া আর খাবার জুটছেনা, পেটের গোলমাল বেঁধেছে। মাঝে

মাঝে মানুষ পায়খানায় ছুটছে।…এ এক ব্যাপার বটে! অস্বীকার করবার জো কি?…তবু ভাল যে এখন গরম কাল…শীতে যে কি হবে ভাবাই যায় না।

ইউক্রাইনের মতো এখানে চুনকাম করা ছোট ছোট বাড়ি দেখা যায় না। শুধু কাঠের নড়বড়ে বাড়ি, কুয়ো, জল তোলার জন্যে বড় কাঠের একটা দণ্ড…গত গ্রীষ্মে যখন আমরা এগুচ্ছিলাম, তখনো এমনি দৃশ্যই দেখেছি…সে এক দিন ছিল! সবাই বলছে, এই গ্রামের লোকদের নাকি প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। প্রধান লেফ্‌টেনাণ্ট তো মেয়েদের গায়ে হাত দিতে বারণ করেই দিয়েছেন। তবু কার্ল গিয়ে বুড়িটা আর দুটো ছুঁড়িকে খুন করে এল। একটা ছুঁড়ি তো কত কাকুতি মিনতি করলে, আমাদের মেরোনা, মেরোনা, বরং জার্মানীতে চালান দাও!…মানুষ আমাদের উপর ক্ষেপে উঠছে। এর পরে কি হবে?…গাঁয়ের সবগুলো পুরুষকে গুলী করা হোল, গরু, মোষ, আর ভেড়ার তন্ন তন্ন করে খোঁজ চললো, ওরা আগেই সব লুকিয়ে রেখেছিল। আরশুলা পাহাড়ের ফালিপথে গরু ভেড়ার পাল আবিষ্কার করলো তাদের। ওরা মজা করবার জন্যে গরু-ভেড়ার উপর লক্ষ্যবেধ খেলা চালালো। রিক্‌টারই তিনটেকে মেরে ফেললে। এমন সময় প্রধান লেফটেনাণ্ট এসে জানালেন, জলদি কর। ওরা টমিগানের গুলীতে ওদের সাবাড় করে ছুটে চললো।

ফ্যুরারের হুকুম এসেছে ডননদীর পাড়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি একটা রুশকেও আমরা পাড় হইতে দিই, তাহলে কর্ণেল আমাদের সবাইকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। ভগবান করুন, আমরা যেন রুখতে পারি, টিকে থাকতে পারি।…

পায়ে ব্যথা, পেট কামড়াচ্ছে, বুকে ফিক্ ব্যথা…জীবনে তো এমন দশা কখনো হয়নি। এই সবই তো আমাদের হতে পারতো—এই ধানের খেত, গোরু ভেড়ার পাল, গ্রামগুলি—সব। কেন আমরা রাশিয়া হারাচ্ছি? সবাই

বলে, চালের ভুল, কিন্তু সবাই তো ভুল করে। রুশরা যেন কোনো ভুল করেনি?···প্রধান লেফটেনাণ্ট বলেন, ইতালীয়নরা আমাদের পথে বসিয়েছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন হেডিং তো বলেন, ইতালীতে আমাদের পল্টন তেমন ছিল না। তবে আমরা পিছু হটছি কেন? আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি এই-ই কারণ, চার বছরের উপর লড়াই চালাতে কে পারে! যখন এগুচ্ছিলাম, তখন না হয় উদ্দেশ্যটা বোঝা যেত। একটু বাড়াবাড়ি তখন হয়ে গেছে, তা সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তার জন্মে মনে মনে সমালোচনাও করেছি। তবু জানতাম, ফ্যুরার যে জার্মানীর যুবশক্তির অগ্রগতির কথা বলেন, এই সেই অগ্রগতি। কিন্তু এখন তো আর যুদ্ধে কারো আকর্ষণ নেই। ফি-রোজই তো সবার মুখে শোনা যায় কবে শেষ হবে লড়াই, কবে? আমরা নিজেরা টের পাইনি কখন আমরা শান্তিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছি। যদি সজ্-এর পরে আমরা টিঁকে থাকি—সে তো সামরিক দণ্ডের ভয়ে। দণ্ড তো আর ঠাট্টা-তামাসা নয়···

এক গ্রামে ওরা রাত কাটালো: ঘুমুতেও পারবে, পিছনে আছে তিন নম্বর পল্টন, প্রধান লেফটেনাণ্ট দোতলা ইস্কুল বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছেন। রিকৃটার বেছে নিয়েছে একখানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘর। আরগুলা এক বোতল হাঙ্গেরীয় কগ্নাক মদ নিয়ে এল। একটু পান-আহার চললো। রিকৃটারের মনে পড়েছে হিল্ডার কথা, চিঠিতে যেন ভালবাসা মাখানো, একটু বাড়াবাড়ি আছে।···কাল কি হবে, তা না জানা তো ভয়ংকর ব্যাপার! শেষে কি হবে? পরিণতি কি? হয়তো ১৯১০ সালের চেয়ে খারাপই হবে, তখন ছিল সভ্য শত্রু দল, লয়েড জর্জের সঙ্গে তুমি কথা কইতে পারবে, কিন্তু বলশেভিকদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। লুকুতিনের মতো লোকের সঙ্গে কে কথা কইবে! ওরা বদ্ধ পাগল···তা ছাড়া আমরা ওদের চটিয়ে দিয়েছি। ওই বুড়িটাকে কি করে বোঝাতাম যে, ওর কুঁড়ে-ঘরখানির একবাক্স দেশালাইয়েরও দাম নয়? ও তো ওর কুঁড়ে ঘরখানাকেই প্রাসাদ ভেবে বসেছিল। কার্ল ওকে গুলী করে। ওর হয়তো স্বামী আছে.

ভাই আছে···ঐ বর্বরগুলো যদি জার্মানীতে গিয়ে হাজির হয়—কি হবে? না, না, তা হবে না। আমাদের আছেন ফ্যুরার, আছে জার্মান বিজ্ঞান, আছে বিরাট সেনাবাহিনী।

রিকটার আরশুলাকে জিজ্ঞেস করলে,

কি হে সোজ্-এর পাড়ে টিকে যাব বলে মনে হয়?

আরশুলা হয় তো বা একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে বেশি মাত্রায় কগ্নাক টেনে; কারণ যাই-ই হোক, ও একেবারে পাগলের মতো হেসে উঠলো। ওর সরু আর লম্বা গোঁফজোড়া কাঁপছে।

মনে হবার পালা আমি শেষ করে দিয়েছি সাঙাৎ। এক সময়ে আমার বৌয়ের মতো আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলাম। এখন তো ওগুলো প্রচার বলেই মনে হয়। আমি যে সার্জেন্ট, এও তো প্রচার ছাড়া কিছু নয়। মজার ব্যাপার না!···

সে হাসছে। রিকটার ভয় পেল। আরশুলা যখন এমনি বলছে, তখন সব শেষ···বোতলে যেটুকু মদ বাকি ছিল রিকটার এক চুমুকে শেষ করে ঘুমুতে চেষ্টা করলো। আর ভাবতে সে চায় না।

ওরা জেগে উঠলো গুলীর শব্দে। আরশুলা ট্রাউজারটা কোনো রকমে গলিয়ে নিয়ে টমি গান তুলে নিলে। অন্ধকার রাত, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কে কোথায় গুলী চালাচ্ছে কে বলবে! আরশুলা আর রিক্‌টার ছুটে চললো স্কুল বাড়ির দিকে।

রিক্‌টার যেতে যেতে বললে, তিন নং পল্টন রয়েছে পিছনে, রুশরা নিশ্চয়ই আক্রমণ করে বসবে না। আরশুলা শুনতে পায়নি, সে আগে ছুটে যাচ্ছে। এখন সে অভিজ্ঞ সার্জেন্ট।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, আরে, এযে ডাকাতের দল!···

আরশুলো ন' নম্বর পল্টনের অধ্যক্ষ হিসেবে লড়তে লাগলো, এরই মধ্যে সেনাদল পিছু হটে গেল।

ভোর হতে দেখা গেল সার্জেন্ট গ্রুপ আর চৌদ্দজন লোককে পাওয়া যাচ্ছেনা। কার্ল বললে, সে দেখেছে একজন প্রতিরোধ যোদ্ধা আরশুলাকে গুলী করে মেরেছে।

রিকটার আরশুলাকে বোকাই ভাবতো, কিন্তু এখন ওর মৃত্যুতে দুঃখই হোল। কোনো বন্ধুর জন্যেই এত দুঃখ তার হয় নি। আরশুলা ছিল আমাদের অতীতের প্রতীক। আনন্দময় গ্রীষ্মকাল, ভয়ংকর শীত; রেজভ-এর গুলজার নরক, স্ফূর্তি, মেয়ে মানুষ, ভয়, একঘেয়েমি, চিঠি—সব কিছুর প্রতীক ছিল সে...একটা দস্যু তাকে খুন করলে। সে ভাবলে না যে, আরশুলা ছিল পারীতে, সে সেনেগলীদের বিরুদ্ধে লড়েছে, বাইলোস্তক-এ সে প্রথম ঢোকে বিজয়ী বেশে। বেচারা আরশুলা! ও যে মরবে, সেকথা বুঝি টের পেয়েছিল। তাই সে হেসে বলেছিল, তার কিছুতেই বিশ্বাস সেই। তবু তো বীর সেনার মৃত্যু সে বরণ করে নিলে···

গাঁখানা যেন বোলতার চাক। আহা, কি আপশোস যে আমরা পুড়িয়ে দিইনি! কিন্তু এখনো তৃতীয় বাহিনী আমাদের পিছনে...ওরা আমাদের চেয়ে পটু···ওরা কিছু বাকি রাখবে না ঃ সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে···

পথের পাশে একখানা গ্রাম দেখে রিক্‌টার চেঁচিয়ে উঠলো,

এস আমরা গ্রামখানা পুড়িয়ে দিই!

ওর কামনা আগুন, চীৎকার, মৃত্যু...তাই নিজের বিপদের কথাও ভুলে গেছে।

দশ

নিবিড় সোহাগের মুহূর্তে রিকটার তার স্ত্রীকে 'বেড়ালছানা' বলে ডাকে ; কিন্তু যখন সে চটে যায়, ঈর্ষা যখন এসে দেখা দেয়, সে ভাবে···ও একটা পাজি বেড়াল, খালি গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়ায়। হাঁ, হিল্ডার ভিতরে কেমন যেন মার্জারীর একটা আদল আছে—ওর চোখ সবুজ, আয়ত, হালকা তার চলন, আর আছে কেমন এক নিস্পৃহ ভাব। এতেই রিকটার ক্ষেপে যায়। তার শুধু মনে হয়, তার স্ত্রী এক আলাদা জীবন কাটাচ্ছে। যখন সে একান্ত বাধ্য হয়ে ওঠে, তখন তার ভিতরেও দেখতে পায় অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা।

বসন্ত কালে ছুটিতে সে বাড়ি গিয়েছিল ঃ বার্লিনের বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরে, এটা ওটা নেড়ে চেড়ে ছেলে মানুষের মতো সে হাসতো। হঠাৎ একদিন একটা ফুলদানি নিয়ে মেঝেয় আছড়ে ফেললে। হিল্ডা পেল ভয়। সে খেঁকিয়ে উঠলো, রেজভ্‌কে তুমি কি সত্যিই জান ?···স্নানের বন্দোবস্ত করে দিলে হিল্ডা, খানিকটা পাইন-নির্যাস ঢেলে দিলে জলে। রিকটার এক অসংলগ্ন গল্প শুরু করলে। কোথায় কোন পাইন বনে শেফার আর ওয়াল্টার মারা গেল। হিল্ডা তাদের চেনেনা, সামরিক সংজ্ঞাগুলোও তার জানা নেই। সৈনিকদের অশ্লীল গালাগালে বেজে উঠলো রিকটারের স্বরে। বিষাক্ত স্মৃতি থেকে ওকে মুক্তি দেবার জন্যেও পাড়লো নিজের পোশাকের কথা, সংসারের কথা, বান্ধবীদের প্রেমের কথা। রিকটার বাধা দিলে ঃ ওসব আমি শুনতে চাই না !···তার মনে হোল, তার দুঃখের কথা হিল্ডা শুনতে চায় না। হৃদয়হীনা পুতুল। যখন সে কাদাভরা খাতে হুটোপুটি খেয়েছে, তখন সে একদল অকেজো মানুষের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে বেরিয়েছে। সে তাকে 'বেশ্যা' বলে গাল দিলে, তারপর আবার মাপ চাইলে। ওর কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলিয়ে ডাকলে, বেড়াল ছানা।

আবার হাত মুচড়ে দিয়ে দাবী জানালে, বল, তোমার প্রেমিক কে ? হিল্ডা জবাব দিলে, তুমি, আবার কে ! রিকটার যেন তার স্বামী নয়, তার, প্রেমিক, একজন

অচেনা মানুষ। হিল্ডা ওর অভদ্রতা ক্ষমা করলো, এর পিছনে সে পেল যুদ্ধের গন্ধ। যখন রিক্টার নালিশ করলে, সে রোবার্টকে সন্দেহ করে, হিল্ডা হেসে উঠলো: হা ভগবান! আমার সঙ্গে ওর ন'বছর ধরে তো প্রেম ছিল, তোমার আগেই ও আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে!···আর এখন তুমি ভাবছ, আজও ও আমার প্রেমিক আছে? এতো আজগুবি কথা।···রোবার্টকে হিল্ডা নিজের 'সহকারী' বলে ভাবে। হিল্ডাকে যখন সে কফি কি এক জোড়া মোজা এনে দেয়, সে বলে, বাবা যেরকম চুমুখান, অমনি করে তুমিও গালে চুমু খেতে পার।... স্বামীর কাছে সে সতীই আছে, কিন্তু এ তার গর্ব যে, সতী থেকেও সে কিছু ভক্ত জুটিয়েছে। এই যুদ্ধের বাজারে, যখন সবাই গেছে সেনাদলে, তখন এতে তো বাহাদুরি কম নেই! সে এদের সঙ্গে একটু বা ছেনালি করে, সবার সঙ্গেই করে। সবে তিরিশে সে পড়লো, সে ভয় পেয়ে গেল, তাহলে বুড়ো হতে চলেছে। কিন্তু যারা বলে সে দিনে দিনে সুন্দর হচ্ছে, তারা সত্যি কথাই বলে। তরুণীর উজ্জ্বলতা সে বজায় রেখেছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে পূর্ণ অতৃপ্তি কামনার ছায়া দেখা দিচ্ছে। রিক্টার তো বলে, তুমি একটা সাদা নিগ্রো মেয়ে, তোমার জন্যে চাই তাল গাছ আর চাবুক, তাল গাছে বেঁধে চাবুক দিয়ে পিটলে বুঝি ঐ শ্বেত নিগ্রো মেয়ের অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত হবে···

হিল্ডা বার্লিন ছেড়ে যেতে চায়নি, কিন্তু বিমান হানার ভয় তার যথেষ্টই ছিল। ছ'বছর স্বামীর সঙ্গে সে রয়েছে একই বাড়িতে, বাড়িটি যেন তার কাছে এক বন্দর। কিন্তু সেই বন্দর ছেড়ে আসতে হোল ছোট শহরটিতে। এখানে আছে বোকা জোহানা, সে লিপষ্টিককে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক বলে মনে করে। দেখে শুনে সে মুষড়েই পড়লো। কি আছে এ শহরে? শুধু অশ্রুমুখী নারী, গুজব, খাদ্যের কথা—ফ্রাউ মিলার ডেনমার্ক থেকে তিন নম্বর পুলিন্দা পেয়েছেন; ক্লারা পেয়েছে দুটো ফ্যুরারের পুলিন্দা ('মৃত্যুর পরে জার্মান সৈনিকদের জিনিসপত্র পাঠাবার পুলিন্দার নাম) এলসি কি করে তেল ছাড়া আলুর সালাদ করতে হয় তা জানে।···প্রায় সবাই চলে গেছে যুদ্ধে। যুবকদের মধ্যে আছেন ডাক্তার

ল্যাঙ্গ, তার একটা চোখ কৃত্রিম, তিনি যখন সদয় হয়ে কারো প্রশংসা করেন, এমন তার মুখের ভঙ্গী যে দেখে ভড়কে যেতে হয়। মেয়েরা ট্রাউজার পরে ঘোরাফেরা করে, গো পালন আর পোলিশ চাকরানীদের কি করে সায়েস্তা করতে হয় সেকথাই বলে। বন্দীশিবির থেকে একজন রুশ ফেরার হয়েছে, তার ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। সে নাকি পথিকের উপর হানা দিচ্ছে। আর ভয় বিমান হানার —শহরের কাছেই আছে রসায়নাগার।

ইতালীর মানুষটি তবু হিল্ডার আনন্দের একটু খোরাক জোগায়। লুইগি তার সঙ্গেই দেখা করতে আসে, জোহানার সঙ্গে নয়। নিশ্চয়ই তাই আসে। মুখে আবেগ প্রকাশ থেকে চুমু অবধি সে এগুতে চায়, কিন্তু হিল্ডা বাধাই দেয়। সে অভিনেতার মতো যখন বলে ওঠে, আমার আরাধ্যা দেবী···আমার তারা! তখন ভালই লাগে।

হাতের উপর চুমু খেতে সে দেয়, কিন্তু তার বেশি নয়···তুমি কি পাগল নাকি। আমার স্বামী আছে! সিঁড়ি বেয়ে ইতালীর যুবকটি যায় চিলে কোঠায়। সেখানে থাকে হিল্ডা। জোহানা ঠোঁট কামড়ায় আর ভাবে, ফ্যুরার এই পাজিগুলোর উপর নির্ভর করে ভুল করেছেন, এর থেকে ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে ভাল হোত···।

জোহানা শুধু ইতালীয়ানদের নয়, যে সব জার্মান দেশে আছে, তাদেরও ঘৃণা করে। ডাক্তার ল্যাঙ্গকেও ঘৃণা করে (এক চোখ নিয়েই তো ও লড়তে পারে) যাদের স্বামীরা এখনো মরেনি, তাদেরও সে সেখতে পারে না। তার স্বামী উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে ভলকভ-এর পারে মারা যায়। যুদ্ধের আগে স্বামীর সঙ্গে তার অবিরাম ঝগড়া চলতো। ওতো ঘাঘরার পেছনে ধাওয়া করেই সময় কাটাতো, একেবারে একটা বাউণ্ডুলে ছিল সে, কিন্তু এখন সে তার ছবি সারা বাড়ি জুড়ে টাঙিয়েছে; অতিথিরা এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য 'বেচারী' কার্ল-এর দিকে নীরবে তাকিয়েও থাকেন, থাকতে বাধ্য হন। হিল্ডাকে সে তো পাগল করেই দেয়···বোন, আজ তো তোমাকে দেখছি বেশ ভালই দেখাচ্ছে!

তুমি এমন সেজেছ, মানুষ তো ওসাজ দেখলে যুদ্ধের কথা ভুলেই যায়!...

হিল্ডা স্বামীকে লিখলে কাগজের খবর পড়ে সে ভয় পেয়েছে—লেখা উচিত মনে করেই সে লিখলে। জায়গাগুলির রুশীয় নাম তার গোলমাল হয়ে যায়, রুশরা ওরেল বা কারকভ দখল করেছে—এতেও তার কিছু যায় আসে না। কার্ট (রিকৃটার) বলেছে, রুশ শহরগুলি আসলে বড় গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়, তাও আবার ভাঙাচোরা। শুধু ভদ্রতার খাতিরেই স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে হয় ওখানকার খবর। এবার স্বামীর চিঠির জবাব পেয়ে সে বহুক্ষণ কাঁদলো। আগেও কার্ট অসুবিধের কথা বলেছে, কিন্তু প্রতি চিঠিতেই সুখবর মিলেছে দু-চারটে। যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিল, তখন সে বলেছিল, রুশরা শেষ যুদ্ধ চালাচ্ছে; বনে দস্যুদল আছে; আর আবহাওয়া তো সব চেয়ে খারাপ; রুশরা এক রকম কামান তৈরী করেছে, যা দেখলেও পাগল হয়ে যেতে হয়। তবু হিল্ডা যখন জিজ্ঞেস করলে, শেষে কি হবে, সে জবাব দিয়েছিল, আমাদের সমর-কৌশল কত উন্নত সে কথা কর্নেল গেবলারকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়, রুশদের থেকে ঢের ঢের উন্নত। যত ক্ষতিই হোক, শেষে আমরা জিতবই। কিন্তু এখন কার্ট লিখছে, আমরা এখান থেকে বেরুতে পারব না, শুধু তাই-ই নয়, এই বর্বরগুলো হয়তো বা তোমাদের ওখানে গিয়েও হাজির হবে। এখন তো তাই-ই মনে হচ্ছে।...কার্ট আশাবাদী। ও যদি এমনি ধারা লেখে, তাহলে খবর খুবই খারাপ। হিল্ডার চোখের জলে ভেজা মুখ দেখে জোহানা খুশিই হোলো। কি খারাপ খবর পেলে নাকি? তোমার স্বামী কেমন আছে? হিল্ডা জবাব দিলে, স্বামী ভালই আছে, কিন্তু জার্মানীরই অবস্থা খারাপ·· সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে; হয় তো কার্টের উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে? বার্লিনে বিমান-হামলার সময় আমি তো পাগল হয়ে গিছলাম, আর এতো যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপার। এখানে তো অনবরত বোমা পড়েছে। আর তা ছাড়া রুশদের সেই কামানও আছে। কার্টের মাথা খারাপ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।...তবুও ভয় সে পেল; হঠাৎ তার মনে হোল, অভিশপ্ত যুদ্ধের ঘূর্নিতে সেও পড়ে গেছে।

কয়েক দিন পরে তার ভাইয়ের কাছ থেকে তার পেল, এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে, সঙ্গে আছে তার একজন বন্ধু। হিল্ডা আর্থারকে পেলে খুশি হয়, এবার আরো খুশি হোল।—এখানে তো ক্রন্দনরতা জেনির দল, আর আছে ঐ ভয়ংকর চিঠি···

আর্থার এল, মন তার খুশি। গানের একটা কলি ভাঁজছে তো ভাঁজছেই

বন্ধুগো, হতাশ হোয়ো না, হোয়োনা
ডিসেম্বরের পরে মে
ভেবো না ভেবো না !···

হিল্ডার জন্যে সে এনেছে কিছু চিনি আর মস্ত এক টুকরো সাবান। তার সঙ্গী লেফটেনাণ্ট হেবিং সুশ্রী ছেলে, কপালে তার ক্ষত চিহ্ন। দু-দুটি সামরিক তকমা জুটেছে তার। আর্থারের বকবকানি তো থামেই না, আর লেফটেনাণ্ট হেবিং নিঃশব্দে হিল্ডার দিকে তাকিয়ে হাসে। হিল্ডা একবার বললে,

আপনি কি সম্মোহন বিদ্যা জানেন নাকি ? বহু লোক আমাকে অমনি করে বশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি নিজেকে সঁপে দিইনি···

না, না ! লেফটেনাণ্ট চেঁচিয়ে উঠলো, রাশিয়ার ব্যাপারের পর আজ আমার দেশে এই শান্তির নীড়ে বসে আরাম করছি। আমার সামনে আছেন একজন সুন্দরী মহিলা। ভদ্র তার ব্যবহার, হিল্ডা যদি তার সঙ্গে একটু ছেনালি করে, তাও অশোভন কিছু নয়—একটু ছলা-কলা না দেখিয়ে সে পারে না ! সে এক চমৎকার নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা করে ফেললো, শুয়োরের মাংস, মটর, মোজেল আর কগনাক। আর্থার প্রচুর মদ টেনে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো রুশরা কি করে নাচে। লেফটেনাণ্টের চোখ হিল্ডার দিক থেকে ফিরলো না। হিল্ডা জিজ্ঞেস করলে,

আপনার পল্টন কোথায় আছে ?

দক্ষিণে ; ক্রাইমিয়ায়।

খুব জোর চলছে লড়াই ?

তাই তো বলা উচিত। আর্থার হো হো করে হেসে উঠলো।

কার্ট আছে মাঝখানে। সে তো লিখেছে, সময় খারাপ।

আর্থার বললে, ওকথা না ভাবাই ভাল। কগ্‌ন্যাক কিন্তু চমৎকার!

গ্রামোফোনটা সে চালিয়ে দিল।

লেফটেনাণ্ট হঠাৎ হিল্ডাকে জড়িয়ে ধরে বহুক্ষণ নাচলো। মাথা ঘুরছে হিল্ডার—মদে, উদ্‌বেগে, আনন্দে ঘুরছে।

আর্থার এবার বুদ্ধির খেলা দেখাতে শুরু করলে,

রণাঙ্গন কেমন জান? ঠিক যেন ছায়াছবি, সব কিছুই চলছে, সেখানে পিছনের আসনই সবচেয়ে সেরা আসন···

হিল্ডা হাসলো,

আমরা তো বেশ পিছনে বসে আছি, তবু তো আমরা নিরাপদ নই।

লেফটেনাণ্ট সায় দিলে,

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন ফ্রাউ রিক্‌টার, আমাদের একই নিয়তি···

হিল্ডা, লেফটেনাণ্ট আর তার ভাইয়ের দিকে তাকালো, ধূসর রঙের কুশ্রী সাবানের টুকরোটাও দেখা যাচ্ছে। চোখে তার জল।

আর্থার, তুমি যেবার ফ্রান্স থেকে ফিরে এলে সেবারেও তো দেখেছি। আমার জন্যে তুমি এক বোতল সেণ্ট এনেছিলে সেবার। তখন তুমি বলেছিলে, শীগ্‌গিরই তোমরা ইংলণ্ডে নামবে···

হাঁ, এখনো বলছি, আমরা সেখানে নামবই, আর্থার জবাব দিলে।

আমরা কি বেশিদিন আর লড়াই চালাতে পারব?

মহিমময় ফ্রেডারিক সাত বছর যুদ্ধ চালিয়ে তবে জয়ী হয়েছিলেন, আমাদের হাতে তো এখনো তিন বছর বাকি।

সবচেয়ে ভাল কি জান, ওকথা না ভাবা, লেফটেনাণ্ট বললে।

অবাক হয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো হিল্ডা, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলে। লেফটেনাণ্টের চোখে ভেসে উঠেছে শ্বাপদের ছায়া, আবার প্রীতিও উথলে পড়ছে।

জানি না তুমি রুশ ফৌজকে হারিয়েছ কিনা, কিন্তু রুশ মেয়েদের কাবু করেছ একথা হলফ করে বলতে পারি···

ভাই আর লেফটেনাণ্টের জন্য খাবার ঘরে বিছানা করে দিয়ে সে চলে গেল তার নিজের ঘরে। সে হাসছে, কিন্তু চোখ দিয়ে ঝরছে জল। তাহলে কার্ট যা লিখেছে সত্যি···রুশরা পোল্যাণ্ড নিক, বোহেমিয়া নিক, কিন্তু এখানে ঘেঁসতে দেওয়া হবে না!··কিন্তু মানুষ এমন সহজ কথাটা বোঝে না কেন? আর্থার আরো তিন বছর লড়তে চায়···কিন্তু তখন তো কেউ আর বেঁচে থাকবে না—যুদ্ধক্ষেত্রেও না, এখানেও না। ওরা পাগল হয়ে গেছে···লেফটেনাণ্ট ছেলেটি কিন্তু বেশ···

আর্থার পরদিন সারাদিন ধরে জিরুলো, কাউচে গা এলিয়ে দিয়ে পড়লো রহস্য উপন্যাস। হিল্ডা আর লেফটেনাণ্ট গেল মারি লুইস কাফেতে—ওখান থেকে উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। লেফটেনাণ্ট হিল্ডাকে যুদ্ধের কথা বললে। তার কথা যেন কার্টের চেয়েও ভাল। কৌতূহল জাগায়। সে বললে, আমার ওদের সকলের জন্যেই দুঃখ হয়, ছেলেমেয়েদের জন্যে তো আরো বেশি··· একবার এক রুশ গোয়েন্দাকে ধরেছিলাম, সুন্দরী মেয়ে সে, প্রথমেই আমার আঙুল কামড়ে দিলে, তারপর আমার কাছেই রিভলভার চেয়ে বসলো, নিজেকে সে গুলী করবে।···জ্বলন্ত শহর, সেও এক সুন্দর দৃশ্য। আমার কি মনে হয় জানেন, বেটোফেন যদি এমনি দৃশ্য দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁর নবম সুরতরঙ্গে আরো উদ্দীপনা দেখা দিত।···আমরা অভিশপ্ত···কিন্তু জীবন আমাদের আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে···সন্ধ্যের ওরা দুজন খেল মদ, হাসলো, নাচলো।

রাতে হিল্ডা আলো নিবিয়ে দিলে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বার আগে শুনলো সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। হয় তো আর্থার···আলো জ্বেলে দেখলে লেফটেনাণ্টকে। সে চেঁচিয়ে উঠলো;

• তুমি কি পাগল!

লেফটেনাণ্ট তার মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ফিসফিসিয়ে বললে,

কি করছ ! আর্থার ঘুমিয়ে আছে…

সে আলো নিবিয়ে দিল, হিল্ডা আর চেঁচালো না। যখন সে চলে গেল, হিল্ডা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো ; কি যে হয়ে গেল তার কোনো উপলব্ধি নেই, নেই অনুভূতি। এর জন্যে নিজেকে সে ক্ষমা করতে পারবে না…কি স্পর্দ্ধা, এক বিবাহিতা নারীর কাছে বিনা আমন্ত্রণে চলে আসে !…তাও আবার তারই এক বন্ধুর বোন ?…ওরা এখন বর্বর। কার্টও হয়তো এমনি হয়ে গেছে…কিন্তু একটা সোহাগের কথাও তো বললে না…কিন্তু তবু ভাল লাগছে…এ কি পাপ ? বাজে কথা। ওরা কালই হয়তো এসে বোমা ফেলবে, অথবা এসে ঢুকবে এখানে… যতদিন বেঁচে আছ, উপভোগ করে নাও জীবন…

লেফটেনাণ্ট রোজ রাতে আসছে হিল্ডার কাছে ; হিল্ডাও প্রতীক্ষায় থাকে তার। যখন তারা দিনের বেলা একা থাকে, কত তুচ্ছ কথাই না বলে। কিন্তু রাতে কথা হয় না। এবার চলে গেল আর্থার আর লেফটেনাণ্ট। ষ্টেশনে হিল্ডা কেঁদে ভাইকে বললে,

রুশদের আসতে দিয়ো না ভাই।

সে হাসলো :

বেশ তো দেব না।

লেফটেনাণ্ট টুপী নাড়লো :

জোহানা হিল্ডাকে বললে, তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে, আমাদের সাহসী সেনাদের ভালবেসে তো এই রকমই ফলই হয়…হিল্ডা বুঝলো, জোহানা শুনতে পেয়েছে, রোজ রাতে লেফটেনাণ্ট আসতো তার কাছে। তা কে কার তোয়াক্কা রাখে ! সে জবাব দিলে, জোহানা, আমি তিরিশে পড়েছি, আমার খপরদারির ভার তোমাকে নিতে হবে না…

লেফটেনাণ্টকে ভুলতে পারলো না হিল্ডা। আগের চেয়েও সে এখন বিষণ্ণ। খবরের কাগজে বার বার লিখছে, রুশদের বিরাট সংরক্ষিত সেনাদলের কথা। কার্টের চিঠিও এক হপ্তা ধরে, সে পায়নি। হিল্ডা উদ্‌বিগ্ন, সে কাঁদে এবার

এল পোষ্টকার্ড। হিল্ডা আনমনা হয়ে পড়লো চিঠি, তারপরে এক সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে। লুইগি এবার এসে জানালে তাকে মাজবুর্গে পাঠাচ্ছে, সে বিদায় নিতে এসেছে। হাতে সে চুমু খেল। হঠাৎ হিল্ডা তার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমার বোন বাড়ি নেই।···

সে হাসলো আরসীতে নিজের মুখ দেখে। এখনো আমি সুশ্রীই আছি। জীবনকে উপভোগ করতে হবে। মানুষ এখন আর বুড়ো বয়সে মরে না···আগে হিল্ডা মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে চিঠি লিখতো, কখনো বা বহুদিনই কেটে যেত ; এবার রোজ লিখতে লাগলো। চিঠিতে ভালবাসার কথা যেন আরো বেশি ঝরে পড়তে লাগলো। সে কার্টের প্রতীক্ষায় আছে, মৃত্যু অবধি সে থাকবে সতী···

সেদিন কনকনে ঠাণ্ডা রাত। চাঁদ উঠেছে। হঠাৎ জানালা ঝন ঝন করে কেঁপে উঠলো, তারপর সাইরেনের গোঙানি। হিল্ডা তার রাতের পোষাকে পরে শুয়ে রইল ভুগর্ভে তো আশ্রয়ের মাটির মেঝেয়। ভয়ে আর শীতে সে কেঁপে কেঁপে উঠলো। বার্লিনের থেকেও এখানে খারাপ ঃ সে শপথ করলে, আজ যদি জ্যান্ত বেরুতে পারি, হে ঈশ্বর আমি আর কার্টের কাছে অসতী হব না। না, আর নয়, আরনয়···

পরের দিন ভোরে উঠে সে দেখলো ধ্বংসীভূত বাড়ির সার। জোহানা জানালে, একশোর উপরে লোক মারা গেছে। হিল্ডা কার্টকে লিখলো, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না, এখানে ভালই আছি। তোমার জন্যে করছি প্রতীক্ষা···

আরো কয়েকদিন কেটে গেল। বুকে ব্যথা, বোধ হয় সেদিন বোমা-প্রতিরোধকারী আশ্রয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছিল। ডাঃ ল্যাঙ্গকে সে ডেকে আনলে। তিনি বুকে টোকা দিয়ে দেখে একটা মিক্‌শ্চারের ব্যবস্থা করে বললেন, এত যে সব হচ্ছে, তুমি কিন্তু দিন দিন সুন্দরই হচ্ছ। হিল্ডা তার দিকে তাকাবে না ঠিক করলো। ডাক্তারের বাঁ চোখ নিস্প্রভ, নিয়তির মতো অভিব্যক্তি তাতে নেই···চোখ বুজে হিল্ডা বললে, ডাক্তার আপনি পাগল !...হাঁ, আপনি পাগল, আমরাও বুঝি পাগল !

এগারো

কমরেড মেজর পিষ্টনের আঙটা বদলেছিলাম, কিন্তু নতুনগুলোও আলগা হয়ে এসেছে।

সার্জি গাল পাড়লে—অভিশপ্ত এই আঙটাগুলো। আমরা নিপারে পৌঁছে গেলাম, আর সামান্য ক'টা আঙটা এখনো ঠিক হোল না! এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সবাই ব্যস্ত···মানচিত্রে আর একটি মাত্র চৌকো চিহ্ন আছে, তার পরেই নিপার···ট্রাক সাদা বালিতে বসে বসে যাচ্ছে; হেডলাইটের তীব্র আলোয় বরফ বলে মনে হয়। সোজা হুঁশিয়ারি দিলে, হেডলাইট নেভাও, আমরা শীগ্‌গিরই নদীর কাছে এসে যাব।

বালির ভিতরে ট্রাক আর মোটরের ফাঁপা, ফাঁকা শব্দ। সবাই ফিসফিস করে কথা কইছে।

স্যাপারেরা বড় বড় কাঠ টেনে নিয়ে চলেছে, সিগনালম্যান একগাদা তার আর টেলিফোনের সবুজ বাক্স নিয়ে চলেছে। তারপরে কামান। ট্যাঙ্কগুলো এখন বনের আড়ালে। জেনারেল পেত্রিয়াকভ এবার এসে পৌঁছলেন।···

এক বুড়ো জেলে খবর দিলে, এখানকার জেলেরা আটখানা নৌকো জার্মানদের ভয়ে অল্প জলে লুকিয়ে রেখেছে। নৌকোগুলো টেনে তোলা হোল। বাড়ির ফটকগুলো খুলে এনে তৈরী হোল ভেলা। ভিতরে বিছিয়ে দেওয়া হোল নলখাগড়া আর খড়।

সার্জি বনেই ছিল। এখানে যেন এক কাঠ-চেরাইয়ের কারখানা বসে গেছে, পন্‌টুন কালকের আগে এসে পৌছবেনা; রাস্তা একরকম বন্ধ হয়ে আছে।

এক পা চলা যায় না। জুতোয় বালি ভর্তি। বুকে ভার, আবার আনন্দও আছে। সবাই অস্থির, যেন নদীর পারেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, সেখানে যেন আছে আপন কুটির; ফটকে প্রতীক্ষায় আছে একটি মেয়ে, আর আছে আনন্দ।

কিন্তু তাতো নয়। নদীর ওপারে আছে জার্মানরা। তারা এলোপাথারি গুলী চালাচ্ছে—আমাদের সেনাদলকে রক্ষা করছে বনের আড়াল, কতগুলি লোক বিশ্রাম করছিল, তাদের মাঝখানে এসে পড়লো গোলা। নিপার এসে গেছে, কিন্তু তাকে এখনো দেখতে তারা পায়নি ···

এই যে নদী! ওরা মুখ ধুলে, হাত জলে ডুবিয়ে রাখলে, কেউ বা আঁজলা পুরে খেল জল।

হাঁ—এই আমাদের নিপার! উনিশ শো একচল্লিশে ওরা নিপারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল—কেউ বা কিয়েভ, মোগলিয়েভ, কেউবা স্মোলেনস্ক থেকে। ওরা দেখেছে নিপারের স্বপ্ন, ওর কথা এমনি ভাবতে সাহস হয় নি। গান গেয়েছে, নিপার, নিপার, নিপার, দূরে বয়ে যাও তুমি, তোমার জল তো অশ্রু। ওরা গান গাইবার জন্যে গায় নি, কাঁদবার জন্যে, গাল পাড়বার জন্যেই গেয়েছে। এমনি কত নদী আছে, কিন্তু এখানেই এল বিরাট দুঃখ। নিপার অদৃষ্টের নদী। ভোলগা আর সাইবেরিয়ার অদৃষ্টও ওর সঙ্গে বাঁধা। ওরা নিপারের পার থেকে নিজেদের গাল দিতে দিতে বিদায় নিয়েছিল, কিন্তু আজ ফিরে এসেছে অন্য মানুষ হয়ে। সবাই ফিরেও আসে নি। ওদের পদক্ষেপ ভারি, যারা হারিয়ে গেছে তাদের স্মৃতি যেন সীসের মতো চেপে বসেছে। ওরা এল ডোন্ থেকে, ভোল্গা থেকে, স্তালিনগ্রাদ থেকে যারা এসেছে তাদের সহজে চেনা যায় চোখ দেখে, হাসি দেখে; আর নীচু স্বর শুনে। তারা বলছে, আমরা এলাম! এলাম!

শহরগুলি ওপারে। জার্মানরা ভাগ্যবান। কিন্তু এখন ওদের কে রক্ষা করবে? এই অভিযানকে কে দেবে বাধা?·· একি বাধা দেওয়া সম্ভব?··সেনাদল এসে মিলেছে এখানে—সমস্ত দেশ যেন এসে পৌঁছেছে নিপারের ধারে—তাদের দুঃখ, উষ্মা, ক্ষুধা, উদ্বাস্তুর শেষ সম্বল নিয়ে, আর আছে তাদের চূর্ণবিচূর্ণ জীবন আর জ্বলন্ত শহরের স্মৃতি। সবার মনেই এক চিন্তা: আরো জোরে চল! বাঁচতে আমরা চাই! আমার বৌ লিখেছে, আমার মা···নিপারে পৌঁছবার

আগে ওরা ভাবনা না করেও পারতো। তখন চলছিল মার্চ—আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ। প্রলোভন তখন দূরে ঠেলে রাখা যেত। কিন্তু এখন তো এল অনুভূতি ঃ আমরা শেষ করে এনেছি—চুরমার করে এগিয়ে যাচ্ছি।

ব্যথা আর মৃত্যু তবু দাবী জানাচ্ছে, এই চমৎকার সাদা বালির উপরে পড়লো রক্তের দাগ। ষ্ট্রেচার-বাহকরা দুজন টমি বন্দুকধারীকে নিয়ে এল। একজন কাতরাচ্ছিল, আর একজন হাসছিল। হয়তো হাসি নয়, মৃত্যুর আকুলি-বিকুলি।

উজ্জ্বল, উষ্ণ দিনগুলি, কিন্তু রাত ঠাণ্ডা, জল বরফের মতো। আর কতদূর ওপার?

সার্জি বলে, চারশো আশী গজ। হাওয়া উঠেছে। জোর হাওয়া পালে কাঁপছে।

সার্জেণ্ট সাদোকিয়েভ গজর গজর করছে, একে কি নৌকো বলে নাকি! জল সেঁচার ডুরিটা কোথায়?···

দাঁড়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে নিলে। জার্মানরা আছে ওপারে।

জার্মানরা জানে, রুশদের পনটুন্ নেই,—জেনারেল সিইবার্ট নিশ্চিন্ত। তবু তিনি আরো হুঁশিয়ার হয়ে নদীর উপরে গুলী চালাবার হুকুম দিলেন।

এই কুত্তি! অতো জল গিলছিস কেন? সাদোফিয়েভ ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো।

আরো দুখানা নৌকো অনেক দূরে চলে গেছে, জার্মানরা চালাচ্ছে গুলী। জলে তোলপাড়। নৌকোয় দুজন লোক আর একটা মেসিনগান। তিন ঘণ্টা ধরে ওরা দাঁড় বেয়ে চললো, হাতের তালু দিয়ে রক্ত ঝরছে। একটা ঝোপের ভিতরে এবার নৌকা ভেড়ালো। জার্মানরা কাছে কোথাও আছে।

আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে আছে—ইউক্রাইন নিজের বিশ্বাস রেখেছে—এমন রাতে তো তারা আকাশে ছড়িয়ে দিতেই হবে।

তারপর?·· একটা মেসিন গান গর্জন করে উঠলো। অন্য নৌকাগুলোও এল।

কাঠ আর তেলের পিপের ভেলা ভাসছে।

এবার নিয়ে আসা হোল পন্‌টুন। সেচেভ্রেঙ্কো নদী সাঁতরে পার হয়ে গেল, দড়ি নিয়ে।

একটা মর্টার গোলা এসে পড়লো পন্‌টুনের সেতুর উপর। স্যাপাররা উর্দি ছিড়ে ছেঁদা বুজিয়ে দিলে। রাবিনোভিচ নদীর তলায় ডুব দিলে মেসিন গানটা উদ্ধারের জন্তে। জার্মানরা জেটি আক্রমণ করেছে।

সাদোফিয়েভ এবার গাল পাড়ছে, মেজর বলেছেন চারশো মিটার, কিন্তু সাঁতরাতে গেলে দেখা যায়, চার কিলোমিটার। নৌকোগুলো যদি ছড়িয়ে পড়তো, তাহলে কি হোত ভাব তো? আর ফ্রিৎসরা যদি আসতো ছুটে…

তারপর?…তারা সাদোফিয়েভকে অভিনন্দন জানালে। সার্জি সদর ঘাঁটিতে বিবরানী পাঠালে। টেলিগ্রাফ-কেন্দ্রে সুরা বারানোভা এক দীর্ঘ তার পাঠাতে বসলো। ক্রাসনায়া ভেজদার সংবাদদাতা ছুটোছুটি করছে আর শুধাচ্ছে, সাদোফিয়েভ দেখতে কেমন? যদি চেহারার একটু বর্ণনাও পাঠাতে পারে…মস্কোতে এক বিজ্ঞপ্তি তৈরী হোল। সমস্ত পৃথিবী কাল জানবে সার্জেণ্ট সাদোফিয়েভ-এর নাম।

এক মুহূর্তের জন্য স্তালিন মানচিত্রের কাছে থেকে সরে এলেন। এক দীর্ঘ রণাঙ্গন তিনি দেখতে পেলেন—নীপারের রেখা—পথে সেনাদল, শত্রুর অবস্থান—আর তার মধ্যে এক তরুণ সার্জেণ্ট, চোখে তার দুষ্টুমি। সাদোফিয়েভ…জারিৎসীনে আমার সঙ্গী ছিল এক সাদোফিয়েভ। হয় তো এরই বাবা?…স্তালিন সাদোফিয়েভর সঙ্গে নৌকো বেয়ে ওপারে চলে গেছেন, উনিই স্তালিনগ্রাদের টিলার উপর ছিলেন ওসীপ আর মিনায়েভের সাথী—প্রচণ্ড তুষারঝড়ের ভিতরে তিনি মার্চ করে গেছেন ডোন্ থেকে নিপার অবধি। হাঁ, তিনিই আজ নিপারের পরপারে সাদোফিয়েভের সাথী। সাবাস সাদোফিয়েভ! ওর সঙ্গে আমরা ভিশ্চুলা পার হব, পার হব ওডার…

কর্ণেল গেবলার নিভে-যাওয়া চুরুটের টুকরোটা চিবোচ্ছেন। রুশদের উপর তিনি বিরক্ত। পনটুন ছাড়া নদী পার হবে, একথা ভাবা যায় কখনো! ওরা

বর্বর, তাই ওদের সুবিধে অনেক···কর্ণেলের সামনে মানচিত্র বিছানো, পালটা-আক্রমণের কথা তিনি ভাবছেন, রুশদের আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে ; আবার দু' সপ্তাহ সময় পাওয়া যাবে, অন্ততঃ দু' সপ্তাহ। হঠাৎ পণ্টনের সংখ্যা, গ্রামের নাম, দ্বীপ আর জলাভূমি একাকার করে দিয়ে এক যুবক এসে দাঁড়াল। উঁচু তার চোয়ালের হাড়, মাথায় সোনালী টুপী। সাদোফিয়েভ উঠে এসে সবুজ ব্রোঞ্জের ঈগলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে মাটিতে।

পারীতে লেজাঁ বসেছিলেন রেডিয়োর পাশে। বড় বিষন্ন তার মন, পলের মৃত্যু সংবাদ তিনি শুনেছেন। জোসেতের এক মাসের উপর খবর নেই। দুদিন আগে আঁদ্রে আর গ্যারো গ্রেফতার হয়েছে, তিনি একটা দল রুঁয়েয় পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাদের হাতিয়ার দিতে পারেন নি। হঠাৎ স্বর ভেসে উঠলো ঃ মস্কো থেকে বলছি। তাঁর মনে হোল নিপার কাছে, সিনের খুব কাছে। সাথীরা চলেছে, বন্ধুরা চলেছে, ওদের সঙ্গে তাঁরও পা পড়ছে তালে তালে। ঐ সাদোফিয়েভের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চলেছেন পা ফেলে, সাদোফিয়েভ যেন মিলেত-এর মতো দেখতে. শুধু তার চুলের রঙই বুঝি আলাদা···

জেনারেল পেত্রিয়াকভ সাদোফিয়েভকে বললেন, তুমি তো বীর—হাঁ, একথা অস্বীকার করবার জো নেই—বীর, তুমি বীর !···সাদোফিয়েভ স্বাভাবিক ভাবেই বলে গেল, নৌকো থেকে নেমে তো কাজ শুরু করে দিলাম...এমন কি আর করেছি—সে আপন মনে ভাবলে। হাঁ, নৌকোটা বাজে ছিল, কিন্তু পার তো হয়ে গেলাম। ঠিক সময়ে গিছলাম···ক্রাইলভ হাসলো, হাঁ, এই প্রথম ফসল পেলাম। সেই ফাউণ্টেনপেনধারী ইয়াঙ্কিটা কোথায় গেল ? ওতো বিশ্বাস করতেই চায় নি···দেখতো এবার, কেমন ফসল আমরা ফলিয়েছি ! ও হয়তো এখনো ভাবছে, আমাদের পণ্টুন নেই। কিন্তু কখনো কখনো কাঠ দিয়েও কাজ হয়। ওরা ওকথা বোঝে না ; ওরা তো দু বছর ধরে তৈরীই হচ্ছে। ওদের তৈরী হবার আগে আমরা হয় তো বার্লিনে পৌঁছে যাব।...একজন সাদোফিয়েভকে জানি, কিন্তু সে তো ছোকরা নয়, কোয়ার্টার-মাষ্টার সে ; রাশোস

থেকে যখন আসছিলাম, ও দু জন জার্মানকে নিকেশ করে। সেও বোকা নয়… সাদোফিয়েভ কত আছে! অবাক হবার তো কিছু নেই,…একটা কিন্তু অবাক কাণ্ড—এখন বহু বীর দেখা দিচ্ছে…

সাদোফিয়েভ যাদের পদবী তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, হয়তো আত্মীয়ই হবে…জানিনা…

কস্ত্রোমায়, কাপড়ের কাল আর পুরানো গীর্জার মাঝখানে এক বাড়িতে এক অসুস্থা স্ত্রীলোক তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন; তার প্রথম সন্তানের কথা…সাশার নাম হয়েছে…ও এখন ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরুক!…

সাদা বালির ভিতরে অগভীর খাত—সেই খাত থেকেই শুরু হোল। ওলন্দাজ বাহিনী এসেছে এপারে, জর্মানরা খাড়া পাহাড় থেকে গুলী চালাচ্ছে। আমাদের সেনারা তবু টিঁকে আছে। সার্জির মনে পড়লো স্তালিনগ্রাদের কথা, সেখানেও আমরা বলতাম, টিকে আছি। এখানে তা বলা চলবে না। এখানে আমরা বলছি, আমরা আগলে আছি, রক্ষা করছি।

জার্মানরা বিমান-বহর নিয়ে এল, প্রতিটি নৌকার উপর আক্রমণ শুরু হোল। তৃতীয় দিনে ওরা একটা পণ্টুন-সাঁকো ডুবিয়ে দিলে। পণ্টুনগুলো তখনো অকেজো হয়ে যায় নি, তাই উদ্ধারের ব্যবস্থা হোল। গ্যাস-মুখোস পরে নেমে গেল ওসীপেঙ্কো জলে। নদীগর্ভে তিন ঘণ্টা ধরে চললো কাজ, অকেজো পণ্টুনগুলো আলাদা করে, ভালগুলো তুলে আনা হোল। ওসীপেঙ্কো যখন শুনলে, জেনারেল তার জন্যে লেনিন-সম্মানের সুপারিশ করেছেন, সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, আমার বৌ যদি এ খবর পেত, হয়তো আমাকে ছেড়ে যেত না…

পরে জেনারেল পেত্রিয়াকভ বললেন,

আমাদের বাহিনীও বিরাট, তাই সেতুও চাই তেমনি।

সার্জি উত্তর দিলে, আমি সব তৈরি করে রেখেছি, একটা কাঠের সেতু গেছে দ্বীপ অবধি, তার পরে ভাসমান সেতু…

সে হাসলো।

স্তালিনগ্রাদে সার্জি লড়েছে বটে, তখন ছিল প্রচণ্ড আবেগ; মুখে ভ্রূকুটি; কল্পনার সময় ছিলনা ভাববারও না। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু এখন তার চোখে আলো ঝিকমিক করে ওঠে, এই আলো চেনেন নিনা জর্জিয়েভনা। তিনি তো ওর ছেলেবেলায় ভাবতেন, ও কবি হবে।

ওরা দলে দলে নেমে এল, বরফ-গলা জলে এসে দাঁড়ালো। জার্মানরা কামানের গোলা, আর বোমা ছুঁড়ছে। রাতে শুরু হোল কাজ, কিন্তু জার্মানদের হাউইয়ে নিপার ঝলমল করে উঠলো। মাঝে মাঝে ষ্ট্রেচার-বাহকরা নিয়ে যেতে লাগলো আহতদের। স্রোতে ভেসে যেতে লাগলো কাঠের গাদা। স্যাপাররা নদীর ভিতরে দাড়িয়ে স্তূপ আটকে রাখলো। মানুষের তিন দিন তিন রাত চোখে ঘুম নেই। সার্জি তো জায়গা ছেড়ে একবারও নড়েনি। সার্জেন্ট সিরোকভ ঠায় চৌদ্দ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল জলে। সার্জি তাকে বললে, কি হোল সার্জেন্ট?··· সিরোকভ জবাব দিলে, কাজ ফতে!

সেতু তৈরি, শয়ে শয়ে ট্রাক চলেছে সেতু পার হয়ে। সার্জি হাসছে, কথা কইছে। মেজর শিলেইকো তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

সেতুটার জন্যে আরো কত কাঠ চাই?

পুঁথিপত্রে তো বলে, অনেক।

সার্জির মনে পড়লো সার্জেণ্টের স্বর, কাজ ফতে!

কাঠের হিসেব করা যায়, কিন্তু মানুষ উপাদান নিয়েই তো সমস্যা।

কার কথা বলছ? শিলেইকো জিজ্ঞেস করলেন।

সবার কথাই বলছি। মানুষ কতখানি সইতে পারে, তার কোনো হিসেব নেই।

ডান পারে বেঁধেছে তুমুল যুদ্ধ। সবাই বলছে, ওরেলের যুদ্ধের পর আর এমনটি হয়নি। জেনারেল পেত্রিয়াকভ বারো কিলোমিটার এগিয়ে গেলেন; কিন্তু সামনে জার্মানদের বিরাট সেনাসমাবেশ। জেনারেল বললেন, ওরা সংরক্ষিত বাহিনী এনে ফেলেছে। হাঁ, নিশ্চয়ই তাই!···

গালাগাল দিচ্ছে সবাই! ফ্রিৎসদের তো হয়ে এল, দেখনা কেমন পাগলের মতো লড়ছে···পরিস্থিতি ভয়ংকর—আর পেছু হটা চলবে না। সেনাপতি আরো সৈন্য পাঠাবেন জানিয়েছেন। এবার ঘটলো এক ভয়ংকর কাণ্ড, জার্মানরা বিমান বহর পাঠালো। সেতুর উপর পড়লো বোমা। এখন প্রতিটি মুহূর্ত ভয়াল, উদ্বেগময়···

রাশেভস্কী সব ঘুলিয়ে ফেলছে দেখে সার্জি নিজে লাফিয়ে নামলো জলে, সে দেখিয়ে দিলে কি করতে হবে। এমনি সময় খান বারো ডুবুরী বোমারু স্যাপারদের আক্রমণ করে বসলো। রাশেভস্কী সার্জির পাশেই আছে। স্তালিনগ্রাদে রাশেভস্কী বলেছিল, যদি রাতে মর, তাহলে সে তো দুর্ঘটনাই···এবার সে মরলো সার্জির কোলের উপর। সেতু মেরামত করা হোল, সময় মতো এল ফৌজ।

রাশেভস্কী বিদায় নিয়েছে। ১৯৪২-এর ভয়ংকর গ্রীষ্মে যারা তার সাথী ছিল, তারাও আজ আর নেই। জোনিন হত হয়েছে স্তালিনগ্রাদে।···ও থিয়েটার আর মারিয়ুসার কথা বলতো। টেবিলে ওকে শুইয়ে দেওয়া হোল। ভোরোনভ স্বপ্ন দেখতো ডোন-এর উপরে সেতু গড়ার। যখন আমাদের সেনাদল ফিরবে, ভোরোনভ গড়বে সেই সেতু। এই তো নিপারে এসে গেলাম, কিন্তু কোথায় ভোরনভ? সে তো নেই। ওর মতো বন্ধু বুঝি আর সার্জির হবে না। সে তো সব কথাই ভোরোনভকে খুলে বলতো···সে এক দারুণ গ্রীষ্মকাল···সে বলতো পারীর কথা, ভালিয়ার কথা...ওর কাছে বলা ছিল সহজ···ও একটু হাসত—আর মস্ত মাথাটা দোলাত···কেউ নেই, পুরাণো সাথী কেউ নেই...সার্জি কি করে টিঁকে গেল?...

সে হেমন্তের সমারোহের দিকে তাকিয়ে হাসলো, বিশ্বাস হয় না; হেমন্ত যে এল রঙ নিয়ে, রূপ নিয়ে—তাতো বিশ্বাস হয় না।

এক সপ্তাহ পরে সার্জি গেল প্রধান ছাউনিতে। জেনারেল পেত্রিয়াকভের আস্তানা এক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে। গৃহস্বামিনী জেনারেলের তকমার দিকে তাকিয়ে আছে প্রসংশায় দৃষ্টি মেলে। তার গ্রিৎস্কার জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।

জেনারেলের খোস মেজাজ।

ওদের চেষ্টায় ফল হয় নি। এইমাত্র বারুস্কভ খবর দিলে। কিয়েভ থেকে ওরা চলে আসছে ট্রাকে।

জেনারেল সার্জিকে ভৎর্সনা করলেন,

অতো ঝুঁকি নাও কেন? এ তো ভাল নয়।...এটা একচল্লিশ সাল নয়... তুমি ক্লান্ত—তাই...

সবাই-ই তো ক্লান্ত...

সবার কথা বলছি না, তোমার কথাই হচ্ছে···এমনিই হয়—মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কাজ করতে চায় না, তারপর হঠাৎ সবকিছু তুচ্ছ করে কাজ করে··· একেবারে ভয় পায় না···

সার্জি মাথা নাড়লো :

আমি এখন ভয় পাচ্ছি, কিন্তু স্তালিনগ্রাদে তো পাই নি। সেখানে কোনো কিছুর ধার ধারি নি। এখন যখন শেষ হয়ে এল যুদ্ধ, এখন তো মরতে চাই না···

তার সামনে চশমা পরে একজন প্রৌঢ় বসে সিগারেট টানছেন, সার্জি তাকে দেখতে পেল না। সে দেখলো ভালিয়াকে। মস্কোয়ে এসেছে বসন্ত, সেতুর উপর আলোর মালা। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো ;

পৃথিবীর সবচেয়ে ভঙ্গুর জিনিস এই সেতু···

নিপারের সে সেতুর কথা ভাবছেনা, ভাবছেনা লাইমস্কী সেতুর কথা···ঐ সেতুর উপর বিদায় ক্ষণে দাঁড়িয়েছিল আলিয়া আর সে···না, না শীনের সেই সেতুর কথা নয়— সে তো অতীত···সে ভাবছে জীবনের কথা···

বারো

গ্রাম থেকে দূরে খাড়া পাহাড়ের ঢালে বাড়িখানা। ওক আর এল্ডার গাছে ঘেরা। বিধবা লা গ্রঁাজ জানালায় বসে সেলাই করছিলেন। তার মেয়ে মারী ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। বিধবা লা গ্রঁাজ মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। একজন জার্মান। দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু যদি খুলে না দেন, ও দরজা ভেঙে ফেলবে, নয়তো গুলী ছুঁড়বে। কি জন্যে এসেছে লোকটা? মিকি বা জেদের খোঁজ পেলে নাকি? বিধবা জিজ্ঞেস করলেন,

কি চাও তুমি?

রুটি—একটুকরো রুটি।

নিশ্চয়ই গেষ্টাপোর লোক। যখন মর্তিয়েকে গ্রেফতার করতে আসে তখন বলেছিল, একটু জল খেতে চায়। পুলিসের গাড়ি হয়তো পাহাড়ের নীচে আছে।

বিধবা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এযে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরণে! হয়তো ফেরারী ফৌজই হবে,...তিনি তাকে কিছু রুটি এনে দিলেন। গোগ্রাসে গিলছে। হাঁ, ঠিকই ফেরারী ফৌজ...তাঁর আর ভয় নেই, বরং দুঃখই হচ্ছে ঐ ঢ্যাঙা লোকটার জন্যে। শিশুর মতো ওর হাসি।

একটু সবুর করো, মারী এখুনি গরম সুরুয়া এনে দেবে। আজ ভারি শীত।...

জার্মানটি ধন্যবাদ জানালে। বিধবা ভাবলেন, তাহলে এদের মধ্যেও ভদ্র আছে...কিন্তু ও পালিয়ে এল কেন? যুদ্ধ করে করে হাঁপিয়ে গেছে? না, উপরওয়ালাকে চটিয়েছে? যদি পালিয়েই এসে থাকে, তাহলে তো ভদ্রই বলতে হবে...কিন্তু মারী আগন্তুকের দিকে একবারও তাকাচ্ছেনা। ওর প্রেমিককে গুলী করে মেরেছে জার্মানরা। বনে কতদিন ঘুরেছে লোকটা কে জানে, ওতো এক জোয়ান, কিন্তু কোটটা তো খাটো। শেষে সাহস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন:

পথ হারিয়ে ফেলেছ নাকি ?

সে ঘাড় নাড়লে।

সাঁৎজাঁয় যাবে নাকি, না ওখান থেকেই এলে ?

জার্মান আর ফরাসি মিশিয়ে লোকটা বললে,

খনি থেকে পালিয়ে এসেছি, এবার পাহাড়ে যাচ্ছি।

কোথায় যাবে ?

যেখানে জার্মানরা নেই।

হয়তো একটা জার্মান-সর্দারকে খুন করে পালাচ্ছে ? যদি করে থাকে ভালই··· কিন্তু খনিতে কি করছিল ? ওখানে তো যত গেষ্টাপো···বিধবা কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। কিন্তু লোকটা ভদ্র না পাজি কে বলবে ! ওর মুখেও আর রা নেই··· বাইরে শীত, আর অন্ধকার রাতে কোথায় ও যাবে ? কিন্তু তাই বলে নিজের বাড়িতে তো একটা জার্মানকে তিনি ঠাঁই দিতে পারেন না। হয় তো ও গেষ্টাপোদেরই একজন। লোকটা যেন বিধবার মনের কথার আঁচ পেলে। সে বললে,

আমি তো জার্মান নই।

বাড়িতে ঢুকতে দিলেন, খাবার দিলেন, লোকটা এখন ঠাট্টা শুরু করেছে ! বিধবা চটে গেলেন।

তুমি হয় তো এবার বলে বসবে, তুমি ফরাসী !···

লোকটা হাসলো। তিনি আপন মনে ভাবলেন, হাসি তো বড়ো মিষ্টি !

আমি পালিয়ে এসেছি খনি থেকে। আমি রুশ।

মারী পেছন ফিরে কথা বার্তা শুনছিল, এবার সে চেঁচিয়ে উঠলো,

আমি তখনি ভেবেছিলাম ও রুশ যুদ্ধ-বন্দী !

সে এবার একটা গোল টেবিলের ধারে জাঁকিয়ে বসলো, মারী একখানা মানচিত্র নিয়ে এল। মানচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রগুলি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগানো।

রুশরা নিপার পার হয়ে এসেছে···

সে চোখ বুজলো, মুখে তার হাসি। তারপর ডোনের দিকে দেখিয়ে বললে,

এইখানেই আমি বন্দী হই। বুকে আঘাত পেয়েছি···

একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বল্‌লে,

প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি···

বিধবা আর তাঁর মেয়ে চোখে চোখে তাকালেন, কিন্তু উত্তর নেই। রুশটির জন্যে বিছানা করে দেওয়া হোল। সাদা চাদর আর বালিসের দিকে তাকিয়ে ও যেন ভয় পেয়েছে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল—দু দিন দু রাত ধরে ও ঘুরেছে।

মারী তার মাকে বললে, মিকির সঙ্গে সকালে দেখা করে জিজ্ঞেস করি, ওকে নিয়ে কি করা যায়।

রুশটি ঘুমোচ্ছে, সে স্বপ্ন দেখলো এক বিরাট নদীর—অন্ধকারে নদীর রেখা ম্লান। হঠাৎ একটা সেতু উড়ে গেল—নীল-কালচে ধোঁয়া।···তারপর সব চুপচাপ ; একটা গোল টেবিলের ধারে সে বসেছে, টেবিলে আছেন এক ফরাসী বৃদ্ধা মহিলা, মিশকাকে তিনি কোলে কবে বসে আছেন··মিশকা আমাকে চিনতে পারলে না কেন ?··মিশকা !···

বিধবা লা গ্রাঁজ বললেন, দেখ, ঘুমের মধ্যে কেমন কথা কইছে !

মারী কান পেতে রইলো।

মিশকা—তার মানে কি ?···মা, জানো, রুশদের এমনিই আমি ভেবেছি।··· ওর মুখখানায় মায়া মাখানো, কিন্তু রাশিয়ায় জার্মানদের অবস্থা কেন যে সংঘাতিক হয়ে উঠেছে, তাও ঐ মুখ দেখে বোঝা যায়, অমন লোক দরকার হলে শত্রুর গলা টিপেও মারতে পারে···

মারী ভোর হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো ; নিঃশব্দে সে বেরিয়ে এল, যাতে অতিথি না জেগে ওঠে। শার্সি বন্ধ আছে। রুশটি জেগে উঠে দেখলে, ফ্লানেলের ট্রাউজার আর জার্মান উর্দিপরা একজন যুবক ঘরে ঢুকছে। তার মাথায় আবার ফরাসী সামরিক টুপী। এই-ই মিকি। সে এসেই জিজ্ঞেস করলে,

তুমি কে ?

একজন রুশ।

রুশ?

হাঁ, যুদ্ধ-বন্দী। নিকোলাই ভোরোনভ। ইঞ্জিনিয়ার দলের 'লেফটেনান্ট।

কি করে সে ফ্রান্সে এল, সেই কথাই সে বলতে চাইল। কিন্তু ভাষা যোগালো না।

মিকি বললে, আমার সঙ্গে চল, দেদে জার্মান বোঝে।

অন্য সময় হলে ভোরোনভের কাহিনী হয়তো সবাইকে অবাক করে দিত, কিন্তু এখন তো যত অবাক আর অস্বাভাবিকতার পালা চলেছে। তাই গাই মোকে প্রতিরোধ যোদ্ধার দলে সাড়া পড়লো না। তাদের মধ্যে যে একজন রুশ এসে হাজির হবে, এইটেই যেন স্বাভাবিক। মারী শুধু মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—ডোন থেকে ব্রাইভ কতদূর—কতদূর···!...এর মধ্যে দেদে আসন্ন আক্রমণের পরামর্শ চালাচ্ছে ভোরোনভের সঙ্গে। ব্রাইভ—তুলোঁ রেলপথের উপরের সেতুটা উড়িয়ে দিতে হবে। পরে দেদে তার সাথীদের বললে, ও এক জবর আবিষ্কার! ওতো এর চেয়ে বড় বড় সেতু উড়িয়ে দিয়েছে···

ভোরোনভও সাথীদের সঙ্গে মিলেমিশে গেল। দলের লোকেরা ওর পিঠ চাপড়ে বলে, 'তুমি যে দলে এলে ভালই হোলো। ফ্রিৎসগুলো তো অক্কা পাবে। আমরা তো কমিউনিষ্ট।' ওরা ওর ডাক নাম রাখলে 'ভালুক।' এতে ভোরনভ খুশি। নিনা তো প্রায়ই বলতো, ও যেন এক মস্ত সাদা ভালুক।

কি করে ও বাঁচলো সেইটেই আশ্চর্য! গুলীতো ওর ফুসফুস ফুঁড়ে দিয়ে যায়। তাছাড়া বন্দী-শিবিরে তখন রোজ মরছে স্বাস্থ্যবান যুবকের দল! হাঁ, তার ঐ মজবুত কাঠামোটাই তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। পরে যখন সবাই জিজ্ঞেস করেছে, কি করে ও টিকে রইল, ও বিব্রত হয়েই গেছে। মনে পড়েছে ওর দাদুর কথা, তিনি সত্তর বছর বয়সেও গাছ কাটতেন। তিনি বলতেন, আমরা আর্চএঞ্জেল এলাকার মানুষ, আমাদের শরীর একেবারে শয়তানের তাকদ দিয়ে তৈরী···সত্যি, সত্যি! ওরা বন্দীশিবিরে পিপাসায় সেদিন পড়ে

পড়ে ধুকছিল, কয়েকজন জার্মান এক বালতি জল নিয়ে এসে হেসে বললে, বালতির কাছে যে আসতে পারবে সে-ই পুরস্কার পাবে। ভোরোনভের পিপাসা বেশি, সে এগিয়ে গেল বালতির কাছে। জার্মানরা এরই মধ্যে তার সাথীদের চার জনকে গুলী করে তখন মেরে ফেলেছে···তারপর কোলোনের স্মৃতি। গাড়ি-ভর্তি মৃতদেহ ; প্রতিদিন ওরা খাদের ভিতরে ফেলছে—কখনো কখনো গুণতিতে একশোটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জ্যান্তদেরও এনে ফেলছে—যারা পঙ্গু, অক্ষম—তাদেরও কবর দিচ্ছে খাদে। মিশা গোলোভলিয়ভ তো এই নিয়ে এক কবিতাই লিখে ফেললে !

যখন কোলোনের অন্ধকূপে ছিলাম আমরা,
ওরা আমাদের চেয়েছে রুটির লোভ দেখাতে, ওরা তখন জানে আমরা ধুঁকছি,
আমাদের ওরা চেয়েছে বিশ্বাসঘাতকরূপে, তারই চেষ্টা চলেছে প্রচণ্ড।
পার্টির লোকরা বলেছেন, চুপ করে বসে থাক। বসে থাক !
আমাদের কবরের ফলকের লেখা পড়,
অমরতার গৌরবের দাবী জানাও !
আর যদি পঙ্গুরা না-ই পারে টিঁকতে
পার্টি তো তাদের মৃত্যুর সোজা সড়কে বলছে চলতে।

মিশা ঝঞ্ঝা বাহিনীর লোকটাকে বলেছিল, শীগ্‌গিরই তোমাদের ফাঁসি লটকাবো। লোকটা ওকে গুলী করে। ভরোনভের মনে আছে সে কবিতা—মিশা আর সইতে পারছিল না।···

ভোরোনভ এই সেদিনও ছিল খনিতে বন্দী। সে যেন এক ভয়ংকর স্বপ্ন, জাগরণের পরেও বুকে জগদ্দল ভার চেপে থাকে। কিন্তু সে-স্বপ্নও এখন অস্পষ্ট হয়ে আসছে, মন্ আর চায়না। তবু মনে পড়ে গ্রীষ্মে সেই প্রান্তরের ছবি, সেই বিষণ্ণ সুলিয়াপভ। আবার আর—একদিন আসে ভিড় করে—তার পলায়নের দিন। লালচুলওলা এক জার্মান প্রহরী। ভোরোনভ পাথর ছুঁড়ে মারলো··· তারপর বন, বিধবা লা গ্রাঁজের কুটির···

জীবন সে ফিরে পেয়েছে। সে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে, ওখানে কি হচ্ছে। বহুদিন সে খবরের কাগজ পড়েনি, শোনেনি, শুধু শুনেছিল, লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভেঙে গেছে, কিন্তু এখনো শহরের উপর পড়ছে জার্মান কামানের গোলা। নিনা কি বেঁচে আছে?···আমরা স্মোলেনস্ক দখল করেছি, লড়াই এখন কিয়েভ-এর দিকে। কখনো বা কামনা এসে তার মন ছেয়ে ফেলে। সে কতদূরে, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। বসে ভাবে। দেদে এসে খবর দেয়, রুশরা আর একটা শহর দখল করেছে,কিন্তু নামটা তো ভুলে গেছি···ভোরোনভ শহরের নামটা জানার জন্য অধীর হয়ে ওঠে, আবার দেদের মুখের দিকে তাকিয়েও হাসে: আমি একা নই, এরাও আছে আমাদের সঙ্গে—তার মানে কিয়েভ-এর যুদ্ধে আমিও লড়ছি। হাঁ, সার্জি, জোনিন, আমাদের দলের আর সবার মতোই লড়ছি···

এই সংগ্রামীদলে স্থানীয় মানুষ যেমন, তেমনি আছে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। এরা কেউ কারখানা আর খনির মজুর, কেউবা আঙুর ক্ষেতের চাষী, মেষপালক, বা স্কুলমাষ্টার; একজন আছে পশু-চিকিৎসক। দু'জন স্পেনবাসী, একজন চেক আর কটি মেয়েও আছে। দেদে দলের অধ্যক্ষ। সে গ্রামের ইস্কুলমাষ্টার—স্পেনে লড়েছে। ভোরোনভের কথা ওরা রুদ্ধ নিশ্বাসে শোনে—ওরা বিপদ-সঙ্কুল রাতে যে দেশের স্বপ্ন দেখে, ও সেই দেশের মানুষ। 'ভালুক বছেল', কথাটা যেন শেষে রায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এর উপরে আর আপীল নেই।

চেককে ওরা ডাকে চেক বলে। প্রৌঢ় মানুষটি, ঘড়ী তৈরি করতে খুব পটু; একটা সূক্ষ্ম কলকব্জার অসঙ্গতিও তার চোখ এড়াত না, কিন্তু সে-ই কিনা একটা সার্জেণ্টের মাথা উড়িয়ে দিলে! ভোরোনভকে প্রথম দেখে ওতো এতো উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে, ওর মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

রুশ ভাষা বোঝ? ভোরোনভ শুধালো।

এবার চেকটি কথা শুরু করলে, সে কথার তোড় আর থামে না। ছ'বছরের ভিতরে এই প্রথম সে নিজের ভাষায় কথা কইলে। ভোরোনভ না বঝলেও

আঁচ করে নিলে, সে কি বলছে।

সে মাঝে মাঝে বলতে লাগলো...হাঁ, হাঁ...নিশ্চয়ই !

ফরাসীরা দৃশ্যটি দেখে তো অবাক। দেদে বললে,

তুমি রুশ ভাষা বোঝ? তুমি না চেক?

আমরা শ্লাভ, আমরা সবাই রুশ ভাষা বুঝি।

সে বলতে চাইল, এটা ব্যাকরণের কথা নয়, এর পিছনে আছে একই ঐতিহ্য। কিন্তু সে শুধু হাসলো, চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে নিলে।

বার্সেলোনার জোসে বললে,

এব্রোর পারে এক রুশের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তার নাম ইভানোভিচ্। সে কি এখন পল্টন না একটা গোটা বাহিনীরই অধ্যক্ষ?

আমি চিনি না।

জোসে ম্লান হয়ে গেল; ভোরোনভ হেসে বললে,

তাইত···এবার মনে পড়ছে···তিনি এখন একটা বাহিনীরই অধ্যক্ষ।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। ভালুক, তুমি জান? যখন শুনলাম ফ্যাসিষ্টরা রাশিয়ায় হানা দিয়েছে, তখন যেমন দুঃখ হোল, তেমনি খুশিও হলাম। জানি তো যুদ্ধে কি দুর্দশা হয়। আমার মেয়ে বার্সেলোনায় বোমায় মারা যায়। কিন্তু এব্রোর পারে ঐ রুশটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলেই ভরসা পেলাম। তখন জানি, এবার ফ্যাসিষ্টদের হয়ে এসেছে···

মিকি ভোরোনভকে তার যখন কাজ থাকেনা, তখন রুশ ভাষা শেখাতে বললে। রেনালের কারখানার সে মজুর—যুব-কমিউনিষ্ট সংঘের সে সভ্য। রুশ ভাষা সে মুখস্থ করতে শুরু করে দিলে,

দেখ তো, 'ষ্টল' না হয়ে স্তোলা হোল কেন? এ এক অদ্ভুত ভাষা বাবু।··· কিন্তু শিখবই ঠিক। যখন যুদ্ধ শেষ হবে, বেঁচে থাকলে একবার রাশিয়া যাবই। এক হপ্তার জন্যে হলেও যাব···কি বল তোমরা—যা স্তলম (টেবিলে)? না, এ ভাষা রপ্ত করা যাবে না···কিন্তু মস্কো কি একবার দেখা হবে না?

বুড়ো দিসিরে, আঙুর-ক্ষেতের চাষী। তার জীবনে দুটো জিনিস সে চেনে! এক কমিউনিষ্ট পার্টি, আর এক ভাল মদ। যুদ্ধের আগে সে রেডিক্যালদের ভোট দিত; কিন্তু জার্মানরা আসতেই তাদের শহরের রেডিক্যাল মেয়র মশাই পেতাঁর ছবি ঝুলিয়ে দিলেন, আর জার্মান লেফটেনাণ্টকে চুরানো মদ খাইয়ে খুশিও করে দিলেন। এতেই বুড়ো চটে গেল। পরে কমিউনিষ্টরা দু'জন জার্মান আর ঐ বিশ্বাসঘাতকটাকে গুলী করে মারলো। কবি যেমন কবিতা ভালবাসে, সে তেমনি মদ। মদ সে চেখে বলে দিতে পারে কোনটা কি রকম, কোথাকার কোন মদ তাও ভুল না করেই বলে। 'মিচাদ-এর কবরখানার কাছের জমির আঙুরে চোলাই তো; না বিলেয় বাবার জমির—ঐ যে ময়দার কলের পাশের জমিটা!' এমনি নির্ভুল তার বিচার। তাই দুই কামনায় যখন সংঘাত বাঁধলো, তখন সে আর দ্বিরুক্তি না করে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের দলে যোগ দিলে। সে বলে, 'উনিশ শো বেয়াল্লিশ সাল তো এক ভয়ানক বছর। সেবারে মিচাদ আর জোসেফকে জার্মানরা গুলী করে মারে। কিন্তু সেবার যা ফসল ফললো কি আর বলব!'… আঙুরের খন্দের মাস খানেক আগেই সে প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের দলে যোগ দেয়। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর বলেঃ এবারও ফসল ভালই ফলেছে। আমার আঙুর ক্ষেতের কি দশা হয়ে আছে কে জানে! জার্মানগুলো বোধ হয় মাড়িয়ে পিষে কিছু রাখে নি।

একদিন বুড়ো ভোরোনভকে জিজ্ঞেস করলে,

মস্কোর মদ কি আমাদের চেয়ে ভাল?

ককেশাসে ভাল মদ তৈরি হয়, কিন্তু মস্কোর কাছে তো কোনো আঙুর বাগিচা নেই। ওখানকার আবহাওয়ায় আঙুর হয় না…

বুড়ো কেমন ঘাবড়ে গেলঃ সে বোঝেনা, মদ ছাড়া কি করে মানুষ জীবন উপভোগ করে, এক মুহূর্ত ভেবে সে ভালুকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে,

ভেবোনা ভালুক, যখন এই লড়াইটা থামবে, তোমরা আবার দু-একটা পাঁচসালা পরিকল্পনা করে নিও, তাহলেই মস্কোর কাছে আঙুর ফলবে, আমাদের

চেয়েও তোমাদের মদ তখন সরেশ হবে···

ভোরোনভ বুঝতে পারলে, ওর দেশের উপর ওদের কি বিশ্বাস। গর্বে তার বুক ভরে গেল, একটু বা বিব্রতই হোল। ওরা আমাকে সোবিয়েতের প্রতিনিধি ভাবছে, অথচ আমি তো সাধারণ মানুষ। আমি ভুল করতেও তো পারি···

কিন্তু ভুল সে করলো না—না সেতু ওড়ানোয়, না জার্মান ট্রেণ আক্রমণে, সে আর দেদে আগেই তোড়জোড় করে রাখলে। তিরিশ জন প্রতিরোধ যোদ্ধা জার্মান টমিগান নিয়ে রেল পথের বাঁধের পাশে লুকিয়ে রইলো। ভোরোনভ পাতলে মাইন। পনেরো জন যোদ্ধাকে সে লুকিয়ে রাখলে টিলার উপরের জঙ্গলে, দেদে তাদের নেতা। যদি তারা ব্যর্থ হয়, এরা পালাবার সুযোগ করে দেবে। যখন বিস্ফোরণ হয়, জার্মানরা ঘুমিয়ে ছিল, প্রথমে তো ওরা বুঝতেই পারলে না কি ঘটেছে। ভোরোনভ বাঁধের উপর টমিগান হাতে ছুটে এল, দলের এইটিই সব চেয়ে বড় কাজ। শ'খানেক টমিগান আর বহু গোলাবারুদ ওরা পেল। একজন জার্মান লেফটেনাণ্টও বন্দী হোল। সে তখন এমন ঘাবড়ে গেছে, খালি বলছে, দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না। আমি দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষ। প্রতিরোধ যোদ্ধারা দু'জন সাথীকে হারালো—তারা রোবার্ত আর বুড়ো দিসেরো। রোবার্ত সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, বুড়োকে বনে আনা হোলো, জাঁনেৎ তার ক্ষত বেঁধে দিলে। ভারি যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। ভোরোনভ যখন তার কাছে এল, সে হাসলে

আমি তো চললাম।···

না, তুমি সেরে উঠবে। দেখনা আমি কেমন···

না, না, ভালুক, কিন্তু ওকথা নিয়ে ভাবছে কে! আমারও দিন ছিল, এখন ফুরিয়ে গেল। শুধু একটা কথা বলি, লড়াইয়ের পর নিশ্চয়ই স্তালিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তাকে বোলো, বুড়ো তার আঙুর ক্ষেত ফেলে লড়তে এসেছিল, সে মারা গেছে। মারা যাবার সময় স্তালিনকে জানাচ্ছে সেলাম। হাঁ, বোলো, বুড়ো দিসেরো তাঁকে সেলাম জানাচ্ছে···যে

দিসেরো রাতে মারা গেল, সেই রাতেই আশেপাশের গ্রাম থেকে এল আঠারো জন চাষী। তারা এসেই বললে, আর তো আমাদের দেরী সইছে না··· এল হেমন্তের বৃষ্টি, বহুক্ষণ রইল, বনে মৃত্যুর গন্ধ। ভোরোনভ রেডিওতে মস্কৌ ধরতে চেষ্টা করলো। মিকি গাইছে গুণ গুণ করে :

আজাদী তো আসবেনা দাস হিসেবে
আজাদীর জন্য হবে লড়তে।
সাথী, সাথী, জোরে ফুঁ দাও ভেঁপুতে !
যুদ্ধের সময় তো এল,
আমরা তো মরবো
ভোরের আগেই।
তাইত আমরা প্রতিরোধ যোদ্ধা···
আমরা সামনের জঙ্গীদল···
দুঃখ তো আমাদের বুড়িয়ে দেবেনা
ভালবাসার জন্যে আমরা কাতর নই···
জোরে বাজাও ভেঁপু, সাথীরা
যুদ্ধের সময় তো এল···

তের

রেলের কামরার মোটাসোটা সহযাত্রীটি যখন উঠে পড়ে কোটটা তুলে নিয়ে কপালের ঘাম মুছলে, মাদো ভয়ই পেল। এত গরম পড়েছে নাকি ! কই, তার তো ঠাণ্ডাই লাগছে ; শীতে সে ঠকঠক করে কাঁপছে। সাঁত-রেমি থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি ভিজে রাতে সে ফিরেছে, তাই সর্দি লেগেছে। এখন অসুখ

হয়ে বিছানা নিলেই হয়েছে আর কি!·· তার জরুরী কাজ আছে, প্রতিরোধ-যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে বলতে হবে যে বি, ও, এ-র কাছে মেসিনগানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শহর থেকে পাহাড়। পাহাড় থেকে শহরে ঘুরে ঘুরেই কাটছে তার দিন। শহরের এক ছোট্ট হোটেলে উঠে মালিককে সে হয়তো বলে, অসুস্থ মাসীকে সে দেখতে এসেছে ; চাষী বৌকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় এক বস্তা আলু কেনা যাবে। এক উকিলের সঙ্গে বানানো এক উত্তরাধিকারের কথা নিয়েও আলোচনা করে। তার পরে খাড়া, সরু পথ বেয়ে, শীতের রাতে, গ্রীষ্মের গরমে, প্রবল বর্ষায় হয় তো বার কোনো খামার বাড়িতে বা মেষপালকের কুঁড়ে ঘরে। নিজের কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নিয়ে, এক গেলাস জল খেয়ে আবার পথ চলে। অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা, শত্রু আর সাথীদের সঙ্গে ঘোরা ফেরা, রেল ষ্টেশনের ভয়ার্ত কোলাহল, পাহাড়ি পথ, ঠিকানা, চিহ্ন কাগজের উপর ছক কাটা, আনন্দের ভান, আবার কখনো বা কাজের ভান, আর আছে সর্বদাই বিপদের ভয়—এই সবই যেন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তার কাছে। আর যেন জীবনে কিছুই নেই, কিছু ঘটবারও সম্ভাবনা নেই। অতীতের কথা সে একরকম ভাবেই না, ভবিষ্যতের কথা তো কখনো না। কোনো সাথী যখন বলে, 'জয়ের পরে···' সে তো অবাকই বনে যায়। তুচ্ছ উদ্‌বেগ নিয়েই তার দিনগুলি ভরে আছে—কি করে একটা পুলিসকে এড়িয়ে চলবে, কি করে সামনের ফাঁড়িটা পার হবে। যখন একা থাকে —তখন পথে দূতের প্রতীক্ষায় কেটে যায়, অথবা ধূলোভরা রেলগাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবে, যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ, তাদের কথা। ওরাও তারই মতো জীবন কাটাচ্ছে···হাতিয়ার আমদানী করছে, ট্রেণ ওড়াচ্ছে, আড়ালে লুকিয়ে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বনে, ইশতেহার ছাপাচ্ছে, কারখানায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে রিভলভার বা হাতবোমা নিয়ে। প্রতিদিনই সে শুনছে কারোনা কারো মৃত্যুর কথা। হয় তো সপ্তাহখানেক কি ছ'মাস আগে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেউ বা লড়াই করে মরেছে, কেউ বা গেষ্টাপোদের হাতে

ধরা পড়েছে, বা পুলিসের হাতে। মাদো জানে তারা কি করেছে, কিন্তু সেতো জানে না, তাদের আগেকার জীবনের কথা, তাদের কি ছিল কামনা, কি ছিল তাদের প্রিয়। মনে পড়ছে মুখের সার, কথা, তুচ্ছ কথা—মেয়েরাই শুধু তা মনে রাখতে পারে—একখানা রুমাল, একটা ভুল কথা, দেয়ালের একখানা ছবি। এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সে মানুষের জীবনের ছবি আঁকে। মানুষের সহযোগিতা, তাদের ভালবাসা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সে তো আর নিঃসঙ্গ নয়—তাদের স্মৃতি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, তার বুকে বুঝি গভীর ছাপ পড়ে গেছে।

এখন, এই মুহূর্তে সে ভাবছে মরিসের কথা। দুবার শুধু দেখা। সবাই বলেছে, লোকটা খ্যাপা, কিন্তু মাদোর কাছে সে স্বপ্নবিলাসী, ভাবুক। একটা কাজের কথাই মরিসের সঙ্গে হয় সেদিন। সে জানালার দিকে তাকিয়ে ছিল, সূর্যাস্তের শেষ সোনার রঙে ঝলমলে জানালা। হঠাৎ মরিস বললে, যেন আগুন লেগেছে বলে মনে হয়···মাদো লক্ষ্য করলে, ওর কলারের বোতাম নেই ; ও যেন বুঝতে পেরে বললে, কি করবো বল আমার কাছে তো ছুঁচ নেই···লুসি তাকে বলেছিল, যুদ্ধের আগে শিল্পের ইতিহাস নিয়ে পড়া শুনো করত মরিস, এখন তার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বছর। কি করে এই জীবন সে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ?

মাদো কোনের লোকটির দিকে তাকালো। মোটা-সোটা লোকটি উল্‌টো দিকে বসে আছে। ঘুমোচ্ছে। লাক্‌-এর মতো দেখতে···লাক্ এখন কোথায় ? জোসেৎ বলে, সেপ্টেম্বরের গোড়া থেকেই খবর নেই। জোসেৎও আর পারছেনা। পল মারা যাবার পর থেকে ওকে আর চেনাই যায় না···কিন্তু তবু পারতে হবে, এক মুহূর্ত থেমে পড়লে চলবে না···কাল রাতে যখন হেঁটে আসছিলাম, বেশ লাগছিল। আজ বসে আছি কিনা তাই যত কথা ভিড় করে এল···উঃ মাথাটা কি কন্‌কন্ করছে···

গাড়ির বারান্দায় কে যেন গান গাইছে : গান গেয়ো না সখি, গান ছাড়াও

তো বুঝি তোমার মন……সেদিন রাতে সার্জি তার মার কথা আমাকে বলেছিল। তখনি বুঝেছিলাম, ও চলে যাবে, ও আমাকে সঙ্গে নেবে না…কিন্তু এত শীত করছে কেন? হয়তো অসুখই করবে…এখন অসুখ করলে তো হয়েছে। গাড়ি লিমোজেস-এ পৌঁছবে সওয়া-এগারোটায়। আরো তিন ঘণ্টা আছে…ওখানে পৌঁছে লুসির বাড়িতে যেতে হবে। ঠিকানাটা মনে আছে…কিন্তু লুসি যদি বাড়ি না থাকে? বাজে কথা, ওর ওখানে যে রাত কাটাব, সে তো ঠিক করাই আছে। আর কাল মরিসের সঙ্গে প্লস জার্দায় দেখা হবে তাও ঠিক, ওরা একেবারে পার্কে দেখা করার কথা বললে কেন? এটা তো ঠিক হয়নি, তাও আবার ভোরে। সন্ধ্যায় হলে বরং প্রেমিক-প্রেমিকা বলে লোকে মনে করতো…কিন্তু কি শীত করছে…!

মাদো কোর্টের কলারটা তুলে দিলে। সে লক্ষ্য করলে, তার পাশের লোকটি তাকে দেখছে। ঢ্যাঙা, প্রায় চল্লিশ বছরই বয়েস হবে, সরু গোঁফ, চোখে অলস দৃষ্টি। পরিচিত মুখ…আগে কোথায় দেখেছি? না, ও এক চিত্রাভিনেতার মতো দেখতে : ছবির উপসংহার যখন বিয়োগান্ত হয়, তখন ওদের মুখে অমনি ভাব ফুটে ওঠে…কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন, হয়তো আমি শীতে কাঁপছি বলেই চেয়ে আছে? না, মনটা একটু অস্থির হয়ে উঠেছে…সে তাড়াতাড়ি একটা গল্প ভেবে নিলে : যাচ্ছি আমার বোনের কাছে, সে থাকে রুয়ে রাসিন-এ। এক পোষাকের দোকান আছে তার।…লোকটা বোধহয় গোয়েন্দা? কিন্তু গোয়েন্দার মতো তো দেখায় না…কিন্তু গোয়েন্দাও আজকাল হরেক রকমের…আর-এক কামরায় গিয়ে যে উঠবে তারও জো নেই। ও যদি গোয়েন্দাই হয়, এখুনি পুলিস ডাকবে। হয় তো ভাববে, আমি কাউকে খুন করে পালাচ্ছি…ওকে বলব, আমার অসুখ করেছে। না, কথা বলতে তো পারব না। সত্যিই আমি অসুস্থ, ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে…হয় তো বা আমাকে দেখে একটু মুগ্ধই হয়েছে, যাত্রার সঙ্গিনী হিসেবেই আমার সঙ্গ চাইছে… আড়ালে থেকে তো এই হয়েছে, বেরুলেই মনে হয়, দুনিয়ার চোখ আমার

দিকে। কিন্তু ওরা আমাদের তোয়াক্কাই রাখে না, ওরা টাকা…রোজগার করে, ভালবাসে, অসুখে পড়ে—এক উষ্ণ শয্যা, রাম মদ-মেশানো চা আর বিশ্রাম—এই ওদের কাম্য…উঃ মাথা যে ছিঁড়ে পড়ছে…ঘুমোবার চেষ্টা করে দেখি…

মাদো চোখ বুজলো, ঝিমুচ্ছে সে। স্বপ্ন দেখছে…সে গ্রেফতার হোল, তাকে জেরা শুরু করলো। উত্তর তার অসংলগ্ন। জার্মানটি হেসে বললে, কি বাজে বকছ…গরম লাগছে তার, কপালে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফোঁটার ঘাম, মুখের কোনে ফেনা।

অসুখ করেছে নাকি আপনার? সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন: তার স্বরে সহানুভূতি।

সে মাথা নাড়লো,

আমার কাছে য়্যাসপিরিন আছে। এখুনি এক গেলাস জল নিয়ে আসছি।

য়্যাসপিরিন খাওয়া হয়ে গেলে, লোকটি বললে,

পারী যাচ্ছেন তো?

না, লিমোজেস-এ যাচ্ছি।

আমিও ওখানে যাচ্ছি। আজ দেরীতে গাড়ি পৌঁছবে, এক ঘণ্টা আগেই তো পৌঁছবার সময় ছিল। ষ্টেশনে আপনার জন্যে কেউ আসবে?

না। আমার বোনকে আমি অবাক করে দিতে চাই।

আমাকে যদি অনুমতি দেন, আমি আপনাকে আপনার বোনের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি।…

ধন্যবাদ, আমি একাই যেতে পারব, আমার একটা ছোট্ট থলে মাত্র সঙ্গে… একহপ্তা ওখানে থাকবো।…

তার জবাবে যেমন সংযম, তেমনি ভদ্রতা ফুটে উঠেছে। তবু যেন কেমন হকচকিয়ে গেছে বলেই নিজের মনে হোল, সে যেন নিজেকে প্রকাশ করে ফেলছে, য়্যাস্পিরিন খেয়ে পাচ্ছে ঘুম। ঝিমোতে ঝিমোতে মনে হোল, সঙ্গীটি তার দিকে তাকিয়েই আছে। হয়তো আমাকে ওর খুবই মনে ধরেছে। শুধু

এই ভাবনা—আর কিছু সে ভাবতেও এখন অক্ষম। ঘুমে ঢলে পড়লো মাদো। এমন গভীর সে ঘুম যে সঙ্গীটি অনেক কষ্ট করে তাকে জাগালে।

আর দশ মিনিটের ভিতরেই আমরা লিমোজেস-এ পৌঁছে যাব!

তাড়াতাড়ি হাতব্যাগ থেকে মাদো একখানা আরসী বার করে চুলটা ঠিক করে নিলে, মুখখানায় বোলালে একটু পাউডার। মনে হচ্ছে যেন চাঙা হয়ে উঠেছে, কিন্তু দাঁড়াতে গিয়ে হাঁটু কেঁপে উঠলো। গাড়ি থেকে নামতেই আবার এল কাঁপুনি। বৃষ্টি ঝরছে, লুসির কাছে আমাকে গিয়ে পৌঁছতে হবে।···রুয়ে থিয়োডোর সড়ক্ দিয়ে সে ছুটে চললো। প্লাস সাদি কার্নোতে পৌঁছে পিছন ফিরে দেখলে তার সঙ্গীটি এখনো পিছনে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা গোয়েন্দা।···রুয়ে গ্রাঁজ গারোর দিকে না গিয়ে সে বাঁয়ে বেঁকলো। পেছনে ফিরে তাকাবারও আর সাহস নেই। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি কেউ তাকে ধরে ফেললো। জ্বরের ঘোর এখনো কাটেনি, মাদোর মনে ভাবনা: কি করবো? লুসির ওখানে আর যাওয়া চলবে না, হয় তো ঐ গোয়েন্দাটা তার পেছুই নিয়েছে...সে একবার থামলো। না, কেউ তো নেই!···কিন্তু লুকিয়ে তো থাকতে পারে।···বৃষ্টি, চোখে কিছু দেখা যায় না···কয়েকটা পথ পার হয়ে সে চলেছে। এক বুড়ো চলেছে তার পিছনে। গোয়েন্দাটা হয়তো আর কারো হাতে আমার ভার দিয়ে সরে পড়েছে।...কিন্তু আর তো পারি না। সারারাত ধরে যদি এমনি ঘুরতে হয়, তাহলে ভোরবেলার আগেই মরে যাব···এর চেয়ে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠা ভাল। যদি ওরা পিছন নিয়েও থাকে, শুধু আমাকেই গ্রেফতার করবে। মগজে তো কিছু নেই, ফাঁপা লাগছে। ভাবতেও পারছি না। আমি কে, কোথা থেকে এলাম—সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমচোখে একজন পরিচারক দরজা খুলে দিলে। যখন সে হোটেলের ফর্মে সই করছিল, লোকটা বিড়বিড় করে কি বললে। আমার তো মনে হয়, ও সন্দেহ করেছে...এক বছর ধরে তো এই কাজই করছি, কিন্তু এমন তো কখনো মনে হয় নি।···আমার জ্বর হয়েছে, তাই বুঝি এমনি ভয় এসে জুড়ে বসেছে।···

একটা নোংরা ঘরে তাকে নিয়ে এল পরিচারক। উঁচু খাটে বিছানাপাতা। দেয়ালের কাগজে ছারপোকা পিষে ফেলার চিহ্ন, সাবানের ফেনা শুকিয়ে আছে, মাদো তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। বিছানাটা ভারি ঠাণ্ডা, লেপের নিচেও গরম লাগছে না। পাশের ঘরে বাসা নিয়েছে এক দম্পতি, মেয়েলি গলা শোনা যাচ্ছে। বার বার বলছে—দুষ্টু কোথাকার! আবার পুরুষের গলা: এস, এস গো, কাছে এস! না, ওরা ঘুমুতে দেবে না।···ওরা আসার আগে যদি ঘণ্টাখানেকও ঘুমিয়ে নিতে পারতাম···হঠাৎ সে উঠে বসলো। হাতব্যাগ থেকে সব কিছু উপুড় করে দিলে বিছানার উপর। কাগজপত্র, লিপষ্টিক, টাকাকড়ি, প্রসাধনের সরঞ্জাম, সে জানে আর কিছু নেই। তবু একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হোলো। নিচে ঘণ্টা বাজছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ওরা আমাকে গ্রেফ্‌তার করতেই আসছে···না, একটা দরজা খোলার শব্দ। এখন দুটো বাজে। ওরা আসে চারটের সময়, ঐ ওদের নিয়ম।···উঃ কি গরম! ঘামে যে ভিজে গেলাম। আর মাথাটা!···উঃ মনে হয় কে যেন মাথায় হাতুড়ি মারছে।··· লেপ গা থেকে ছুঁড়ে একপাশে ফেলে দিল। একটু যেন ভালই লাগছে। বিছানায় আবার এলিয়ে পড়েছে। নড়বারও তার সাহস নেই। কে যেন মাথার উপরে রাখলো বরফের ব্যাগটা···মা-মা এসেছেন!···

সার্জি, এখন তো বুঝতে পারছ?···আমি বেহদ্দ বোকা মেয়ে হতে পারি, কিন্তু বাজে মেয়ে নই। সবুর করনা বাপু। আমাকে তো কথা কইতেই দিচ্ছ না। তোমাকে ভালবাসি বলেই বুঝি এমনি হোল—আমাকে কথা কইতেই দেবে না! নিজের ভাবনায়ই বিভোর, আর কিছু তোমার নজরেই পড়ছে না। এই তো মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ কোঁচকাচ্ছ···না, প্রিয়তম! ও আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। যাবে কি গেছে···কিন্তু তবু তো জীবনে একটিবার দেখা হোলো···

আটটার সময় মাদোর ঘুম ভাঙলো, একটু ভাল লাগছে, মাথাধরা আর নেই। শুধু শরীরে কোথায় যেন একটা ভোঁতা ব্যথা অবিরাম জলছে···ভাবনাও এখন আর অসংলগ্ন নয়। দুর্বল লাগছে শরীর।···কাল রাতে বোধহয় খুব জর

উঠেছিল···লোকটাকে গোয়েন্দা ভেবেছিলাম। ও তো তা নয়। লোকটা চলেছিল বাড়ির দিকে ষ্টেশন থেকে। একটাই তো পথ শহরের মাঝখানে এসে পৌঁছেছে···ও তাই পেছু পেছু আসছিল। বৃষ্টি চেপে এল দেখে পা চালিয়েও দিয়েছিল।···

মাদো আস্তে আস্তে পোশাক পরলো—মরিস আসবে দশটার সময়। নির্জন পথে ঘণ্টাখানেক ধরে ঘুরে বেড়ালো। কেউ তার পিছু নিয়েছে কি না বার বার দেখে নিলে। না, কেউ না, এ কল্পনা, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হোলো, পা আর বইছে না। মরিস এখুনি হয়তো বলে বসবে, তুমি কালই ফিরে যাবে···

একটা ফুলের দোকানের সামনে এসে সে থামলো। দরজা খোলা, মোটা-সোটা ফুলওয়ালীটি সুরুয়া খাচ্ছে, আর চীনে মাটির পাত্রটার গায়ে গরমের আমেজটুকু আঙুল দিয়ে উপভোগ করছে। একটা ধাতুর পাত্রে কয়েকটা বিবর্ণ ভায়োলেট আর মরচে-রঙের য়্যাষ্টার। কোন সন্তের দিন আজ, তা লেখা আছে একখানা শ্লেটে-কাকে আজ ফুল পাঠানো নিয়ম তাও লেখা আছে। শ্লেটখানার দিকে মাদো তাকাল—মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে। আজকে আত্মার স্মৃতি দিবস। ফুল পাঠাতে হবে কবরখানায়···কালো কোটপরা একজন লোক এসে ভিতরে ঢুকলো। ফুলের টবগুলি সে দেখলে, ফুলের উপর হাত বুলিয়ে নিলে।

এগুলো তাজা নয়।

মশাই, যা দিনকাল, যা পাচ্ছেন তাই-ই নিতে হবে, যা চান তা পাবেন না।

আর একজন কে বললে,

মরার ফুল আবার তাজা আর বাসি কি! একটা দিলেই হোলো।

মাদো ফিরে তাকালো, কেউ তো নেই।

দশটা। সারা পার্কটা সে চক্র দিলে, বেঞ্চিগুলো ভেজা, লাল বালির ভিতরে ঘোলা জলের খোঁদল। একজন মহিলা, এক বুড়ি, একটা পাজি ছেলে, কিন্তু মরিস নেই। সওয়া দশটা পর্যন্ত এমনি কেটে গেল। লুসি বলেছিল, মরিস খুবই সময়নিষ্ঠ মানুষ। পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল···সাড়ে দশটা পর্যন্ত দেখব, যদিও

না আসে, ছ'টার সময়ে লুসির ওখানে যাব। লুসি তো ছটায় বাড়ি ফেরে···

মাদো পার্কের দরজার কাছে এল, এবার দেখা গেল এক সাথীকে। খবরের কাগজ বিলি করবার সময় একেই সে লুসির সঙ্গে দেখেছিল। ওর নাম জাকেৎ, লুসি তাকে বলেছিল, আগষ্ট মাসের শেষে ও আবার দলে ফিরে এসেছে, এতদিন দল ছাড়া হয়েছিল। কেন যেন মাদোর তাকে ভাল লাগে নি। কিন্তু পরে সে এরই জন্যে নিজেকে ভৎর্সনা করেছে: ঠিক বাবার মতো করছি, চেহারা দেখে লোকের বিচার করছি···জাকেৎ-এর পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল। মরিসের সঙ্গে তার দেখা করার কথা। হয়তো জাকেৎ হঠাৎ এখানে এসে গেছে। পথে সাথীদের সঙ্গে কথা কওয়া রীতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু জাকেৎ তাকে দেখে এগিয়ে এল।

ফ্রান্স, কেমন আছ?

তুমি কেমন জাকেৎ? আমার সঙ্গে কি কোনো কাজ আছে?

মরিসের বদলে আমি এসেছি।

মরিস কোথায়?

জবাব না দিয়ে জাকেৎ সরে দাঁড়ালো এক পাশে, কি হলো বোঝবার আগেই, ক'জন পুলিশ এসে তাকে চেপে ধরে জেলের গাড়িতে নিয়ে পুরলো।

এক অফিস ঘরে ওরা ওকে নিয়ে এল। লেখার টেবিলে ব্রোঞ্জের ফ্রেমে একটি মেয়ের ছবি। মেজর ক্রাউসগ্রেল বিনয়ী, তার মুখখানায় দরদীর ছাপ মারা। দেখলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। মাদোকে তিনি একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে ধূমপান করে কি না। তারপর অতি ধৈর্য সহকারে শুনলেন তার দীর্ঘ কাহিনী। কেন সে এসেছে, কোথা থেকে এসেছে— সব কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন। মাদো বলা শেষ করতে বললেন, আপনি যা বলেছেন, সেগুলি ঠিক কিনা সে সম্বন্ধে আমরা খোঁজ-খবর নেব, আপনি সন্ধ্যের আগেই ছাড়া পাবেন।···মাদোর তবু খটকা লাগলো: নিজের নাম সে

বলেছে আঁতোয়ানে লাক্ষ, কিন্তু মেজর বার বার শ্রীমতী ফ্রান্স বলে তাকে ডাকছেন। তবে কি জাকেৎ বিশ্বাসঘাতক? কিন্তু ভাবনার তো এখন সময় নয়। সে একটু হেসে বললে,

মেজর, আমি এখনো বুঝতে পারলাম না, আমাকে কেন গ্রেফতার করা হোল?

আমি নিজেও বুঝতে পারছিনা। কিন্তু তবু আমার অধীনস্থদের এই নির্বুদ্ধিতার জন্যে তাদের তারিফ করছি, ওদেরই ভুলে এক সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মহিলার সঙ্গে আলাপ করার সৌভাগ্য হোলো···

হঠাৎ পাশের ঘরে তীব্র চীৎকার শোনা গেল, এমন চীৎকার যে মাদো লাফিয়ে উঠলো। মেজর হাসলেন।

ঠিক এমনিই ধারাই চলছে। ওরা শান্তিতে কাজ করতে দেবে না।···

ভেজানো দরজাটা তিনি খুলে দিলেন। একটা শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর মরিস শুয়ে আছে।

একটা জার্মান সৈন্য তার তলপেটে ঘোড়ার চাবুক মারছে। মরিস চেঁচাচ্ছে,

ওঃ ওঃ জাকেৎ পাজিটা···তুইও তো পাজি!

মেজর বললেন,

আলফ্রেড, এবার থামাও। দেখছ তো, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। মাদো চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না, মরিসের মুখ থেকে ঝরছে রক্ত। সে মরার মতো শুয়ে আছে।···মেজর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমাকে ক্ষমা করুন, তরুণীর স্নায়ু তো এ দৃশ্য সইতে পারে না। আমি স্বীকার করি মাদাম, আমাদের কাজটাই এমনি অপ্রীতিকর···

মাদো বুঝলো; ঘনিয়ে এসেছে সমাপ্তির পালা! জাকেৎ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে···

সে সমস্ত শক্তি উজাড় করে বললে,

আমাকে আটক রেখেছেন কেন? আমার সময় নষ্ট হচ্ছে···

হাঁ, হাঁ, তা হচ্ছে বটে! কিন্তু আপনি আমাকে বলুনতো মাদাম, আপনার পেশাটা কি? শান্তির সময়ে আপনার কি পেশা ছিল?

লিমোজেস পোর্সেলিনের কারখানায় নক্সা আঁকি···

আহা, কি চমৎকার! বোধহয় ফুলই আঁকেন?···এই তো সেদিন আমার স্ত্রীর জন্যে একপ্রস্থ ডিনারের জিনিস কিনলাম, তাদের উপরে গোছা গোছা ভায়োলেট আঁকা। আপনারই আঁকা বুঝি?···জাকেৎ দু-একদিনের ভিতরেই ছাড়া পাবে। ওকে শুধু কয়েকটা কারণে আটক রেখেছে···

আমাকে কি আপনারা ছেড়ে দেবেন?

জানি না। তবে আমি ছেড়ে দিতে পারি···কিন্তু আপনার কাছে কি করে প্রস্তাবটা করব, তাই-ই ভাবছি···ব্যাপারটা বড়ই অপ্রীতিকর...আরো আপনি সুন্দরী—এরই জন্যে আরো খারাপ লাগছে। আপনার মতো মেয়েকে আদর করতে হয়, পীড়ন করা চলে না। আপনার কাছে আমার এই প্রস্তাব—প্রথমে আমার কাছে সব কথা স্বীকার করুন—সন্ত্রাসবাদীদের তালিকা তাদের নামধাম দিন। আপনাদের দল কি করছে তাও জানাবেন। তারপরে আমরা এক বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বো। আমি একখানা লেপচাপা দিয়ে দেব, আর আপনার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তারপরে মুক্তি—শুধু ভায়োলোট আঁকবেন—আপনাকে আবার বলি, পাশের ঘরের থেকে এ প্রস্তাব ঢের ভালো। য়্যালফ্রেড পাশের ঘরকে বলে হালুইকরের দোকান—কিন্তু ওখানকার অভিজ্ঞতার থেকে এ প্রস্তাব ঢের ঢের ভালো।

মাদোর কাছে এগিয়ে গিয়ে মেজর তার গাল টিপে দিলেন, কিন্তু তখুনি হাত সরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন!

য়্যালফ্রেড, ছুঁড়িটাকে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা-সে ধোলাই দাও!

চৌদ্দ

জার্মান লেফটেনাণ্টকে দেখে জোস্ টমি গানটা বাগিয়ে ধরলে। সবাই হেসে উঠলো।

দেখতে পাচ্ছ না, এ যে আমাদের মিকি ?

চেকটির ছদ্মবেশ আরো চমকপ্রদ। ধূসর এক গাবার্ডিনের কোট সে পরেছে, মাথায় তার ফেল্টের টুপী, হাতে প্রকাণ্ড এক চামড়ার ব্রিফ-কেস। জার্মান সৈন্যের সাজে সেজেছে চারজন প্রতিরোধ-যোদ্ধা। চেকটি জার্মান ভাষা বেশ বলে ; মিকি আর ছদ্মবেশী দুজন যোদ্ধা তার সঙ্গী হবে। দেদে আর মেশিনগান-চালিয়েরা ফটকে মোতায়েন থাকবে। রক্ষীরা যদি জার্মানদের শহর থেকে ডেকে আনতে ছোটে, অমনি তারা চালাবে গুলী। ভোরোনভ, শার্লে, জোস—এরা শান্ত্রীদের হুঁশিয়ারি ঘর-থেকে সরাবার চেষ্টা করবে।

সবাই জড়ো হতেই দেদে বললে,

জেল থেকে আমরা একশো বিশ কিলোমিটার দূরে আছি, তিনটে বাজবার আগেই সবশেষ করতে হবে। দেরী হলে, ওদের গুলী করা হবে, কালই ওদের হবে শাস্তি···

এ এক উন্মাদের পরিকল্পনা—উন্মাদের মতোই ওরা ছুটলো অন্ধকার ঝড়বাদলের রাতে আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে, চালকরা ক্ষিপ্র গতিতে চালাচ্ছে—কাল সাথীদের হবে গুলীতে মৃত্যু, শান্ত্রীর মাটি এড়িয়ে গরু মোষের গাড়ির পথে ছুটে চলেছে, সবাই ঝুঁকে পড়ে আছে পথের দিকে ব্যগ্রদৃষ্টি মেলে। সূক্ষ্ম বর্ষাধারায় রেখাময় অন্ধকার।···

চেকটি গিয়ে ফটকে ঘা মারলো।

খোলো !

কে ?

গেষ্টাপো। আমরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের নিয়ে যেতে এসেছি···।

ফরাসী শান্ত্রী। দুটি গেষ্টাপো আছে, সব কিছুর তদারকের ভার তাদের উপর। এখন তারা আরামে ঘুমোচ্ছে কর্তার আফিস কামরায় অয়েল-ক্লথ মোড়া কাউচে। শান্ত্রী ফটক খুলতে নারাজ, কাউকে ঢুকতে দেবে না, এই তার উপরে হুকুম। চেকটি চেঁচিয়ে উঠল,

হাঁদারাম! তোদের সব জার্মানীতে চালান দেব!···

শান্ত্রী ফটকের ফোঁকর দিয়ে আবার দেখলো; হাঁ, গেষ্টাপোই তো··· ব্রিফকেস হাতে ঐ লোকটা আগেও ক'বার এসেছিল এখানে। শয়তান ওদের গিলে ফেলুক না! একজন হুকুম জারি করে যায়, আর একজন সেই হুকুম বাতিল করে দেয়; আর আমাদের জবাব দিতে দিতে হায়রানির একশেষ! ঐ লোকটা এখুনি হয়তো ক্ষেপে উঠে জার্মানীতে চালান করে দেবে। তখন বেগার খাটতে খাটতে মর!···চেকটি আবার ফটকের দরজায় দুমদাম করে ঘুসি মারছে আর গাল দিচ্ছে। শান্ত্রীর বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। কি আর করবে সে পাশের দরজাটা খুলে দিল।

গোলমাল শুনে ঘুম টুটে গেছে গেষ্টাপো দুজনের, তারাও ছুটে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠে হুকুম দিলে:

গুলী চালাও!

মেসিন-গান শব্দ করে উঠলো, জার্মান দুটো একই সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ভোরোনভ চৌকি-মিনারের শান্ত্রীকে আগেই ঘায়েল করেছিল, তারই মেশিন গান নিয়ে আঙিনা আগলে আছে। একজন রক্ষী বাধা দিতে গেল, কিন্তু তাকেও জার্মানদের বরাতই মেনে নিতে হোল।

মিকি এবার হুকুম দিলে, সেলগুলির দরজা খুলে দাও!

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা ভাবলে, জার্মানরা এসেছে তাদের নিয়ে যেতে, নিয়ে গিয়ে গুলী করবে। মিকি যখন বললে, আমরা মাকিরা এসেছি···কেউ তার কথা বিশ্বাস করতে পারলে না।

সাথীরা এস, আমরা মানুষের মতো মরি !···

ওরা লা মার্সেঈ গেয়ে উঠলো। মিকি তাদের বোকার দল, সসেজ, মাদিহাঁস আরো অনেক কিছু বলে গাল দিলে। যত সে গাল পাড়ছে, ততো দণ্ডিতদের মনে আশার ঝিলিক হানছে···শুধু আমাদের সাথীরাই তো পারে অমনি গাল দিতে !···হঠাৎ একজন দণ্ডিত আসামী মিকির দিকে ছুটে এল।

কে রেনে !

···মিকি তাকে জড়িয়ে ধরে বললে,

পয়লাই বলে রাখি, আমি রেনে নই, মিকি। আর একটা কথা, ওসব বক্তৃতা আর ফুলের তোড়া সন্ধ্যের জন্যে মুলতুবি থাক। একটু চাঙা হয়ে নাও, বাইরে ট্রাক আছে। হাঁ, আর একটা কথা, এটাও মনে রেখো, ট্রাকে আগে থেকেই কারো জন্যে আসন নির্দিষ্ট করা নেই।

একটা নিঃসঙ্গ ডিগরী আর খোলেই না। রক্ষীরা গাল পাড়ছে, চাবী নাকি ভেঙে গেছে।

চাবী ভেঙেছে তো কি হয়েছে ? মিকি বললে, আমি এবার একে একে তোদের মাথাই ভেঙে দেব, তখন টের পাবি···

রক্ষী গজর গজর করতে-করতে দরজা খুলে দিলে। মরিস মেঝেয় পড়ে আছে, নড়তে-চড়তে পারছে না। ওরা ওকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল।

রক্ষীদের ঘরে মাদো জাকেৎকে দেখতে পেল। সে জিজ্ঞেস করলে, তুমি এখানে কি করছ ?

মাদোর দিকে না তাকিয়েই সে বললে,

আজ ভোরেই ওরা আমাকে ছেড়ে দিত। জার্মানরা এইখানেই আমাকে বসিয়ে রেখেছিল।

মাদো দেদেকে খুঁজলো। গেব্রিয়েল পেরি দলে যখন সে ছিল, তখন মাদোর সঙ্গে তার চেনা।

দেদে, এখানে একজন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, সে মরিসকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছে।

দেদে জবাব দিলে,

আমরা বিশ্বাসঘাতককেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

সাতাশজন বন্দীকে ওরা মুক্তি দিলে, ওদের মধ্যে অধিকাংশেরই পরদিন ভোরবেলা গুলীতে মৃত্যু হোত। শার্লে তার ভাইয়ের সন্ধান পেল। মিকি শান্ত হতে পারছে না। সে বার বার বলছে, ভাবতো একবার! হঠাৎ পিয়েরির সঙ্গে এখানেই দেখা হয়ে গেল। আমরা একই দোকানে কাজ করতাম।···

পাহাড়ের দিকে ছুটছে লরি, দিন হয়ে এল, চারদিকে বন, ভেজা বন। দেদে তার ট্রাক থামিয়ে জাকেৎকে বললে, বিশ্বাসঘাতকের উপর গুলী খরচ করতেও মায়া হয়। আমরা তো আজেবাজে মানুষ নই, আমরা সংগ্রামী। নাও, সিগারেট খাও!

জাকেৎকে সে-ই গুলী করলে। এবার ওরা আবার ছুটে চললো। মাকী, এইতো জঙ্গী মাকীর দল!···

যে ট্রাকে জোসে, শার্লে আর ভালুক ছিল, সেখানা এখনো আসে নি। মিকি ওদের একই গাড়িতে তুলে দিয়েছিল। দেদে চেঁচিয়ে উঠলো,

ওরা এল না কেন?

মিকি বললে, ভালুক বললে, তোমরা যাও, আমরা তোমাদের গিয়ে ঠিক ধরবো···আর তুমি তো জানো, ভালুক যদি একবার একটা কথা বলে···

ভালুকটি কে? মাদো জিজ্ঞেস করলে।

ওকে বুঝি তুমি দেখনি? ঐ যে ঢ্যাঙা মানুষটি। রুশ অফিসার, সাদা নয়, খাঁটি রুশ। ওখান থেকেই এসেছে, খনি থেকে পালিয়ে এল আমাদের কাছে···

সবাই ভালুকের কথা বলছে, শুধু দেদে ছাড়া, সে বসে বসে ভাবছে, কি হোল ভালুকের?···

মিকি যখন ডিগ্‌রী থেকে ডিগ্‌রীতে ঘুরছিল, তখন জেলের এক রক্ষী

শার্লে্কে জেলের কর্তাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা বলে। সে বলে, ওদের মধ্যে ঝঞ্ঝা-বাহিনীর মানুষটাই হচ্ছে সবচেয়ে পাজি।…এখান থেকে আধ-কিলোমিটার দূরে একখানা বাড়িতে সে থাকে। রোজ সন্ধ্যেয় আসে বন্দীদের জেরা করতে। অন্য জার্মানরা ওকে বলে, ওস্তাদ, পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। সে বন্দীদের মাথা নিচু দিকে করে ঝুলিয়ে রাখে।…ভোরোনভ শুনেই বললে, ধর যদি একবার গিয়ে ওস্তাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে আসি, তাহলে কেমন হয়?…শার্লে আর জোসে তো তখনি রাজি।

ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেল। ঝঞ্ঝা-বাহিনীর লোকটি রিভলভার তোলার সময়ও পেলে না। ভোরোনভ তাকের উপরে রাখা ফাইলগুলো নিয়ে এল। ওরা যখন চলে এল, তখনো অন্ধকার আছে। গোটা কয়েক শান্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। কিন্তু চালক জোরে চালিয়ে দিলে সিত্রোয়েঁ খানা। খরগোসের মতো ছুটলো গাড়ি। ওরা পালিয়ে এল…

মেয়েরা যথাসাধ্য করলো, চমৎকার ভোজ তৈরী হলো। আগের দিনই কোয়ার্টার মাষ্টার ইভ্‌স্ চারটে ভেড়া আর কিছুটা মদ জোগাড় করে রেখেছিল। ওরা তাই দিয়ে ভুড়িভোজন করলে। তারপর মদ খেয়ে গান গাইলে, একে অপরকে জড়িয়ে ধরলে আনন্দে, মিকির পুরানো বন্ধু পিয়ের অন্ততঃ একশোবারও বললে,

এ তো এক জবর তামাসা—তাই না? আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, ভোরে আমাদের গুলী করা হবে…আর দেখ দেখি, এখন সবার সঙ্গে বসে আছি, মদ খাচ্ছি!…

মরিস শুয়ে আছে একটা মাচায়। সে জিজ্ঞেস করলে, জাকেৎ কোথায়? ফতে হয়ে গেছে, জবাব দিলে দেদে, মরিস বললে, ভালই হয়েছে, আমি তো ভাবছিলাম, ও পালিয়েই যাবে।

মাদোর এবার ভালুকের সঙ্গে দেখা হোল, এক দৈত্য যেন, কিন্তু শিশুর মতো সরল চোখ।…সে তাকে আপন মনের গোপন কথাই বললে,

আমার এক সময়ে এক রুশ বন্ধু ছিল। সে বহুদিনের কথা, আমার অন্ত জীবনে···যে যে রুশ কথা শিখেছিল, সে মনে করতে চাইল। হঠাৎ তার হাসি পেল। বললে, কে চরতু পশিলিয়ৎ···

ভোরোনভও হাসিতে ফেটে পড়লো।

ও কথা শিখেছিলে কেন?

ঐ বলে তো তোমার দেশের মানুষ ভাগ্য গণনা করে।

তোমার ভাগ্য কিন্তু ঠিক গুণতে পারে নি। বন্ধু ভাবে সে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মাদোকে, বললে, তার বুকে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল—এই তো কথার মানে—রুশদের অমনি রীতি। কাল তো আমাদের লম্বা ছুটি—বিপ্লবের স্মৃতি বার্ষিকী কাল।

দেদে উঠে দাঁড়ালো।

এস আমরা রুশদের সম্মানে পান করি! কিন্তু ভালুক, তুমি তো ঠিক কথা বল নি—কাল তো আমাদেরও ছুটি···

ভোরোনভ ভাবছিল যুদ্ধের কথা। তুমুল যুদ্ধ চলছে: কিয়েভ হয় তো আমরা শীগ্‌গিরই দখল করে নেব, তবে শক্ত ব্যাপার—বিস্তৃত নদী, খাড়া পাড়··· জার্মানরা হয় তো আমাদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তবু আমরা দখল করবো কিয়েভ।···আর-এক গ্রীষ্মের কথা তার মনে পড়লো। স্তেপভূমি, ডন··· সার্জির সঙ্গে সে চলছিল। দুজনেই চুপচাপ···তিক্ততায় মন ছেয়ে গেছে, ভাষায় সে তিক্ততা বুঝি প্রকাশ করা যায় না···এখন ওখানে সবই বদলে গেছে। সার্জি কোথায়? হয় তো নিপারের ধারে?···

শরীরে ধকল গেছে, এখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি মাদো। পিঠ আর পা কামড়াচ্ছে···জার্মানটাকে কামড়ে দেবার পর ওরা তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারে। মৃত্যুর জন্তেই সে প্রস্তুত ছিল। কাল তার মনে ঘুরছিল একই ভাবনা—গুলী করবার জন্য প্রতীক্ষা করছে শাস্ত্রীরা···মৃত্যু যেন নির্যাতন থেকে অনেক কাম্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে। তার বেশি সে এগুতে পারে নি, স্মৃতি এসে হানা

দেয় নি। হঠাৎ, দেদে এসে ঢুকলো ডিগ্‌রীতে…

শুকনো পাতার গন্ধ, তাঁবুর ধোঁয়া, মিকি গান গাইছে।

আমরা সানন্দে থাকবো তোমার সঙ্গে

কিন্তু এমনি নিয়তির নিয়ম

প্রথম মুরগী ডাকার আগেই

আমাদের বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু।

মাদো ভোরোনভের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালো।

ওরা ওকে ভালুক বলে ডাকে। ও এসেছে ওদের ওখান থেকে—না, না, সার্জি তো আমাকে জড়িয়ে ধরবে না বুকে, আমি তা চাইও না। সে সব তো অতীতের কথা—চোখে আমার জল টলটল করছে, কিন্তু সে তো কিছু নয়—ঐ ধোঁয়ায় জল বেরুল চোখ থেকে। দেখ, দেখ, ফারের কুঁড়িগুলো কেমন পুড়ছে!—

তাহলে আমি আবার বাঁচবো?—জীবন আবার তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে নিলে—মধুর, অস্থির, রহস্যময় জীবন—ঐ তাঁবুর আগুনের শিখা যেমন কাঠগুলিকে জড়িয়ে ধরছে, তেমনি জড়িয়ে ধরছে জীবন।

পনেরো

লেজঁ৷ আইনজীবী গারসীর অফিসে বসে ছিলেন। চ্যাতেলেৎ বলে একজনের অপেক্ষায় বসে আছেন। নামটা কি উদ্ভট লোকটার, হাসি পায়। বি, ও এ-র প্রতিনিধিরা মেট্রোর যেন প্রেমে পড়ে গেছে। প্রতিটি প্রতিনিধিরই এক-একটা ষ্টেশনের নামে নাম; কিন্তু চ্যাতেলেৎ এত দেরী করছে কেন। আজ তো আবার সহরের আর এক প্রান্তে আস্তানা গাড়তে হবে। তাছাড়া টিউবে তো যেতে পারব না। জোর হানা চলছে সেখানে…

আফিসের দেয়ালে বাড়ির মালিকের কালো গাউন-পরা অনেক রকমের ফোটো। কোথাও বা হাত তুলে আছেন, কোথাও বা ঘুসি পাকিয়ে যেন শাসাচ্ছেন, কোথাও বা চোখে জল ঝরছে, কোথাও বা আবার হাসি। উনিশশো একচল্লিশ সালে গারসী বলেছিলেন, পেতাঁ হচ্ছেন আধুনিক স্থ জাঁ, আর্ক। কিন্তু এখন অন্য দিকে হাওয়া বইছে, তাই তিনি সংগ্রামী দলের সঙ্গে পরিচয় করে ফেলেছেন। জার্মানদের যখন তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এই গারসীই হয়তো বলবেন; তিনিই ওদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। লেজাঁ হাই তুললেন। মানুষ এমন এক বয়সে এসে পৌছোয়, যখন মানুষের এই অভিনয় তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকে। চ্যাতেলেৎ-এর এখনো দেখা নেই।

অবশেষে সে এল। চ্যাঙা রোগা, দেখতে সিপাইটি যেন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মর্মস্পর্শী। লেঁজা তার দিকে তাকিয়েই বুঝলো, সে আর যা-ই হোক, দাবার ঘুঁটি হবে না।

চ্যাতেলেৎ ফরাসী শহরগুলির উপর বোমা পড়ার কথা বললে ; জার্মান রেডিও মানুষকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে।

মুক্তির প্রহর যে কাছে এল, এই কথাই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের কাজ।

নিশ্চয়ই ! লেজাঁ জবাব দিলেন। কিন্তু এখানে ফৌজের কথা ওঠে, আমি বৈমানিকদের বিচার করতে বসিনি, কিন্তু ফরাসীদের দিক থেকেই কথাটা বলছি। নিশ্চয়ই রেলসেতু ধ্বংস করতে হবে। ওরা তো সাতবার তার উপর বোমা ফেলেছে, শহর একরকম মুছেই গেছে, কিন্তু সেতু তো যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে···আর আমরা গত ছ'মাসে আঠাশটা সেতু উড়িয়ে দিয়েছি। আরো পারতাম, কিন্তু হাতিয়ারের অভাবেই তা হয় নি···

যান-বাহনেরও অসুবিধে ছিল, এখন বোধহয় কিছুটা সুরাহা হবে।

যান-বাহনের কথা বাদ দিন। কিন্তু এখন যেসব হাতিয়ার এসেছে, তা আমরা পাব না কেন ? ওগুলো দুর্লভ বস্তুর মতো ওরা আগলে বসে আছে কেন ?

ঠিক সময়ের জন্য সেগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে।

সেই ঠিক সময়টা কখন ?

কখন, তা আমরা জানি না। আমাদের সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও নয়। উনিশশো বেয়াল্লিশের জুলাইতে শুনেছিলাম, জার্মানদের আর আক্রমণ করার দরকার নেই, ক'সপ্তাহের ভিতরেই মিত্রশক্তি নেমে পড়ছেন। এবার গ্রীষ্মে, যখন জেনারেল সাউমবার্গকে খুন করা হোল, তখন আপনাদেরই একজন সাথী বললেন, কেন বৃথা শক্তি ক্ষয় করা হচ্ছে ? ওরা তো আগষ্টেই নেমে পড়বে···তা এখন তো নভেম্বর চলছে···ওরা বলে, শীতে কুয়াশায় নামা যাবে না, বসন্ত আর হেমন্তে উপসাগরে ঝড় ওঠে, গ্রীষ্মে দিনগুলি বড় খটখটে পরিষ্কার থাকে। আমার একমাত্র আশা, রুশরা যখন জার্মান সীমান্তে গিয়ে পৌঁছবে, তখনি ঐ ভদ্রলোকদের তাপমানযন্ত্র দেখা থামবে।···

চ্যাতেলেৎ হাসলে,

রুশরা খুব লড়াই চালাচ্ছে, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। আমি নিজে একজন সৈনিক ম'সিয়ে লাক, লাল ফৌজের সমর-কৌশলের আমি তারিফই করি। কিন্তু রুশদের স্বভাব নিয়ে আমাদের কারবার নয়, আমাদের কারবার ইংলণ্ড আর আমেরিকার পরিকল্পনা নিয়ে। শুনেছি, লণ্ডনে এই নিয়ে ভয়ানক তর্ক আর মনান্তর হয়ে গেছে। জেনারেল আর্ণল্ড-এর মত, জার্মান শহরগুলিতে হানা দিয়ে বোমা ফেলাই যথেষ্ট। কেউ কেউ বা দক্ষিণের দিকে নজর দিতে বলছেন। ইতালী অভিযানে নাকি বহু সৈন্য গেছে।

তাহলে আমাদের ভাল আবহাওয়ার জন্যে বসে থাকতে হবে ?

বসে থাকতে হবে এমন কথা কেউ বলছে না···

আমি এই কথাই বলতে চাই, বি, ও এ ভিতরের গুপ্ত বাহিনীকে অকেজো করে তুলছেন।

বি, ও, এ তাঁর সাধ্য মতো হাতিয়ার আমদানী করছেন।

আর সেই হাতিয়ার মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হচ্ছে।···

জার্মানদের হাতে না পড়ে তাই লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে, ম'সিয়ে লাক, জানিনা,

আপনার বিরক্তির কারণ কি···লেজাঁ উঠে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর চ্যাতেলেৎ-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন,

বিজয়ের পর এমনি ধরনের কথা বলা যায়···এসব শান্তির বৈঠকের বা শোকসভার বক্তৃতা, কিন্তু এখন একথা তো আজগুবি···আজ রাতে তো আমরা যে কেউ গেষ্টাপো দপ্তরে চালান যেতে পারি···শুধু শুধু ভাণ করছেন কেন ?

চ্যাতেলেৎ শান্ত স্বরে জবাব দিলে, শুধু মনের আলোড়নের প্রকাশ পেল পা দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা নেবাবার ভঙ্গীতে।

বেশ তো, আমি আপনার সঙ্গে বি, ও, এর প্রতিনিধি হিসেবে কথা কইতে চাইনা, একজন ফরাসী মানুষ হিসেবেই কথা বলব। আমি একজন ক্যাথলিক— আপনি হচ্ছেন কমিউনিষ্ট। এখন আমরা বসে আছি গারসীর আফিস ঘরে। যে কোনো মুহূর্তে আমরা গ্রেফতার হতে পারি। একই গেষ্টাপো আমাদের উপর নির্যাতন চালাবে, একই জমিনে দাঁড়িয়ে আমরা মরবো। আপনি ঠিকই বলেছেন, জার্মানরা আমাদের একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে।

আমার কি ভয় হয় জানেন, এই একই বন্ধন আমাদের বেঁধে দিয়েছে, বটে··· কিন্তু সে বন্ধন তো সম্পূর্ণ নয়। আপনার বহু বন্ধু আছেন, যারা এখনো অনভিজ্ঞ, তাঁরা আমাদের হাতিয়ার সরবরাহ করতে ভয় পান।

হাঁ, একথা সত্যি, এক বছর আগে অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। তখন সবাই কমিউনিষ্টদের বীরত্বের প্রশংসা করতো। আমি তখন ভেবেছিলাম, এক জাদুর খেলায় বুঝি সব বদলে গেল, জাতি বুঝি একতায় বদ্ধ হোলো। এখন অবস্থাটা ভালোর দিকে জার্মানরা প্রাচ্যে পরাস্ত হচ্ছে। আমাদের যতই অবিশ্বাস থাক, মিত্রশক্তিও শীগ্‌গিরই নেমে পড়বেন ফরাসী দেশের মাটিতে। ইতালীর এখন নাভিশ্বাস উপস্থিত। জার্মানীর অজেয় আত্মাও এখন মুমূর্ষু, তাই এই চিড় ধরেছে একতায়।

এতে কি আপনি অবাক হচ্ছেন ? আমি কিন্তু মোটেও অবাক হইনি।···

পৃথিবীর অবস্থা দেখুন—সব জায়গায়ই একই রকম। ভোলগার পারে যতদিন লড়াই চলছিল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রশ্নই উঠেনি। সবাই বোলশেভিকদের প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ ; কিন্তু এখন য়্যাংলো সাক্সনরাও চামড়া ভাগ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভালুক তো এখনো মরে নি। টেরেন্স না বলেছেন, আমি মানুষ, মানুষের দুর্বলতা আমার আছে!...

লেজাঁ অনুভব করলেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এই লোকটার সঙ্গে কেনই বা তিনি কথা কইছেন? ও যে কথা বলছে, তাতে আছে ঘৃণা...লেজাঁ হঠাৎ বলে বসলেন ঃ

ওসব তত্ত্বকথা রাখুন! আমরা কি হাতিয়ার পাব?

আপনি আমার কাছ থেকে কি হিসেবে উত্তর চান—বি, ও, এর প্রতিনিধি, না, সাধারণ ফরাসী মানুষ হিসেবে?

লেজাঁ হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

প্রথমে প্রতিনিধি হিসেবে।

আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব। হয়তো সরবরাহের নতুন ঘাঁটি নিয়ন্ত্রিত হলেই তা সম্ভব হবে। ডিসেম্বর কি জানুয়ারী নাগাৎ বন্দোবস্ত হবে...

আর ফরাসী দেশের মানুষ হিসেবে?

না।

লেজাঁ চলে আসছিলেন এমন সময় আইনজীবী গারসী এসে লেজাঁর হাতে চেপে ধরলেন। বার বার ধরা গলায় বললেন, বীর! আপনারা বীর!... লেজাঁ বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। দেয়ালে আর-এক খানা ফোটো বাড়বে...

লেজাঁ বিষন্ন মনে চললেন শহরের পথে। আগেই তিনি জানতেন, সহযোগিতা মিলবে না ; শুধু সাথীদের পেড়াপীড়িতেই তিনি গিছলেন ; কিন্তু চ্যাতেলেৎ-এর সঙ্গে আলাপে মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন ভবিষ্যতের কথা। ইচ্ছে না থাকলেও ভাবনা এসে ঘিরে ফেললো। সরল মানুষ ভাবছে, যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তখন আর ফ্যাসিষ্টরা থাকবে না, স্বর্গ এসে দেখা দেবে...কিন্তু

আমাদের সামনে রয়েছে তুমুল সংগ্রাম; প্রচণ্ড সংগ্রাম, এর থেকেও হয়তো ভীষণ!···কাগুলাররা কি আমাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবে?···আজ আমাদের দিয়ে তাদের প্রয়োজন। আমাদের সাথীরা মরতে জানেন, আজ ১৯৪৩ সালেও তার দাম আছে···কিন্তু উনিশশো আটচল্লিশ সালে ওরা কি সুরে কথা কইবে? মুর তার কাজ করেছে, কিন্তু মুরের আর প্রয়োজন নেই! এই তো নিয়ম। সুখের স্বপ্নই ভাল, সুখ তো কখনো আসে না···

শহরতলিতে অপরিচিতদের সঙ্গেই তিনি রাত কাটালেন। বাড়ির কর্ত্রী তাকে ঘরে রেখে, পড়শীদের বাড়ি চলে গেল। লেজাঁ তাকিয়ে রইলেন বাড়ীর দিকে। আটটা বেজেছে। মারী আসবে নটায়। এক ঘণ্টা তিনি বিশ্রাম করে নিতে পারেন।···নড়বড়ে খাটখানায় গিয়ে তিনি বসলেন। ঠাণ্ডা ফাঁকা ঘর।

কোটটা খুললেন না, বিষাদের ভার চেপে বসেছে মনে। তার ব্যক্তিগত দুঃখ ভবিষ্যতের ভাবনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করেছে। চার বছর আগে তিনি ছিলেন সুখী। সেই বসন্তকালের কথা ওঁর মনে আছে। সবে কাজ থেকে ফিরেছেন, মিমি দুষ্টুমি করে তার কলমটা থেকে কালি ঢেলে দিলে গালচের উপর। পল পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত, সে বললে, ত্রিকোনমিতিটা বড় শক্ত বাবা···জোসেৎ বাজাচ্ছিল শোঁপার নকটার্ণ···সব শেষ হয়ে গেছে।···জোসেৎ এখন কোথায়? একটা ঠাণ্ডা, অপরিচিত ঘরে, সে হয়তো গেষ্টাপোদের জন্য প্রতীক্ষা করছে, হয়তো। বা সে আছে মাকিদের সঙ্গে? বা সে মৃত?···অনেক দিন চিঠি দেয় নি। খোজখবরও নেই···পল মারা গেছে···মিমি মারা গেছে···যুদ্ধ হয়তো শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ওরা তো আর ফিরবে না। জোসেৎ আর আমি—দুটো যেন গাছ—তাদের ডালপালা কেটে নেওয়া হয়েছে···গাছ দুটো তো আর শ্যামল পাতায় সবুজ হয়ে উঠবে না···

দরজায় ঘা পড়লো। মারী, সঙ্গে এনেছে তার বাচ্চাটি। খুদে জানেৎ।

ওকে সঙ্গে আনলে পুলিশ আর বিরক্ত করে না। আর তা ছাড়া, কার

কাছেই বা রেখে আসবো ? লাক, তুমি ওকে আগে কখনো দেখোনি ও ঠিক পেঁপির মতো, তাই না ?

লেজাঁ হাসলেন, বড়ই অদ্ভুত লাগছে। ঐ বাচ্চা পেঁপির মতো দেখতে, ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হোল, হাঁ, সত্যিই তো, মিলেৎ-এর কি যেন আছে ওর মধ্যে—চোখ, না অঙ্গভঙ্গী কোথায় যেন আছে মিল !

না, সে মিল হাসিতে ? ও মার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, মুখে ওর হাসি···

মারী বললে, ভারি দুরন্ত। ঠিক বাপের বেটা।

কত বয়েস হোল ? দু'বছর ?

না, না ! এক বছর দু'মাস।

লেজাঁর মনে পড়লো মিলেৎকে, আবার বিষাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মিলেৎ-ঝাঁকড়াচুল, সবকিছুতেই ওর আনন্দ, উৎসাহ—মারীর সঙ্গে ওর জীবন সবে শুরু হয়েছিল। ওরা তাকে খুন করলে, অমনি করে ওরা পলকেও খুন করেছে···

মারী বললে,

আঁরি বলে, ওরা বিশটা টমিগান নিয়ে যেতে চায়, সঙ্গে চায় ক'জন মানুষ। তারা পাকা-পোক্ত হওয়া চাই।

কখন যেতে চায় ?

ন'তারিখে।

বেশ তো, আমি কাল জোগাড় করে দেব। পুলিশ ছাউনি তো ?

না, সৈন্যদের আস্তানা।

আমিও যাব···

মারীর শিশু সন্তান, কিন্তু তবু সে কাজ করে যাচ্ছে, ইশতেহার আর হাতিয়ার নিয়ে বিলি করে···গুলীতে মরার ঝুঁকি নিয়েছে। না হয়তো চালান দেবে রাভেনস্‌ব্রাক-এর বন্দী শিবিরে—সে তো আরো খারাপ।···আর যদি সে বেঁচেই ফিরে আসে···চ্যাতেলেৎ-এর ক্রুর চোখ ভেসে উঠলো···

আবার লড়াই চলবে··· সাধারণ সুখশান্তিটুকুও আর মানুষের থাকবে না...

আমাদের জঁানেৎ হয়তো সুখের মুখ দেখবে, তাইনা লাক ?

লেজঁা তাড়াতাড়ি বললেন,

হাঁ।

তারপর আবার ভাবনা। সত্যিই কি ও দেখবে সুখের মুখ ?...যে সমস্ত পুঁথিপত্রে তিনি আস্থা রাখেন, তারা তো সমস্বরে বলে, হাঁ। মানুষ তো ধাপে ধাপে অগ্রগতির পথেই চলে। চলার পথে আসে ঝড়ঝঞ্ঝা, কিন্তু ধ্রুব তাদের লক্ষ্য ; কখনো বা পথ আকাবাঁকা, কখনো বা ঘোরানো গোলকধঁাধার মতো ; যারা দুর্বল, তারা তো তার উদ্দেশ্য বোঝেনা এই গতিতে। কিন্তু তবুও চলে মানুষের মিছিল। সত্য, একথা সত্য যে গেষ্টাপোরা বর্বরের চেয়েও অধম—ওদের পাপবোধও তো শান খাচ্ছে। হতাশের দল বলবে, আগে ছিল ন্যায়বান মানুষ। হাঁ, একথা সত্য। কিন্তু তাঁরা তখন প্রকৃতির তাড়নায় কাজ করতেন। কিন্তু এখন মন সক্রিয়, সজাগ ! এইখানেই সুখের প্রতিশ্রুতি। মনের জয় হবে। আঁরি লেজঁার হয়তো ব্যক্তিগত জীবন আর আসবে না, কিন্তু তাতো বড় কথা নয়। জীবনের পরিধি যে অনেক বড়...প্রায়ই তো লোকের মুখে শোনা যায়, অন্যে বেশ সুখে আছে। কিন্তু সে তো মিলেৎ-এর সন্তানের সুখ নয়, রুশদের সুখ নয়, আমার সুখ নয়।...তাইত সত্য বলে মনে হয় পুঁথির কথা। আমাদের শুধু দুঃখকে জয় করতে হবে। আমি ক্লান্ত।...দশ বছরে না হোক, একশো বছরে তো সুখ আসবে; আসতে পারে...

তিনি জঁানেৎকে কোলে নিয়ে মিমিকে যে ছড়া বলতেন, সেই ছড়াই বললেন,

আমাদের ছাগলছানা, চতুর ছানা,
বাঁধাকপির চাষ সে করে,
ভাবতে পার, কেন করে ?'...

লেজঁা আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবছেন না, নিঃসঙ্গতার অনুভূতিও আর নেই, নেই যুদ্ধের ভাবনা। এই যুদ্ধের চেয়েও আর এক ভীষণ যুদ্ধের ভাবনাও তাঁকে অস্থির করে তুলছে না। অপরিচিত পরিবেশ, বাইরের ঠাণ্ডা, সব মিলিয়ে গেছে,

নেই বিষাদ, যে বিষাদ আসে প্রৌঢ়ের জীবনে। জীবন যেন ধরা দিয়েছে তার কাছে।—এ এক ক্ষুদ্র, উদ্দাম, অস্থির জীবন। কঠোর লাক, যার সম্বন্ধে চ্যাতেলেৎ সঙ্গীদের কাছে বলেছে, এক সত্যিকারের উন্মাদকে দেখেছি, সেই লাক যেন অদৃশ্য। এ সে লাক ও নয়, যে সবে এখন ট্রেনের উপর হানা দিয়ে এসেছে, যে তিন দিনের ভিতরে হাতবোমা ছুঁড়বে শাস্ত্রীর উপর—না সে লাক নেই! এখন লেজাঁ হাসছেন জাঁনেৎ-এর দিকে চেয়ে। আর জাঁনেৎ দিচ্ছে হাততালি।

ষোলো

লিওর মনে পড়ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল এক ফেব্রুয়ারীর দিনের কথা। ফুলওয়ালারা বিক্রি করছে মিমোসা, তিনি একটা ডাল কিনে নিলেন লিঁওতাইনের জন্য। হাল্কা মন। প্রতিদিনই তিনি স্ত্রীকে বলেন, মুক্তি এখন যে কোনো দিন আসতে পারে। এই তো কালই লিঁওতাইন বলেছে, তুমি পালিয়ে যাও, ওরা ইহুদীদের গ্রেফ্তার করছে···তিনি জবাব দিয়েছেন, স্তালিনগ্রাদের পরে ওরা আর সাহস পাবে না।···মিমোসা ফুলের ডালখানা নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন হালকা মনে, পথে আসন্ন বসন্তের সাড়া, তার মনেও সে সাড়া জাগছে। লিঁওতাইনের সঙ্গে পথের মোড়ে দেখা হয়ে গেল। সে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করেছিল। বললে, ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল···ভাগ্যিস, তুমি বাড়ি ছিলে না!

তিনি তার স্ত্রীকে পাঠালেন সওগারদের বাড়ি; ওরা বলেছিল লিঁওতাইনকে ঠাঁই দিতে পারে; মঁসিয়ে আলপের্তকেও ঠাঁই দিতে পারতো, কিন্তু বড় ঝুঁকি। নিজেদের ছেলেমেয়েদের কথাও তো ভাবতে হবে।···লিও লাঁসিয়ের কাছে গেলেন। সেই ব্যাপারের পর তিনি আর করবেইয়ের ফটক মাড়ান নি, মরিসকে বিপদে ফেলতে তাঁর ইচ্ছে নেই। কিন্তু এখন আর উপায় নেই; লাঁসিয়ে তো

বলেছিলেন, বন্ধু যদি কখনো বিপদে পড়ে তিনি যথাসাধ্য করবেন। লাঁসিয়ে লিঁওকে দেখে এমন ভয় পেলেন যে, তিনি যেন হতবাক হয়ে গেলেন।

উঃ কি ব্যাপার ভাবতো! লোকে তো দেখেও ফেলতে পারে যে, একটা ইহুদী এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে!

সে বোধ হয় এখন লড়ছে···মোটামুটি দেখা গেল, রুশরা যে খাঁটি মানুষ তার প্রমাণ দিয়েছে, একটা ন্যায় বিচার আছে বই কি···আমি বড় আরামে ছিলাম···তাঁর বুকে বিরাট দুঃখ, সে দুঃখ গলে গলে পড়ছে, কিন্তু তিনি তো তা সব সময়ে টেরও পান না।

হেমন্ত এল। এক বুড়ি তাকে কাঠ-কুটরো গাদা করে রাখা এক কুঠরীতে থাকতে দিলে। অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে তিনি হাঁফিয়ে উঠছিলেন, একদিন রাতে আর সইতে না পেরে বেরিয়ে এলেন—যদিও জানতেন এ নিছক বোকামি ছাড়া কিছু নয়—সহরে এখন চলছে জোর বিমান হামলা। বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়া টেনে নিলেন। এরই মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পৃথিবীতে এখন ধূসর আর বেগুনী রঙের খেলা। লিঁওতাইনের কথা মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে এল দুঃখ—ছেলেকে তিনি দেখেন নি। তার নামকরণ হয়েছে রোবার্ট।··· লিওর কাঁধের উপর কে হাত রেখেছে। ভাবনায় তিনি বিভোর। হয়তো কোন বন্ধুরই হাত। না। একটা পুলিশ তাকে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কি ইহুদী? লিও রেগে গেলেন, মঁ্যসিয়ে, আমি ফরাসী দেশের মানুষ, আর তুমি এক জার্মানদের কুত্তা···নিষ্ঠুরভাবে তার উপর মারধর চললো, তারপর ওরা তাকে ড্রান্সিতে নিয়ে গেল! এখান থেকে ইহুদীদের ধরে ধরে পোলাণ্ডে চালান দেয়।

লিও ড্রান্সিতে এসেও মন চাঙা রাখলেন! চারদিকে কান্না, কত মেয়ে এসেছে, সঙ্গে তাদের বাচ্চাকাচ্চা। লিও দিলেন তাদের সান্ত্বনা।

এখানকার থেকে পোলাণ্ড অনেক ভাল। মিত্রশক্তি এখানে আসার আগেই রুশরা ওখানে পৌঁছে যাবে···

পোলাণ্ডে পৌঁছেই তিনি পালাবার চেষ্টা করবেন এমনি ঠিক করে রাখলেন। রুশ ভাষা তিনি জানেন, পোলদের তিনি বোঝাতে পারবেন, তারপর সীমান্তে গিয়ে হাজির হবেন। রুশদের বলবেন, ফ্রান্সে আমি লড়াই করে এসেছি; সেখানে যে লোক-দেখানো মিথ্যেমিথ্যি যুদ্ধ হোল, সে তো আর আমার দোষ নয়। আমি জোরই লড়েছিলাম···লালফৌজে ভর্তি হয়ে যাবেন। কে জানে হয়তো বা ওসিয়া আর মার সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে···

ছ'হাজার মানুষ পোলাণ্ডে নির্বাসনে যাবার জন্য তৈরী। কেউ বা উদ্‌বিগ্ন; তারা শুনেছে, বন্দীশিবিরে এমন হাড়ভাঙা খাটুনি যে বেশি দিন কাজ করা অসম্ভব। কেউ বা বলছে, ওদের চালান দেবে লুবিলিস কি অসউৎস্-এ। সেখানে মৃত্যুর উৎসব চলছে হুনদের। কিন্তু নিতান্ত দুঃখবাদী যারা তারাও একথা বিশ্বাস করে না। কি দরকার ছিল তাহলে চালান দেবার—এত কয়লা পুড়িয়েই বা লাভ কি!···অনেকে লিওর মতোই চাঙা হয়ে উঠেছে। তারা বলে, ওরা যদি খুন করতেই চাইত, তাহলে এত তোড়জোড় করতো না—ব্যাপারটা আলাদা রকম হোত,···ড্রান্সিতে খাবারও একেবারে অখাদ্য নয়, মুখে দেওয়া চলে। সবাইকে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করছে। পাঁচটার সময় ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে রুটি আর জ্যাম। আবার অভিনয় দেখাবারও বন্দোবস্ত আছে। একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো ইহুদী বললে,

ওরা এমন তোয়াজ করছে কেন জান? এমনি তোয়াজ করতে করতে একদিন সাবড়ে দেবে। ওই পাগলা কসাইগুলোকে আমার কি চিনতে বাকি···

লিও হাসলেন,

না, না, তা নয়, ওরা এখন ভয়ে জড়োসড়ো। লেজটি গুটিয়ে ফেলেছে। তুমি জিজ্ঞেস করলে না, কেন ওরা ছেলেমেয়েদের জ্যাম দিচ্ছে। এর উত্তর তো সোজা—লালফৌজ নিপার পার হয়ে এসেছে। এখন কারা যে আগে পোলাণ্ড পৌঁছবে জানি না—আমরা না রুশরা?

ওদের হুড়োহুড়ি করে গাড়ীতে পোরা হোল। লিওকে ওরা ভুল করে

যাদের সঙ্গে পরিবার আছে তাদের গাড়িতে তুলে দিলে। গাড়ি থেকে কেউ নামতে পারে না। ভিড়ে ভিড়। প্রতিটি কামরায় কোনে কোনে প্রস্রাবের বালতি। ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। এক বুড়ো পথে গাড়িতেই মারা গেল। শুধু একটি ভাবনা এখনো মানুষকে দিচ্ছে সান্ত্বনা—আমরা শীগ্‌গিরই পৌঁছে যাব।

একটি সুশ্রী মেয়ে সঙ্গে তার তিন বছরের একটি শিশু। সে বললে, শুনলাম, আমাদের নাকি বোতামের কারখানায় পাঠাচ্ছে। তা বোতামই না হয় তৈরী করব। কিন্তু ওরা আমার লুলুকে কাছে রাখতে দেবে তো?···

লিও পালাবার স্বপ্ন দেখছিলো। যদি সীমান্তে না যেতে পারে, বনে প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের খোঁজ করবে। ওরা তাকে দলে নিয়ে নেবে—তাগ্‌ তার ভাল। আর পোলাণ্ডে বড় বড় বনও আছে···কিয়েভ্‌ থেকে ফিরতি পথে তিনি পোলাণ্ডের ভিতর দিয়েই এসেছিলেন, সবাই তখন ভাবছে, যুদ্ধ হবে কি হবে না···কিন্তু এখন তো তারা সইছে দুঃখ দুর্দশা, অবাক হয়ে ভাবছে—কবে এ যুদ্ধ শেষ হবে—কবে দুঃখ-দুর্দশা যাবে। কেন—কেন মানুষের এত দুর্দশা? তিনি তো বুঝতে পারেন না, মানুষ তো গান গেয়ে, হেসে, সেলাই-এর কল তৈরী করে, সিনেমা দেখে কাটাতে পারত···বাবা প্রথম বারের যুদ্ধে মারা যান—তিনি গান গাইতে গাইতে সামনে এগিয়ে গেলেন—একটা গুলী এসে বিঁধলো বুকে···হয়তো ওসীয়াও মারা গেছে···ব্যাপারটা ভয়ানক নয়? মানুষ বাড়ি গড়ে, ছেলেমেয়েরও জন্ম দেয়, তারপর প্রতি পঁচিশ বছর অন্তর সেই বাড়ি চুরমার করে দেয়, মানুষকে খুন করে। গ্রীকরা এই খেলা আবিষ্কার করেছিল। সিসিফাস একখানা প্রকাণ্ড পাথর ঠেলে তুলেছিল পাহাড়ের উপর, সে পাথর আবার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল...জীবনও কি এমনি? জীবনকে অন্য কোনো উপায়ে ঢেলে সাজা যায় না? ওসীয়া তো বলে, তা সম্ভব।··· হয়তো রুশরা ঠিকই করছে। জানি না, জীবন যদি আরো কঠোর হোত, তাহলে ভালই হোত। কিন্তু ভদ্রও হওয়া দরকার। ফ্রান্স আমার জন্মভূমি। যখন ছেলেমানুষ, তখন ওখানে আসি, তাকে ভালওবেসেছিলাম, অভ্যস্ত

হয়ে পড়েছিলাম ফরাসী জীবনে। যদি আমাকে কেউ স্বর্গ আর ফ্রান্সের মধ্যে, একটিকে বেছে নিতে বলে, আমি ফ্রান্সকেই বেছে নেব। কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করি, রুশদের ভিতরে কোনা পেঁতা নেই, থাকতেও পারে না। পেঁতা থাকতে হলে মরিসের মতো বহু লোক চাই। কিন্তু মরিস কি খারাপ লোক? না। ওকে আমি দোষ দিই না। ও ভালও নয়, মন্দও নয়। ওতো জ্যান্ত মানুষ নয়, ও জীবন নিয়ে খেলা করে, বাঁচার মতো বাঁচে না। আমিও অমনি খেলা করেছি। হয়তো বা করিনি···লিঁওতাইনের সঙ্গে সত্যিকারের বেঁচেছি। ···আমি সত্যিই লড়েছি, আর লড়তেও চাই। কিন্তু ঠিক দল জোগাড় করতে পারিনি...এবার ওখানে তা পাব।

রাত। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেশনে। লিও কামরার দেয়ালে মুখখানা রেখে বসে রইলেন। ফাটল দিয়ে আসছে রাতের হাওয়া। জার্মান সৈন্তেরা গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। লিও জার্মান ভাষা জানেন। তিনি কান পেতে ব্যগ্র হয়ে রইলেন, ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে হয়তো জানতে পারবেন। কিন্তু ওঁরা নিজের ব্যক্তিগত কথা বলতে লাগলো।

কাল গুণ্টারের সৈন্যসংগ্রহ অফিসে ডাক পড়েছিল। ওর হাড় ভেঙে গেছে, কিন্তু এখন ওতে ফৌজে যাওয়া ঠেকে না। মারিচেনের সঙ্গে দেখা করতে গিছলে?

হাঁ, ও দুখানা চিঠি আর একটা পুলিন্দা পেয়েছে।

ওর স্বামী কোথায়?

ইতালীতে।

খুব খারাপ জায়গা নয়। আমার তো ইচ্ছে, ওরা আমাকে ইতালীতেই পাঠাবে। ওখানে অন্তত ঠাণ্ডা তো নেই। রাশিয়া তো এখন ভয়ংকর। জান, আমরা কিয়েভ ছেড়ে চলে এসেছি?···

লিও আর শুনলেন না। তার মুখে হাসি। তিনি সকলকে ফিসফিস করে জানিয়ে দিলেন, রুশরা কিয়েভ দখল করে নিয়েছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের

দল শুনে গেল, উৎসাহ নেই তাদের। কিয়েভ-এর ওদের কাছে কোনো মানে নেই—ওরা যাচ্ছে নির্বাসনে দূর দেশে।

যে মেয়েটি বলেছিল, যে বোতামের কারখানায় কাজ করতে যাচ্ছে, লিও তাকে বললেন, জান, কিয়েভ্-এ আমার জন্ম। চমৎকার শহর, অন্য শহর তার কাছে লাগেই না। সে যেন এক স্বপ্ন। তুমি পথ চলছ, আর নিশ্বাস তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে। পথ যে শুধু উঁচু নিচু তা নয়, সুন্দর, সুন্দর।···না, না, ওকথা এখন ভাবি না। আসল কথা হচ্ছে, রুশরা ঐ আর্যদের এবার আচ্ছাসে পিটুনি দিচ্ছে···চমৎকার মেয়েটি তোমার! ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি, ওর সামনে আছে ভবিষ্যৎ—সুন্দর জীবন। না, না, কেঁদো না! এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রুশরা আমাদের মুক্ত করবে। আমারও একটা বাচ্চা ছিল। তাকে কখনো দেখি নি। যুদ্ধে ছিলাম, একটা বিমান হামলায় সে মারা যায়। আমার স্ত্রী তখন পারী ছেড়ে চলেছেন, পথেই এই কাণ্ড।···অনেক, অনেক সয়েছি আমরা, কিন্তু বোধহয় এবার দুঃখের পালা শেষ হোলো বলে।···

কি করে ভাবলেন দুঃখের পালা শেষ হোলো? মেয়েটি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে শুধালে।

লিও ঘাড় নাড়লে,

হাঁ, এত স্পষ্ট ব্যাপার। রুশরা কিয়েভ দখল করে নিয়েছে একথা তো বলেছি। আর দু-এক মাসের ভিতরে ওরা পোলাণ্ডেও এসে যাবে...

আর একদিন আর রাত—আর একদিন। অসউৎস-এ ওরা পৌছলো রাতে। জার্মানরা চেঁচিয়ে উঠলো, নাম, নাম সব।

সৈনিকদের দল। একজন উপরওয়ালা কর্মচারীর হাতে ঘোড়ার চাবুক। মার্কিনী চলচ্চিত্রের অপরাধীর মতো মানুষের দল। তাদের গায়ে ডোরাকাটা কামিজ। কাদা, প্যাচপেচে কাদা। ঠাণ্ডা। এক বুড়ি জুতো পরতে পারে নি এখনো। তাকে ওরা টেনে হিঁচড়ে নামালে খালি পায়ে। সে কত বললে,

কর্তা, আমাকে জুতো পরতে দিন। বড় ঠাণ্ডা!

উপরওয়ালা বিদ্রূপ ক'রে বলে উঠলো, আহা ঠাকরুণ, চিন্তা কি শীগ্‌গিরই তো গরম হবেন।

সুশ্রী মেয়েটি শিশুকে চেপে ধরেছে বুকে, নিজেকে একটু ফিটফাট করে নিচ্ছে। হাত-ব্টুয়া থেকে বার করেছে আরসী, লিপষ্টিক আর পাউডার। সবাই আশ্বস্ত, পৌঁছনো তো গেল। কিন্তু ঐ উপরওয়ালার হাতে চাবুক কেন? আর এদেরই বা অপরাধীর সজ্জা কেন?

সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও!

লিও একজন অপরাধীর পিছনে দাঁড়ালেন। সে পোলিশ ভাষায় বললে,

আমাকে ক'টা সিগারেট দাও না সাঙাৎ?

লিও তাকে একটা সিগারেট দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

আমরা কোথায় এলাম?

অসউৎস্...আমাকে সব ক'টা সিগারেটই দিয়ে দাওনা। তোমার তো আর কাজে লাগবে না। এখুনি তো মরবে।

লিও বুঝতে পারলেন না—লোকটা তড়বড় করে বলে যাচ্ছে।

উপরওয়ালা এবার সবাইকে দেখতে লাগলো, মুখে তার চীৎকার, এই ডাইনা যাও, এই বাঁয়া যাও! যারা যুবক তারা গেল বাঁয়ে। বাকি সবাই ডাগের সারিতে। এরা রোগী, বৃদ্ধ, শিশু। লিওর মনে হোল, ওরা আমাদের কাজের জন্য বাছাই করছে। তার পালা আসতেই উপরওয়ালা কর্মচারীটি একটু বা দ্বিধাগ্রস্ত হোলো। লিওর অনেক বয়েস। যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন জোয়ান, মুখখানা ছিল পুরন্ত, গালে গোলাপ ফুটতো, কিন্তু এখন সে মুখে বলিরেখা, চোখের দৃষ্টিও ক্ষীণ।

অফিসার জিজ্ঞেস করলে, বয়েস কত?

তেতাল্লিশ।

অফিসার হেসে উঠলো,

আমাকে ঠকাতে পারবে না, যাও, ডাইনা যাও।

লিও গিয়ে দাঁড়ালেন অক্ষম আর বৃদ্ধদের সারে, তার মনে হোল, আমাকে হয়তো ব্যারাক বাড়ির মেঝে ঝাঁটপাট দিতে হবে···তাহলে আমি পালাব, ঠিকই পালাব···

মুক্ত বাতাসে এলে কত ভাল লাগে! ঠাণ্ডা। কিন্তু তবু ভাল লাগে। হেমন্ত যখন আসে, তখন মানুষের সত্যিই বাঁচতে ইচ্ছে হয়। হাঁ, কিছু সে করতে চায়, লড়তে চায়···হাওয়ায় মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, চাঁদ ওঠে—বিরাট চাঁদ, কমলা লেবুর মতো তার রঙ—মনে হয় যেন বিরাট এক তরমুজ। ঠাণ্ডা, জোরালো হাওয়ায়-ভরা রাতে আমি পালিয়ে যাব নিঃশব্দে···

বুড়ো বুড়িরা কাঁদছে, গোঙাচ্ছে, প্রার্থনার অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের দুঃখ লিওকে যেন এসে ছুঁয়ে গেল, ছেয়ে গেল, মন তবু উৎসাহে ভরপুর, তিনি তার প্রিয় গান গেয়ে উঠলেন,

যখন বসন্ত আসবে গো আসবে।
ভাগ্য তো হাসবে গো হাসবে।...

একজন জার্মানকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

হামামে। তোদের মতো নোংরা শুয়োরদের প্রথমে আচ্ছা করে চান করিয়ে নিতে হবে।

সৈন্যটা হেসে উঠলো।

পোষাক ছাড়বার হুকুম হোলো। তারপর নগ্ন মানুষদের ব্যারাক থেকে বার করে আনা হোল। সবাই চেঁচাচ্ছে, কি যেন আশঙ্কায় দুলছে মন। লিও আর গান গাইছেন না, যেন সাঁড়াশির মতো বুকখানা চেপে ধরেছে এক বিরাট দুঃখ। হঠাৎ তার মনে হোল: ওরা আমাদের হত্যা করবে। একটা জার্মানের কাছে ছুটে গিয়ে তিনি তার মাথার উপর এক ঘুষি কষিয়ে দিলেন। আর একটা জার্মান ছুটে এসে লিওকে একটা বাড়ির ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। এই বাড়িটি হামাম। লোহার দরজাটা পিছনে ঝনঝন শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। একটা মোটরে ভেঁপু গোঙিয়ে উঠলো, বাষ্পের কালো ঢেউ ঝোড়ো মেঘের

মত ছাদ থেকে ভেসে ভেসে আসছে। বাড়ির ভিতরের লোকগুলি করছে ছুটোছুটি, উন্মত্তের মতো চীৎকার করছে। লিও বুঝলেন, মৃত্যু মুহূর্ত আসন্ন। চোখের সামনে ভেসে উঠলো টুকরো টুকরো ছবি।—জীবনের ছবি। লিঁওতাইনের সঙ্গে আছেন, তাকে বলছেন, প্রিয়া, আমরা তো স্বর্গে আছি···ধূসর মৃত দেয়ালে ফুটে ফুটে উঠছে ভায়োলেট, উইস্‌তারিয়া। এক গভীর অবর্ণনীয় প্রশান্তি বিরাজমান। নিদাঘের উত্তাপ কমে আসছে, একটা ভোমরার অস্পষ্ট গুণগুণানি শোনা যায়। লিঁওতাইন তার মাথা এলিয়ে দিলে লিওর কাঁধে, তার কোঁকড়া চুল কাঁপছে—যেন তরঙ্গ উঠেছে চুলে। সে বললে, লিও, রবকে ডাক···তুমি কি পাগল? ওকে দেখ নি? ওর বয়েস তো তিন বছর।···একটা কমলা লেবু রঙা বল নিয়ে খেলছে। ···বল তাদের মাথার উপরে।···না, বল নয় চাঁদ। মা ফিসফিস করে বললেন, লিও, তুমি এখন বড় হয়েছ—তোমাকে তো চিনতেই পারছি না···গ্যাসের মেঘ নেমে এলো নিচে নিচে। লোকগুলি মেঝেয় পড়ে ছটফট করছে। লিওর দেহেও অসহ্য ব্যথা, একটা বঁড়শী যেন বিঁধে গেছে দেহে, মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে নিচ্ছে...তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। বহুক্ষণ হাত পা ছুঁড়লেন, যেন গ্যাসের তরঙ্গে সাঁতরে চলেছেন। একটা জার্মান ফোঁকর দিয়ে দেখে এবার হাতল ঘুরিয়ে দিলে ঃ মৃত আর অর্ধমৃত দেহের সার নিচে পড়ে গেল।

হেসলিং কেরাণী। সে অফিস ঘরে বসে আছে। তার বিবর্ণ মুখ যেন মাটির মুখোস, একখানা ন্যাকড়া দিয়ে কলমটা সে পুছে নিয়ে এক বিরাট খাতা খুলে বসলে। হিসাব বই। দুনিয়ার সব জায়গায়ই এমনি খাতার প্রচলন আছে। সে বইয়ে হিসেব লিখতে লাগলো।

ড্রান্সি থেকে ১১।১১ তারিখে জমা		১,০১৮ জন
	খরচ	৯৭২ ,,
	বাকি	৪৬ ,,

মনে মনে সে চটা, এই ক'টা লোককে আর বাকি রাখলো কেন? এতে

হিসেবে গোলমাল হয়। আগে তো শয়ে শয়েই খরচ হোত। বাকিও থাকতো শয়ে শয়ে। আবার সে সংখ্যাগুলি দেখতে লাগলো—

ওয়েস্টারবুর্গ থেকে আগত ২১।১০		১,৩৮৮
	খরচ	১,০৪১
	বাকি	৩৪৭
ভিয়েনা থেকে আগত ২১।১০		৭৭২
	খরচ	৪৪৭
	বাকি	৩২৫
তেরেজিন থেকে আগত ২৬।১০		৩,৮৬২
	খরচ	৩,৭০০
	বাকি	১৬২
পোসেন থেকে আগত ২৮।১০		৪০৬
	খরচ	২১২
	বাকি	১৯৪
লেমবার্গ থেকে আগত ৩০।১০		৮১৯
	খরচ	৬৮৭
	বাকি	১৩২

পাতা ভরে গেছে। হেসলিং একটা রুল নিয়ে একটা লাইন টানলে তালিকার নিচে তারপর যোগ দিলে। পাতার নিচে লিখলে—

মোট আগতের সংখ্যা		৮,২৬৫ জন
	খরচ	৭,০৫৯ জন
	বাকি	১,২০৬ জন

তারপরে হেসলিং সচিত্র বার্লিনারের একখানা সংখ্যা বার করে বসলো। বহুক্ষণ সে চিত্রনটীদের ফটোর দিকে তাকিয়ে রইল। বার্লিনে এখন সময়

ভাল কাটছে—মেয়ের তো এখন মেলা। কিন্তু আমি অসউৎস-এর এই গর্তে পড়ে আছি।

চাঁদ ডুবলো। একটা লাল আভা ঝলসে উঠছে আকাশে। ড্রান্সি থেকে আগত মানুষদের দেহ বিরাট চুল্লীতে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ভোর অবধি পোড়ানো চললো। কালো ঘন ধোঁয়া চারদিক ছেয়ে গেল। ব্যারাক বাড়িতে ঢুকে পড়লো ধোঁয়া, কানে, নাকে, রক্তে মিশে গেল। মাটির উপরে ধূলো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, ছড়িয়ে পড়লো বাড়ির উপরে আর কেরাণী হেলসিং-এর বিবর্ণ মুখে।

সতেরো

মিনায়েভ ওসীপকে কখনো এমনি ধারা দেখে নি। আমোদে যেন নেচে উঠেছে। অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী আর কিয়েভ দখলের উৎসব করছে ওরা। কুঁড়ে ঘরে হাট বসে গেছে—সৈন্য বিভাগের খবরের কাগজের সম্পাদক চেলী, মেজর পলিশচুক আর ক্যাপটেন লিওনিজও আছেন অতিথিদের ভিতরে। অনেক পান-ভোজন, গান হোল, হাসির বন্যা বয়ে গেল। চেলী একটা খোস গল্প করলেন। একজন ইয়াঙ্কি আর একজন ইয়াঙ্কিকে জিজ্ঞেস করলে, রুশরা এমন লড়িয়ে হোল কি করে। দুনম্বর উত্তর দিলে, ওদের পক্ষে এতো সোজা ব্যাপার। ওদের তো আর বোলশেভিকদের ভয় নেই।···এবার শুরু হোল নাচ—সবাইকে নেচে হারিয়ে দিলেন ক্যাপটেন লিওনিজ। পলিশচুক এবার ধরলেন ইক্রাইনের গান। ওসীপের চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো কিয়েভ-এর ছবি। পথ আর বাগিচা-ঘেরা কিয়েভ, রায়া আর তার বন্ধুর দল একটা দোকানে দাঁড়িয়ে সরবৎ খাচ্ছে, হাসছে। মা পার্কে আলিয়ার সঙ্গে খেলা

করছেন আর ছড়া কাটছেন, 'একটা ছিল শুয়োর ছানা, সে গেল বাজারখানা' ...এখন হেমন্তের শেষ, কিন্তু তবু ওসীপের মনে হোল গ্রীষ্মের কিয়েভকে। সবুজ সতেজ গাছ, পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো এসে পড়ে। আর এক গেলাস ভোদ্‌কা টেনে সে মিনায়েভকে বলতে লাগলো—কোনো ভূমিকা সে সে করলে না।

যখন প্রথম আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়—তখনো আমাদের মধ্যে ভাব হয় নি, সে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলো, চল, কোথাও কনসার্ট শুনতে যাই। আমরা একটা থিয়েটারে গিয়ে ঢুকে পড়লাম। বসে শুনছি, হঠাৎ সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, সুরটা তোমার মনে পড়ে? গান আমি জানি না, বুঝি না, কিন্তু তা স্বীকার করতে লজ্জাই হোলো। তাই বললাম, হাঁ। বিরামের সময় ও আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কোন গৎটা বাজাচ্ছিল? খুব একটা মন মাতানো সুর। 'হয়তো জীবনে গান গেয়ে যাই', কি কারমেন এমনি একটা গৎ। তাই বলেও ফেললাম, কারমেন। ও আমার দিকে এমন করে তাকালো, মনে হয় যেন প্রথম দেখছে। তারপর বললে, তোমার কান তো চমৎকার তৈরী! গৎটা ছিল বেটোফেন কি আর কারো। আমি কি করে জানবো বল? কিন্তু ওর কথা শুনে ঘাবড়ে গেলাম। বাড়ি ফিরে আরসীতে দেখলাম নিজের মুখ—আমার কান দুখানা এমন কিছু নয়, সবে চুল ছেঁটেছি, চুলগুলো লেগে লেগে আছে! কি বিশ্রী ব্যাপার। আমার মনে হোল, রায়া সত্যি সত্যিই আর বলেনি। কিন্তু কানের গড়ন নিয়ে ঠাট্টা তো করেছে। তাই মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মা আমার কান দুখানা কি বেঢপ নাকি? মা জবাব দিলেন, তোর কান দুখানা ঠিক তোর বাবার মতো! বাবাকে তো আমার মনে পড়ে না, আমি যখন একেবারে বাচ্ছা, তখনি তিনি চলে যান...বিয়ের পরে রায়াকে একদিন বললাম একথা। সেতো সেই থেকে ঠাট্টা করতো। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এমনি ঠাট্টা চলেছিল...ওচিঠি খুব কমই লেখে। ওকে আমি জানি। আমার চিঠি লেখার ধাত নেই। ও

তো এখন সার্জেন্ট—তোমাকে বলি ভাই, বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। কিয়েভকে আবার দেখতে চাই। আমরা তো কাছে এসে গেছি…আমার বাড়ির সবাই ওখানে নেই। ওরা অনেক আগেই চলে গেছে। কিন্তু কি শহর ভাই। আমার বড়ই আফশোস ভাই, তুমি আগে কখনো ওখানে যাওনি। গ্রীষ্মে তো চমৎকার!…

ওসীপ স্বপ্নে বিভোর। রোদের ঝলক দেখছে সে চোখে। গীর্জা, রায়ার সাদা পোষাক—তারই উপর রোদের খেলা। কিন্তু এতো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

মিনায়েভ ওলিয়াকে বললে,

চমৎকার লোক ওসীপ। ও কেমন লোক, জানতে আমার বহুদিন গেছে। প্রথমে তো ভাল লাগে নি। বিরক্তিই লাগতো—অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। ওকে কিছু বললেই, ও লম্বা দেড়-গছি, দু-গছি সব উদ্ধৃতি আওড়াতো এ-বই সে-বই থেকে। যদি বাঁধাকপির কথা বললাম তো ও অমনি দ্বান্দ্বিক জড়বাদ আউড়ে দিলে। কিন্তু ওকে যদি শুষ্ক কাষ্ঠ ভেবে থাকতো ভুল করবে। ওর স্বভাবই অমনি।…আমি তো সব কিছুতেই আবেগে নেচে উঠি, কিন্তু ও একটু লাজুক। কচ্ছপের খোলা হয় কেন জান—দেহটা কোমল কিনা তাই…

ওলিয়া বললে, আমার কি মনে হয় জান, লোকটা চমৎকার, শুধু ওর মনে সুখ নেই।

মনে সুখ নেই? কেন?

জানি না। আমার তো মনে হয়…

কিন্তু কাল কেমন খুশি হয়েছিল দেখেছ? যখন তোমার সঙ্গে নাচছিল, আমার পা মাড়িয়ে দিলে। একেবারে চেপ্‌টে গিছলো আর কি…

হাসলো ওলিয়া, তবু বললে,

ও যতই খুশি হোক, ও অসুখী।…

প্রায় দশদিন পরে ওসীপের স্বপ্ন সত্য হোল; ওদের পল্টনকে ঝিতোমিরে

পাঠানো হলো। কিয়েভ দেখলো ওসীপ। ক্রেশচাতিকে এসে সে অবাক হয়ে গেল। যে কিয়েভ-এর কথা এতদিন সে ভেবেছে, সে কিয়েভ আর নেই। বর্ষাঘন অন্ধকারে ভগ্নাবশেষ কালো কালো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বহু ধ্বংসীভূত নগর সে দেখেছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, মহাযুদ্ধের চেতনা। কিন্তু কিয়েভ তো তার কাছে ছিল শান্তির নগরী। সে তার শান্তির ক্রোড় ছেড়েই চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে সেই ক্রেশচাতিকে। তার সামনে বিছিয়ে এক ধ্বংসস্তূপ—কিয়েভ তো নয়।—সেই সর্বনাশা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ।

সে মাকাসারগাস্কী ষ্ট্রীট ধরে চললো—দেখতে চায় তার নিজের প্রিয়জনের আবাস এখনো অটুট আছে কিনা। হাঁ, আছে বই কি। খুশিই সে হোল। সে পড়শীদের দরজায় গিয়ে ঘা মারলো—ইয়াকোভেস্কো—ওদের সে একরকম চেনেই না—তবু ওরাই যেন এখন তার পরম আত্মীয়। ওরা তো ঠিক তার পাশেই থাকতো সেই ,সুখে সুখের দিনে শান্তির দিনে···ইয়াকোভেস্কো ফৌজে ছিল। ছোট মেয়ে নিনোচকাকে জার্মানরা বেগার খাটাতে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু আছেন বৃদ্ধা মারিয়া নিকিফোয়োভনা আর খোঁড়া গ্লাসা। সৈনিকদের উর্দি-পরা লোকটির দিকে চেয়ে মারিয়া নিকিফোয়োভনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ; আলপের্তকে তিনি চিনতে পারলেন না। প্রতিটি সৈন্যই তার স্বামীর কথা তাঁকে মনে পড়িয়ে দেয়।

এই চেয়ারে বসুন। কিছু যে আপনাকে খেতে দেব, তারও উপায় নেই। জার্মানরা দখল করে বসার পর থেকে আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছি।···

ওসীপ যখন নিজের পরিচয় দিলে, তিনি কেঁদে ফেললেন।

কি হোলো ? ওসীপ জিজ্ঞেস করলো।

তোমার মা'র কথা ভাবছি, আহা বেচারী ! ও আমার কাছে এসে বললেন, আমাদের ওরা চালান দেবে।

জানি না, এ শরীরে ধকল সইবে কিনা, বাঁচাবো কি বাঁচবো না, তাই আমার

ঘরদোর জিনিস-পত্রের দিকে আমার ছেলে, ছেলের বৌ ফিরে না আসা পর্যন্ত নজর রেখো।···সত্যি, ঐ পশুগুলোর কি মনে আছে, তখন কি আমরা জানি। পরে নিনোচকা এসে খবর দিলে, ওদের সবাইকে খুন করে ফেলেছে, ছেলেমেয়েরাও বাদ যায় নি। আমার তো বিশ্বাসই হোল না, শেষে সবই শুনলাম। বাবি-আর এর খুনের কথা শুনলে এখনো চোখের জল চেপে রাখতে পারি না গো!···তোমাদের ঘরে ওরা এসে একটা জানোয়ারকে ঠাঁই দিলে, তার খালি নজর কাকে জার্মানীতে চালান দেওয়া যায়। এই তো আমার নিনোচকাকে···

ওসীপ শুনে গেল, কিন্তু তার আর মন বসে না। স্তব্ধ হয়ে সে রইলো। তার মুখখানা এমনিই কঠিন, কিন্তু আজ সে মুখে ফুটে উঠেছে দুঃখ। মারিয়া নিকিফোয়োভোনা সেই মুখ দেখে চুপ করে গেল। গ্রাশা রান্না ঘরে ছুটে গিয়ে ফোঁপাতে লাগলো এবার ওসীপ উঠে পড়ে আস্তে আস্তে বললে,

এবার উঠি।

মারিয়া ভয় পেয়েছে।

কোথায় যাবে? একটু বোসো না···

না, যাই···

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ তার মনে হোল, হয়তো ও সব গুলিয়ে ফেলেছে। রায়া না লিখেছিল, ওরা বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে চলে গেছে···কুলিকোভাদের ওখানে গিয়ে কড়া নাড়লে। এক বুড়ি দরজা খুলে দিলে।

ওসীপ বললে, আমি আলপের্ত। জার্মানরা যখন আসে, তুমি কি এখানে ছিলে?

ছিলাম বই কি। কি সময় গেছে বাছা।

আমার মায়ের খবর জান?

স্বর কেঁপে উঠলো; স্বরে হতাশা। কুলিকোভা ভাবলে, ওসীপ বুঝি তাকে কোনো ব্যাপারে দুষছে।

সে তাড়াতাড়ি বললে,

আমরা কিছু করতে পারিনি বাছা···আমাদের কথা কি তারা শুনতো ?··· এই তো বাছা আমাকেই সদর দপ্তরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। কোনো রকমে তো প্রাণটা নিয়ে ফিরে এলাম। এসে দেখি, সে কি কাণ্ড, আমার বাক্স—প্যাটরা সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে···

আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল তো আমার মা আর খুদে মেয়েটা কোথায় ?

সেদিন সন্ধ্যায়ও বাছা দেখা হয়েছিল, কিন্তু ওরা যখন যায়, তখন আর দেখা হয়নি। এত ভয় পেনু বাছারে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একবার যে গিয়ে দেখে আসব, তাও সাহস হোল না।···

বাবি-আর এ চললো ওসীপ। পথে সে বাড়িগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। গাছপালা, কামানের গোলায় বিধ্বস্ত পথ। মনে করে সে রাখতে চায়, পথটাকে—এই পথে চলে গেল তার মা আর মেয়ে। মন তার ফাঁকা ; এখনো সে তার দুঃখের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে নি। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কানে তালা লেগেছে ; শুধু চলেছে তো চলেছেই, একটা ভাবনা হঠাৎ ঝলক দিয়ে গেল মনে ; উঃ, এই লোভোভ ষ্ট্রীটটা কত লম্বা! সে জানেনা, তার মার মনেও এই কথাটাই উদয় হয়েছিল সেই মৃত্যু যাত্রায় আলিয়েনকার সঙ্গে যেতে যেতে তিনি ভাবছিলেন—কত দীর্ঘ—দীর্ঘ এই পথ!

কেউ নেই। হঠাৎ একটা ভাঙাচোরা বাড়ি থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। তার চোখ দুটো মাতালের মতো। ওসীপ তাকে ডেকে শুধালে,

বাবী-আর কতদূর ?

এই তো কাছেই। ডান দিকে যাও, গেলেই পাবে। তোমার বুঝি ওখানে আত্মীয়-কুটুম আছে।

কত সেপাই যে এখান দিয়ে গেল, সবাই জিজ্ঞেস করে···কিন্তু ওখানে গিয়ে তো কিছু দেখবে না।

জার্মানরা যখন বেগতিক বুঝলে, ওরা একগাদা বন্দীকে এনে তাদের দিয়ে

সব জমি খুঁড়িয়ে একটা চিহ্ন পর্যন্ত রাখলে না। লাসগুলো দিন রাত ধরে পুড়তে লাগলো। পোড়া গন্ধে দম নেবে কার সাধ্য। স্তাভাৎ, তোমার কাছে একটা সিগ্রেট আছে?

বাবী-আর এ এসে সে পৌঁছলো। কোথাও এখনো উৎরাই-এর গভীর খাদ আর নেই। সব খাদ বুজানো।

বালি-আর ছাই, ছোট ছোট পোড়া হাড়। মা বাজারের থলে নিয়ে এসে বলতেন, আলীয়া, তোর জন্যে গোলাপ জাম এনেছি। তুই তো গোলাপজাম খুব ভালবাসিস-তাই না?...থিয়েটারের উলটো দিকে কি চমৎকার একখানা বাড়ি করেছিল···আলিয়াকে সে বলেছিল, তোকে মস্কৌ থেকে একটা ভালুক এনে দেবো। আলিয়া জিজ্ঞেস করলে, কামড়াবেনা তো? বন্ধুর দল, চেনাশুনা মানুষ চারদিকে ছিল, এখানেই সে বেড়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে বসবাস করেছে···ওসীপ হাঁটুটা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, ঠাণ্ডা, ভিজে বালিতে মুখ গুঁজে দিয়েছে।

আঁধার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু সে তো উঠতে পারছে না। এ পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারছে না। এখন তার রায়ার কথা মনে পড়ছেনা। রায়া ভালোবাসে বলেই মিথ্যে করে বলেছে। এ তার সাদা মিথ্যা কথা—নিজে সে সমস্ত দুঃখের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছে– ওসীপের মনের শান্তি নষ্ট করেনি···কত দিন ধরে তো এক সঙ্গে আছি; অথচ ও কেমন মেয়ে বুঝতে পারি নি। ও যখন সীমান্তে চলে গেল, আমি অবাক হয়ে গিছলাম। সৈনিকের জীবন কি মৃত্যুকে ডরায় না। ওর দৃঢ়তার তো অবধি নেই। ও আমাকে আলিয়ার কথা লিখলে। ওর মার মন সেদিন কি ভেবেছিল কে জানে?···আমি বরং চিঠিতে লিখে ওর দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিলাম। লিখলাম, ওরা গেছে ভালই হয়েছে। ওখানে তো সবাইকে ওরা খুন করেছে। তারপরে আলিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম, ও কতো বড়ো হয়েছে জানিও···

ওসীপ ভাল লেখক বা বক্তা নয়, ওর মনের কথা ব্যক্ত করতে জানে না; বহুদিন আগে যখন ওরা স্তালিনগ্রাদের কাছে ছিল, একদিন নিজেকেই নিজে

জিজ্ঞেস করেছিল, কেন আমি মিনায়েভের কুকুর ছানাটার মতো বোবা হয়ে থাকি। ও ও হয় তো অনুভব করে, কিন্তু বলতে পারে না। দুদিন পরে সে রায়াকে লিখলে ঃ

রায়া, আমায় প্রিয়া, রায়া,

তোমাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করছি বলে রাগ কোরো না। এখন আমি সব জেনেছি, বাবী-আর এ আমি নিজে গিছলাম। লিখলেও তুমি বুঝতে পারতে কি গভীর দুঃখে আমরা দুঃখী। রায়া, আমাদের দুজনকে এই দুঃখের ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে হবে। কথায় তো এ দুঃখ কমেনা। আমি তোমার হাত ধরতে চাই রায়া, বলতে চাই—আমরা দুজনে আজ একা—এক ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেছে জীবনে—তবু তুমি আর আমি বাঁচবো—কিছুই ভুলবোনা—ভুলবো না—এই ভয়ংকর স্মৃতি জীইয়ে রাখব আমাদের মনে। তোমার চরিত্রের দৃঢ়তার আমি পরিচয় পেয়েছি রায়া। আজ আবার আমরা রওনা হব সীমান্তের দিকে। জানি না, কিয়েভ এ কত লোক খুন হয়েছে। লোকে বলে সত্তর হাজার। হয়তো তাই হবে। কিন্তু সংখ্যা তো এখানে তুচ্ছ—ওরা মানুষকে হত্যা করেছে। ওদের ক্ষমা নেই! প্রিয়া, তুমি দৃঢ় হও! বাবী-আর এ যা দেখে এলাম, তারপরে তো শব্দের লাজুকতা আর আমার নেই। আমি বলতে চাই, তুমি আর আমি চির দিনের জন্য বাঁধা পড়লাম—ওসীপ এ বন্ধন তো মৃত্যুর চেয়েও অমোঘ, মৃত্যুর চেয়েও দৃঢ়।

মিনায়েভ ওসীপকে দেখে বুঝলো, কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। ওসীপ চুপচাপ। সাতদিন পরে যখন ওসীপ আর মিনায়েভ পরিদর্শনে বেরুল (জার্মানরা একটা গোটা বাহিনী নতুন আমদানী করেছে, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তারা তুমুল সংঘর্ষের জন্য তৈরী), ওসীপ বললে

আমার মা আর আলিয়া…বাবী-আর এ…

মিনায়েভ নিঃশব্দে ওসীপের হাতখানা চেপে ধরলো। আর ও কথা উঠলো না।

সপ্তাহ ভোর আর ওকথা নিয়ে ভাববার সময় পেলনা ওসীপ। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মনে হয়, জার্মানদের রণোন্মাদনা বুঝি আবার জাগ্রত। তারা উনিশশো একচল্লিশ আর বেয়াল্লিশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বোলো-গোরোদ আর দোনেৎ অঞ্চল থেকে যারা পিছু হটে এল তাদের কি আবার ও যুদ্ধ করা চলে! জার্মান সামরিক বিভাগ তাই ছিন্নভিন্ন বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে পশ্চিম থেকে আমদানী বাহিনীকে দিয়েছে সামনে এগিয়ে। কার্স্ক-এর যুদ্ধে, জার্মানদের প্রেরণার মূলে ছিল শার্দূল আর ফার্ডিন্যাণ্ড বিমান। কিয়েভ উদ্ধার করে ওরা তুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিল যে, লাল ফৌজের সাফল্য আকস্মিকতা ছাড়া কিছুই নয়।

জার্মান প্রতি আক্রমণ শুরু হোল সাফল্যের সঙ্গে; তুমুল যুদ্ধের পর, জার্মানরা ঝিতোমীরে ঢুকে পড়লো, তারপর এগিয়ে চললো কিয়েভ-এর পথে। বিভাগীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল জাইফভ, ওসীপকে হুকুম দিলেন সদর সড়ক আর প্রধান রেল পথ রক্ষা করতে হবে। জেনারেল বললেন, আসল হচ্ছে, ট্রেঞ্চের যন্ত্রপাতিগুলো···

পল্টনের প্রধান দপ্তর তাড়াতাড়ি খোড়া ট্রেঞ্চে বসানো হোলো।

একটা উঁচু টীলার ঢালে ট্রেঞ্চটা।

ওসীপ য়্যাড্‌জুটাণ্টকে ডেকে বললে, আমাকে লিওনিজকে ডেকে দাও!

কিন্তু লিওনিজ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হোল না। মিনায়েভ জবাব দিলে, এ অঞ্চলে এখনো সব চুপচাপ আছে, শুধু ওরা এখনো টীলাটার উপর গোলা চালাচ্ছে। ওরা যেন ক্ষেপেই গেছে···পলিশচুক-এর সঙ্গেও যোগসূত্র নেই। একজন সিগন্যালমান হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এসে জানালে, জার্মানরা ট্রেঞ্চের কাছে এসে পড়েছিল, কিন্তু তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন নম্বর পল্টন এখনো খাড়া। সকাল ন'টার ভিতরে এই ঘটনা ঘটে গেল, সওয়া দশটায় এল সাতখানা শার্দূল। তারা টীলার সদর দপ্তরের উপর উঠে এল। গোলাগুলী ফেটে পড়তে লাগলো চারদিকে। বারবার ওসীপ উঠে পড়ে ঘুরে ঘুরে দেখলে,

সবাই ঠিক জায়গায় মোতায়েন, আছে। বিভাগের অধ্যক্ষ তাকে ফোনে ডাকলেন।

জাইকভ চেঁচিয়ে উঠলেন, তোমার ওদিকে কি ব্যাপার?

টিকে আছি, বাধা দিচ্ছি। ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক চলে এসেছে। লিওনিজের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। আর আছে সাতটা 'টাইগার,। 'কাটুশা'দের ওদের পিছনে লেলিয়ে দিতে হবে···

দুটো 'টাইগার' চুরমার হয়ে গেল, বাকিগুলো চলে গেল ডান দিকে—পলিশচুকের বিরুদ্ধে ছুটলো। তিন নং বাহিনী পেছু হটেছে, ট্যাঙ্কের পিছনে জার্মান পদাতিক বাহিনী। মিনায়েভকেও পেছু হটতে হোল। দিনের শেষে দুটি পণ্টন ঘেরাও হয়ে গেল, কর্মচারীরাও বাদ পড়লো না। ওসীপের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো! ঠিক যেন উনিশ শো এক চল্লিশ সাল এসে গেছে—তবে এক পণ্টনের বদলে দু-দুটো পণ্টন তাকে চালাতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা ওরা টিকে রইল। ওসীপ একটু মাথায় চোট খেলে, মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে, গা বমি বমি। ট্যাঙ্কের আক্রমণ প্রতিহত করা হোলো আগুনে বোতল দিয়ে। দিনের শেষে জেনারেলের পাঠানো একদল গোলন্দাজ এসে পৌঁছতেই মিনায়েভ-এর দল কোনো রকমে সদর ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির। ওসীপ ছুটলো লিওনিজের এলাকায়, সৈন্যদের একটু চাঙা করে তুলতে হবে। পরদিন সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে একটা ছোট গ্রাম দখল করে নিলে। দিনটা তবু যা একটু শান্ত, জেনারেল জাইকভ ওসীপকে ডেকে পাঠালো। ওসীপ সব খবরই দিলে—একে একে সবগুলিই আবার দখল হয়ে গেছে, শুধু পলিশচুককে একটা খামার বাড়ি এখনো দখল করতে হবে। একটু উঁচু জায়গায় বাড়িটা, পলিশচুকের ক্ষতিও কম হয় নি। সংরক্ষিত ফৌজ যদি···

কি হয়েছে তোমার, জেনারেল হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, তোমাকে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে···

মাথায় চোট পেয়েছি, তেমন কিছু নয়।

তোমার ঘণ্টা দুয়েক একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার

না, আমাকে পলিশচুকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

দাঁড়াও, আগে কিছু খেয়ে নাও।

জেনারেল ভোদ্‌কা ঢেলে দিলেন, ক'টা মস্ত চীনেমাটির পেয়ালার তলাটা ভর্তি করে দিলেন, ঢালতে ঢালতে হঠাৎ চেয়ে দেখেন ওসীপ ঘুমিয়ে গেছে। মানুষগুলোর ওপর দিয়ে কি ধকলই না গেছে! জেনারেল আর টু শব্দটি করলেন না; তিন রাত তার ঘুম হয় নি। কিছুক্ষণ পরে সে লাফিয়ে উঠে মাথাটায় একবার ঝাঁকুনি দিলে, এবার চললো পলিশচুকের সঙ্গে দেখা করতে।

মিনায়েভ, তোমার ওদিকের খবর কি?

খারাপ নয়। যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলবে মনে হয়···

আরো চার দিন ধরে চললো যুদ্ধ—আক্রমণ আর প্রতি-আক্রমণের পালা। তার পরে সব শান্ত হয়ে এল, জার্মানরা কিয়েভের আশা ত্যাগ করলে। ওসীপ পুরো ছটি ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠলো। উঠে বরফ-ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে—বরফ পড়া শুরু হয়েছে, হঠাৎ সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো—রায়ার কাছ থেকে চিঠি এল না কেন? সে তাকে লিখলে—বেঁচে আছি, ভাল আছি—তোমার চিঠির প্রতীক্ষায় রইলাম—এখন আমার সমস্ত জীবন তোমাকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।

আঠারো

কর্নেল সুমার বললেন, ডাকাতগুলো এখন আমাদের নাগালের বাইরে, ওরা দু'হপ্তায় চার-চরটে ট্রেণ উড়িয়েছে···জানিনা হঠাৎ ওদের সাহস বাড়লো কিসে—কমিসানার জেনারেলকে খুন করে সে, লাল ফৌজের অভিযানের সাফল্যে যাই হোক, ওরা সেই হেমন্তকাল থেকেই জ্বালাচ্ছে,

শার্কে বললে, আমাদেরও দোষ আছে। দশ মাস তো এখানে আছি, আর রোজই শুন্‌ছি, রুশদের সঙ্গে ভদ্রতা-মাফিক চলার দরকার নেই। অবশ্য, আপনি বুঝতেই পারছেন, ভদ্রতা বলতে যা বোঝায় তা নয়। ফ্রান্সে আমাদের কাজটা সোজাই হয়েছিল, কিন্তু এখানেও তো একটু চেষ্টা করতে হবে। রুশদের মন তো নয় যেন গহন বন, বন পার হয়ে যেমন যাওয়া যায়, আবার পথ-হারানোর ভয়ও আছে। হের কর্ণেল, আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তো, আমার পরিকল্পনা আপনাকে শোনাতে পারি···

সে ব্রিক-কেস থেকে একখানা লেখা কাগজ বার করে পড়তে লাগলো। খুদে খুদে লেখায় ঠাসা কাগজখানা। স্থুমার অন্য মনস্ক হয়ে শুনছেন, মনে তার ভাবনা! শার্কে লোকটা কে? মেজরের পদবী, কিন্তু তা ছাড়া ও কি আরো কিছু। কুব্‌, ওর মুরুব্বী। বেচারা হাইনৎস্‌ ওকে 'প্রতারক' বলেছিল, তার ফলে ওকে বদলী হতে হয়। শার্কে নিজে অতি বিনয়ী; সে বলে, আমি সামান্য একজন কর্মী, হয়তো ওর হিমলারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।···যাই হোক, ওকে তুচ্ছ করা ঠিক হবে না। একটু বা তারিফই করতে হবে। শার্কে পড়া শেষ করতেই কর্ণেল বললেন,

আমার মতে, এখানকার পক্ষে এটা যেন বড় বেশি সূক্ষ্ম। আপনার এই পরিকল্পনা দেখলেই মনে হয়, বহুদিন আপনি ফ্রান্সে ছিলেন। যাহোক, চেষ্টা করে দেখুন হের্ মেজর, আপনার উদ্যমের আমি প্রশংসাই করি···

শার্কে সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করছে। পরিস্থিতি এনেছে হতাশা, বার্তির সঙ্গে দ্বিপ্রহরিক ভোজের কথা মনে পড়ে তার হাসি পেল! এখন তো ঐ বর্বরগুলোকে ভয় দেখাবার কাজ পেয়েছি, বেহালা দিয়ে কি আর পেরেক ঠোকা যায়!···কিন্তু অভিযোগ তার নেই। পরিস্থিতি ভয়ংকর। লালফৌজ অভিযান শুরু করেছে, ন্যাশনাল সোশালিজমের ভাগ্য রাশিয়ায়ই স্থির হয়ে যাবে। ঐ মেয়েলি হুবার্ট, ঐ স্থুমার—ওরা ভাবছে আত্মরক্ষার কথা;—ওরা যে কোনোমুহূর্তে ইংরেজদের সঙ্গে আপসোস করতে রাজী। কিন্তু তৃতীয় রাইক বাঁচলে আমি বাঁচবো···

চতুর, বুদ্ধিমান শার্কে, কিন্তু তবু তার মনের পরিধি বড় সংকীর্ণ। যখনি জটিলতা দেখা দেয়, কূট পাকচক্রের খেলা চলে, তখনি তার বুদ্ধির পরিচয় সে দেয়, ভীষণ প্রত্যুত্তরে সে শানিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মনটা তার কঠোর, স্থূল—পাথর। তাঁর কাছে ফুরারের বক্তব্য মানুষের ভাবনার অভিব্যক্তি নয়।—আদেশ। পারীতে জার্মান শাসন কায়েম করবার জন্যে সে অভিজাত রেস্তোরাঁগুলিতে ঘুরে বেড়াত, নিভেলের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা করতো—স্বচ্ছন্দ, অবাধ, উচ্ছৃঙ্খল ছিল সে কিন্তু এখানে কুঁড়ে ঘরে কাটাচ্ছে দিন, সেখানে বিছানায় ছারপোকা, আলু খাচ্ছে, শহর চুঁড়ছে, ক্যাথলিক গীর্জায় যাচ্ছে—যদিও তার ছাড়পত্রে আছে সে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট। সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। সে চায় শৃঙ্খলা কায়েম করতে—কিন্তু কতগুলো নির্বোধ তাকে বাধা দিচ্ছে।

কর্ণেলের সঙ্গে কথা বলে একটু সে খুসিই হোলো। বহুদিন থেকেই সে বলে আসছে, লিথুয়ানিয়া থেকে একদল পুলিশ আনানো হোক, কিন্তু এরা গ্রাহ্য করে নি। এবার সে পরিকল্পনা কাজে খাটানো যাবে।...

সে একজন ছোকরা পুলিশকে দেখে বললে,

এখানকার মেয়েদের তোমার কেমন লাগে?

ভয় পেয়ে পুলিশটি বললে, আমি ওদের কোনোদিন ছুঁয়েও দেখি নি কর্তা।

তুমি একটা বোকা! সব চেয়ে সুন্দর মেয়েকে খুঁজে বার করে টেনে-হিঁচড়ে বাড়ি নিয়ে যাও। যাও, আজকেই তাই কর।

একটু সবুর করলেই ভাল হয়...

তাহলে আমি তোমাকে হুকুমই করছি। আজ রাতে একটা মেয়েকে টেনে নিয়ে আসবে।

কি—ঠিক তো?

শহরের বাসিন্দেরা প্রমাণ পেল যে জার্মানরা ন্যায় বিচার জানে। যে ছোকরা পুলিশটা একটা মেয়েকে অপমান করেছিল, তাকে বাজারে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হোলো। শহরের প্রধানের সঙ্গে আলাপ করতে করতে শার্কে জানালে—

এখানে যত অত্যাচার হয়েছে, তা জার্মানরা করেনি—করেছে স্থানীয় পুলিশ।

মিনস্ক-এ শার্কে কাপড়-চোপড়-নানা জিনিসপত্র সরবরাহের বন্দোবস্ত করলে। স্থানীয় দোকানগুলি ভরে উঠলো রকমারি জিনিসে। দুটো লোক এক চাষী বৌয়ের কাছ থেকে হাঁস চুরির দায়ে ধরা পড়লো। শার্কে বাইলো-রুশিয়ার ভাষায় ডজনখানেক কথা মুখস্থ করে নিয়ে শহরের এক সভায় বক্তৃতা দিলে। সেই সভায় সে প্রতিশ্রুতি দিলে শহরবাসীর শান্তি জার্মানদের কাম্য। ভবিষ্যতে তাঁদের পোষাক আর জুতো পাবারও সম্ভাবনা আছে।

এবার আসল কাজে নেমে পড়লো শার্কে—নালিবক বন এবার সাফ করতে হবে। এই বনে যে শুধু প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা আছে তা নয়, এখানে বহু পোল এসেও জমা হয়েছে। এরা লণ্ডনের পোল সরকারের লোক। শার্কে বহুদিন থেকেই পেড়াপীড়ি করেছে যে, এদের সঙ্গে একটা চুক্তি করা হোক, কিন্তু হুবার্ট ভয়ই পেয়েছে। এখন তো কর্ণেল শার্কে সে অধিকার দিয়েছেন। 'লণ্ডনবাসী'-দের এক প্রতিনিধির সঙ্গে শার্কের দেখা হোলো এক বন-রক্ষকের কুটীরে।

শার্কে বললে, আমাদের উপর আপনাদের কোনো অনুরাগই থাকতে পারেনা, আর আমিও তেমন প্রেমের প্রস্তাব নিয়ে আসিনি। নিজেদের বোকা বানিয়ে লাভ কি? কিন্তু এতো জানি, রুশদের আপনারা ঘৃণা করেন। তাই প্রস্তাব করি, আসুন আমরা একটা চুক্তি করি—সাময়িক ভাবে আমরা বিরোধ স্থগিত করলাম। আপনারা তাহলে এই এলাকা থেকে লাল ফৌজদের তাড়িয়ে দিতে পারবেন।

আট ঘণ্টা পরেই চুক্তিতে সই করা হোলো। পোলদের শহরে এসে জিনিস-পত্র কেনাকাটার সুবিধে দেওয়া হোলো, কিন্তু তারা একমাত্র দিনের বেলায়ই আসতে পারবে। তাও দশজনের বেশি নয়।

দুই দলই এখন মিলে মিশে লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। শার্কের এই প্রথম বিজয়।

স্থানীয় বাসিন্দেদের ভিতরে শার্কে একমাত্র ডেপুটি মেয়র ভাসিলেঙ্কোকেই বিশ্বাস করে। তিরিশ বছরের উপরে তার বয়েস, অবিবাহিত সে, চোরা কারবার করে, আবার প্রেমের কবিতাও লেখে। সোবিয়েৎ শাসন বসার পর বাইলো রুশিয়ার পুরানো কাহিনী নিয়ে সে এক নাটক লিখে প্রতিযোগিতায় দেয়। জার্মানরা আসার পরেই সেই আবার গিয়ে সদর দপ্তরে হাজির হয়। একজন জার্মান কর্মচারী তাকে জিজ্ঞেস করে, লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা কি তোমার উপর অত্যাচার করেছে। ভাসিলেঙ্কো জবাব দেয়, শারীরিক অত্যাচার করেনি, কিন্তু আমার আত্মার উৎপীড়ন চলেছিল। আমি একজন আদর্শবাদী মানুষ।

শার্কে ভাসিলেঙ্কোকে ডেকে বললে, আমি একজন এমন লোক চাই, যার নামে কোনো নিন্দে নেই। তাকে আমি প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের কাছে পাঠাতে চাই।

অনেক ভেবে ভাসিলেঙ্কো এক ডাক্তারের সহকারীর নাম বললে। পাশা কুটাস তার নাম। মস্ত জোয়ান, কিন্তু এতই নিরীহ যে লোকে ঠাট্টা করে বলে, ও নাকি কর্ণেলে স্থমারের কুকুরটাকে দেখেও সেলাম বাজায়, কুটাসকে সেই রাতেই গ্রেফতার করে এনে খুব পিটুনি দেওয়া হোলো। পরদিন তাকে হাজির করা হোলো শার্কের কাছে।

সে প্রতিবাদ জানালে, আমি তো কোনো দোষ করি নি।

হয়তো সত্যিই বলেছ, কিন্তু গেষ্টাপোরা তোমাকে ধরে এনেছে, আমি তো কিছুই করতে পারি না। তবে একটা ফন্দি বাতলাতে পারি মাত্র···নালিবক বনে যাও, প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের গিয়ে জানাও, এই অত্যাচার আর তোমরা সহ্য করতে পারছনা, আমরা ওদের শক্তির একটা আঁচ করে নিতে চাই, ওদের বিমান-সংকেতও আমাদের জানা দরকার—জেনে আসতে পারলে, আমি তোমাকে দশহাজার রুবল পুরস্কার দেব, আবার ছেড়েও দেব।

কুটাস বললে, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

ওরা তোমাকে আদর করে ডেকে নেবে—তোমার বেশ ভাল লোক

বলে নামডাক আছে। তোমার সার্টটা খুলে দেখিয়ে দিও গেষ্টাপোরা কি করেছে, তা ছাড়া, আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব না, তুমি পালিয়ে যাবে, আমরা কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব! তোমাকে ধরতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে…

কুটাস চুপ করে রইল, শার্কে আপন মনে ভাবলে, ভাসিলেঙ্কো ওর কথা বললে কেন? ওর মতো চোখ আমি কখনো দেখিনি—যেন ভেড়ার চোখ… অবশেষে কুটাস রাজী হোলো।

শার্কে তাকে বললে, কিন্তু একেবারে ওদের দলে গিয়ে ঢোকার ফন্দি কোরোনা! আমি তোমার একটা স্বীকারোক্তি রেখে দিচ্ছি, যদি বিশ্বাস-ভঙ্গ কর, আমি কাগজখানা সোবিয়েৎ কমিশারের কাছে পাঠিয়ে দেব…

সপ্তাহ কেটে গেল, শার্কে কুটাসের কাছ থেকে খবর পাবার প্রতীক্ষায় রইল। 'লণ্ডনবাসী'রা জানালে, বোলশেভিকদের সঙ্গে ওদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। তাতে ছ'জন বোলশেভিক নিহত। শার্কে খুশি হয়ে উঠলো, শুরুটা মন্দ নয়, কিন্তু তবুও হতাশা এল। কিয়েভ-এর উপর পালটা আক্রমণে সুবিধে হোল না। বোলশেভিকরা এখন ভিতেবস্ক-এর কাছে, দক্ষিণে তুমুল লড়াই চলছে। হান্স লিখেছে, ফরাসীরা এখন উদ্ধত, মিত্রশক্তির অবতরণের প্রতীক্ষা করছে। সন্ত্রাসবাদীরা সর্বত্র সক্রিয়, আমাদের পরীক্ষার দিন আসছে।…

প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা শহরের বাইরে এক সরবরাহকারী দলকে আক্রমণ করলো, একজন দস্যু ধরাও পড়লো। বহুক্ষণ ধরে তার জেরা চললো, কিন্তু কিছুই বার করা গেল না। কর্ণেল শার্কেকে বললেন,

ওকে ফাঁসিকাঠেই ঝোলাতে হবে, ওকে দেখলাম, একেবারে বাচ্চা, ও নিজে বলে, ও ছাত্র, সাধারণ মানুষ।

শার্কে বললে, আপনার আপত্তি না থাকলে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব, জেরা করবো না, জেরা করে গেষ্টাপোরাই কিছু যখন বার করতে পারেনি, তখন আমি আর কি করবো…আমি এই দস্যুদের বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই।

সুমার জবাব দিলেন, আমার আপত্তি নেই। পরে তিনি হুবার্টকে হাসতে হাসতে বললেন, শার্কে বোধ হয় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে, ব্যবসা নিয়ে জীবন শুরু করেছে, মনস্তাত্বিক নভেলে গিয়ে শেষ করবে। একেবারে দস্তায়িভেস্কী আর কি···

শার্কের কাছে বন্দী এল, সে ছাত্র, নাম সে বলতে চায় না, গেষ্টাপোদের কাগজপত্রে তাকে 'ইভান' বলা হয়েছে, শার্কে তার আত্মবিশ্বাস আর ঔদ্ধত্য দেখে চমকে গেল।

বোসো যদি সিগারেট খেতে চাও, এই নাও, শত্রুর কাছ থেকে যদি সিগারেট নিতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে নিওনা। আমি তোমাকে জেরা করতেও চাইনা। শুধু তোমার সঙ্গে দু-একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। কে জানে আমাদের আদর্শ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা—এ নিয়ে হয়তো আমার মনেই সন্দেহ আছে। যদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে তোমার ইচ্ছে না হয়, দিওনা। আচ্ছা বল তো, আমাদের তোমরা ঘৃণা কর কেন?

জবাব দেওয়া শক্ত নাকি? বন্দী হাসলো। যে কোনো শিশুও এ জবাব দিতে পারবে। তোমরা এখানে এসেছ বলেই আমাদের ঘৃণা···

তা যুদ্ধের সময়ে তো দুপক্ষের এক পক্ষ এক দেশ থেকে আর-এক দেশে চড়াও হবেই।

তোমরাই যুদ্ধ শুরু করেছ···

আমরা তো মনে করি, তোমরাই প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছ। আমরা তো তোমাদের উপরে টেক্কা দিয়েছি। যদি তোমরা জেত, তোমরা বলবে, এ যুদ্ধ শুরু করেছে জার্মানরা; আর যদি আমরা জিতি, তোমাদের আমরা স্বীকার করিয়ে নেব, এ যুদ্ধ তোমরাই শুরু করেছ, কিন্তু এসব কথা থাক। আমি অন্য কথাই ভাবছি। এক বিরাট সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তোমাদের দেশে এসেছি, এতো প্রমাণিত হয়ে গেছে; আদিম যুগের বাড়িগুলোতে যেটুকু সুখ সুবিধে ছিল, তোমাদের বাড়িগুলিতে তাও নেই, একথাও আমরা

জেনেছি। জাতির কথা তোমরা না আসতে পার, কিন্তু যা সত্যি তা তো অস্বীকার করতে পারবে না—আমরা তোমাদের চেয়ে ঢের ঢের বড়। কি, চুপ করে আছ যে?

আমি কি বলবো? গতকাল তোমারই দেশের মানুষ, ডগডগে লাল লোহা দিয়ে আমাকে সারা-গায়ে দেগে দিয়েছে। এই তো তোমাদের সংস্কৃতির প্রমাণ।

তোমার এই ঔদ্ধত্য তোমার মনের সংকীর্ণতা থেকেই এসেছে। শুধু একটা জিনিসই জান—সে ঘৃণা।···

না, শুধু তা নয়···

আর কি?

শার্কের দিকে সোজা তাকিয়ে 'ইভান' বললে.

আর আছে অবজ্ঞা।

জবর মজার ব্যাপার তো···কিসের উপর তোমাদের অবজ্ঞা? গেষ্টাপোর পদ্ধতির উপর?

না, শুধু তাই নয়, তোমাদের মতবাদ, তোমাদের ভোগবিলাস, সব কিছুরই উপর আমাদের অবজ্ঞা।—প্রতিটি ব্যক্তির উপরও অবজ্ঞা।

উদ্ধত যুবক! আমি বুঝি, কেন তোমার এই ঔদ্ধত্য—তোমার কিছু হারাবার ভয় নেই।···শত্রুকে অপমান করতেই তুমি চাইছ। এই তো আমি একজন জার্মান তোমার সুমুখে বসে আছি। তুমি বলছ, তুমি আমাকে ঘৃণা কর। কিন্তু কেন আমি যুদ্ধ করছি, একথা তুমি জান?

নির্বোধ বলেই হয়তো যুদ্ধ করছ—তুমি হুকুমের চাকর, হুকুম মানছো, কিন্তু তোমাকে বোকা মনে হয় না, বরং পাজি বলেই মনে হয়। হয়তো লোভে পড়ে যুদ্ধ করছ—তোমার দেশে তুমি হয়তো কাপড়-চোপড় বিক্রি করতে—এখানে এসে তুমি হয়েছ সর্বশক্তিমান ভগবান। হয়তো তোমরা ভাবছ, জার্মানী অন্যসব দেশের চেয়ে সেরা।

তোমরাও যেন তা মনে কর না, সোবিয়েৎ রাশিয়া অন্যসব দেশের চেয়ে সেরা!

আমি তোমাকে পাজি ভেবে ভুলই করেছি, তুমি পাজি আর বোকা দুই-ই। আত্মতুষ্টির সঙ্গে আত্মোৎসর্গের তুলনা কি করে করবে? আমাদের আদর্শ আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বড়, আমাদের দেশও যে বিরাট একথাও তোমারা জান, কিন্তু তার চেয়েও বিরাট, উদার আমাদের আদর্শ।

তোমাদের আদর্শের পরিধির মূল কোথায়—তোমাদের ঔদ্ধত্যে কি?

জবাবটা সহজ। তোমরা কাদের জুটিয়ে এনেছ? পাজি, বদমাস, মাতাল আর লক্ষ্মীছাড়ার দল।

তোমরা নিজেরাই তো বুঝতে পার। এমন কি সামরিক উৎসবেও ওদের তোমরা বার কর না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছেন থেলমান। আমার তো মনে হয়, অমন জার্মান আর দুটি নেই। আমি তো তাঁকে ঘৃণা করি না, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি জার্মান হলেও আমার পূজ্য। আর তোমাকে আমি জার্মান বলে ঘৃণা করি না, তুমি ফ্যাশিষ্ট বলেই আমার ঘৃণা।

শার্কে হাত নাড়লো, বন্দীকে নিয়ে যাবার সংকেত।···আলাপে সে বিরক্তই হয়েছে।···অমন লোকের মতবাদ বদলানো যায় না···এ এক জীবন-মরণ সংগ্রাম শুরু হয়েছে··· হয় আমরা, নয় ওরা টিকে থাকবে। কর্ণেল স্নুমারকে পরে সে বললে,

কি আপসোস বলুন তো কর্ণেল, আমাদের বিসমার্কবাদীরা তখন হাজির ছিলেন না। ওঁরা তো এখনো ভাবেন, বোলশেভিকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হতে পারে।···ওকে ফাঁসি লটকাবেন তো!

হাঁ, তাই করতে হবে···

অমন লোককে গুলী করে মারাই উচিত···

নিজেই সে জানে না, কখন লোকটা তার মনের উপর দাগ কেটে দিয়েছে। কিন্তু কর্ণেল যখন জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে গুলী করে মারাই উচিত কি বলেন? শার্কে যেন চেতনা ফিরে পেয়ে বললে, না, তার চেয়ে ফাঁসি লটকানোই ভাল—এতে মানুষকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দেওয়া হবে।

সে রাতে শার্কের ভাল ঘুম হোল না ; ভবিষ্যতের কথাই ভাবলো, অসংলগ্ন, বিষন্ন চিন্তাধারা—এ যেন শিরার ব্যথার মতো। জার্মানীর দিকে বয়ে চলেছে ঝড়—সে ঝড় যেন অনুভব করা যায়।

উনিশে ডিসেম্বর ইভানকে ফাঁসি দেওয়া হোলো।

চব্বিশে তারিখ সন্ধ্যায় শার্কে কর্ণেল স্নুমারের সঙ্গে ভোজ খাচ্ছিল। একটা ফার ছোট ছোট নিশান আর তুলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। কর্ণেলের আর্দালী একটা হাঁস ভাজা করেছে। হুবার্ট এনেছে কোথা থেকে এক গ্রামোফোন। লিনডেন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে কুমারী—এই গান শুনে শার্কের মনে হোল গলা আপনা থেকে বুজে আসছে আবেগে···তার মা গাইতেন এই গান ···শার্কে একটু ভাববিলাসী···ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, বইয়ের পাতার শুকনো ফুল, অর্গানের সুর, সূর্যাস্ত—সব কিছুতেই তার চোখে জল ঝরে। এখন তো মদের ঘোরে বিষাদ তাকে পেয়ে বসেছে, গান আর স্মৃতি তাকে উদ্বেল করে তুলেছে। সে চোখ বুজলো ঃ মন শূন্যতায় ভরা···

বিস্ফোরণটা সাংঘাতিকই। কর্ণেল স্নুমারের একখানা হাত উড়ে গেল। হুবার্ট হত হলেন, শার্কের গায়ে কটা আঁচড় লাগলো। পথে গুলীর শব্দ। শার্কে যখন ছুটে বাইরে এলেন, দেখলেন দরজায় শান্ত্রীটা মরে পড়ে আছে। চেঁচাতে শুরু করলো সে, একজন সৈন্য ছুটে এল। সেও ভয়ে অভিভূত। সে শুধু বলছে ডাকাত, ডাকাত !···ব্যারাকগুলি শহরের প্রান্তে···সেখানে বড় দিনের উৎসব করছিল সবাই। একঘন্টা কেটে গেল গোলমালে, শার্কে এবার জানতে পারলো, কি হয়েছে। নালিবক বনের প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা শহরে এসে হানা দিয়েছে। প্রথমে তারা শান্ত্রীদের খুন করে, তারপর কর্ণেলের বাড়ির উপর বোমা ফেলে। পরদিন ভোরে শার্কে খবর পেল, প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের সঙ্গে ডেপুটি মেয়র ভাসিলেঙ্কো চলে গেছে। পাশা কুটাস-এর কোনো খবর নেই।

শার্কে তার ছেলেকে লিখলে, এখানে এখন পরিস্থিতি জটিল, কিন্তু তব

এখনো আমার বিশ্বাস, জয়লাভ আমাদেরই হবে। ফ্যুরার আর জার্মানীর জন্য আত্মোৎসর্গ করতে হবে হানস্। তার জন্য প্রস্তুত হও!

উনিশ

বিশটা জার্মানকে ওরা খতম করে দিলে, কিন্তু নিজেদের পল্টনের একজনও হত হোলো না, কর্ণেলের বাড়ি উড়ে গেল, বহু অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ পাওয়া গেল। একটু কগ্ন্যাক টেনে ভাসিলেঙ্কো বললে, যখন যুদ্ধ শেষ হবে, আমি প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের নিয়ে একখানা নাটক লিখে ফেলব, তাতে একটা জার্মানও থাকবে, দেখো, শার্কের ছবি তাতে কেমন আঁকি!··হ্যাঁ, নাটকখানা লিখবোই, আবার প্রতিযোগিতায়ও পাঠাব।

ডালিয়া হাসলো,

আমি যাতে একজন বিচারক হতে পারি, তার জন্যে পেড়াপীড়ি কোরো—তাহলে প্রথম পুরস্কারটা তোমার ঠেকায় কে ··

ভাসিয়াই কর্ণেলের বাড়ির উপর বোমা ফেলেছিল, ইভানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সে চেয়েছিল।

পরে হানা দিল নানাস্মৃতি ঃ হয়তো বাড়িতে তখন কেউ থাকবে না। কর্ণেলের অতিথিদের বাড়িতে আসতে দেখেছিল ভাসিলেঙ্কো, কিন্তু তারা যদি চলে গিয়েই থাকে···

দুদিন পরে ওরা ভাসিয়াকে পাঠালো শহরে। সে সুখবর নিয়ে এল—ক্যাপটেন হুবার্ট নিহত, কর্ণেল সুমার সংঘাতিক ভাবে আহত। ভাসিলেঙ্কো হতাশ হোলো, শার্কের কিছুই হয়নি।

সে বললে, আমি ওকে জানি, ওই সবচেয়ে বড় পাজি···কিন্তু ভাসিয়া শান্ত··· যাহোক, ওদের একটু শিক্ষা তো হয়েছে···

ইভানকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি সে। এক বছর ধরে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে—ইভান এস্তিয়ানেত-এর বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছিল। রাতে দুজনে বসে কত কথা হোত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভান সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করেছিল। ভাসিয়া তো তাই তাকে 'চলন্ত গ্রন্থাগার' বলে ডাকতো। ভাসিয়া তাকে বলতো স্থাপত্য শিল্পের কথা—পীরামিড, মস্কোর প্রাসাদগুলি, সন্ত সোফিয়ার মিনার, সুতোর উপরে সে সিনার নাকি ঝুলে থাকতে পারে, আকাশচুম্বী প্রাসাদ—কত কথাই হোত। আবার কখনো বা তারা এসে পড়তো ভালবাসার কথায়, ইভান একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল, সে মেয়েটি আবার ভালবাসতো আর একজনকে। ইভান বলতে বলতে হঠাৎ আবৃত্তি করে বসতো :

পুরাতন—অতি পুরাতন
তবু যেন সে গোচির নূতন

ভাসিয়া তাকে এক রাতের সেই স্বর্গ সুখের কথা বলতে পারলে না। সে সুখ তো এখন তার কাছে জটিল রহস্যময় বলে মনে হয়; আজ সে শুধু মাঝে মাঝে প্রিয়ার নাম ধরে ডেকে উঠতেই পারে।

দিনকাল যখন স্বাভাবিক থাকে, মানুষ বেড়ে ওঠে, পূর্ণতা পায়, বৃদ্ধ হয়, বয়সের ছন্দের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে—এই তো মানুষের রীতি, কারো কারো স্বভাবে অদ্ভুত কিছু দেখলে মানুষ বলে, ওর এখনো ছেলেমানুষি আছে, আবার কাউকে বা বলে, ও অকালে বুড়িয়ে গেছে. যৌবন থেকে পূর্ণ বয়সের দিকে মানুষ আস্তে আস্তে এগোয়। কিন্তু যখন মানুষের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়, তাকে সইতে হয়, তখন তো তার মন আলাদা ছাঁচে গড়ে ওঠে; তখন মানুষ তাড়াতাড়ি পুরানো দিন বয়েসকে ঠেলে দেয়, নতুনকে আঁকড়ে ধরে, বয়সের কথা মনেই বুঝি থাকেনা, মন কঠিন-কঠোর হয়ে ওঠে, আবার বুঝি গ্রহণ করবার জন্যও উদগ্রীব হয়; পৃথিবী আসে সংকীর্ণ হয়ে—সৈনিকের কাছে একটা টীলাই তখন গোটা দুনিয়া, প্রতিরোধ-সংগ্রামীর কাছে তার বন। কিন্তু তবুও পৃথিবীর পরিধি বাড়িতে থাকে, একই সঙ্গে কমে বাড়ে। অন্যের সঙ্গে তার

যোগসূত্রের চেতনা এই পরিধি বাড়ায়, সে একক জীবনে বদ্ধ হয়ে থাকেনা, বহু জীবনে সে ছড়িয়ে পড়ে।

নিনা জর্জিয়েভ্‌নার কাছে ভাসিয়ার প্রকৃতি সহজ সরল বলেই মনে হয়। যুদ্ধের আগে ভাসিয়া জীবন ধারণ করতো, কিন্তু সে বাঁচার মতো বাঁচেনি, জীবনকেও দেখেনি। অবশ্য সে তখন জীবনে দৈনন্দিন জীবনের জটিলতা, অনশন সবই সয়েছিল, কিন্তু বিপদ তখন আসে নি জীবনে, আসে নি প্রলোভন। আধ্যাত্মিক গহ্বরের অতলে সে তলিয়ে যায় নি, পথ হাঁতড়ে বেড়ায় নি। পাশ্চাত্যের বহু তরুণ তো সেই অতলে তলিয়ে গেছে, সুখ আর সঙ্গতি তাদের ঠেলে নিয়ে গেছে সেখানে। কিন্তু মা যাকে বলতেন সরলতা, সে ছিল তার ছেলেমানষি। তার তো তখনো পরীক্ষা হয় নি। নাতাশাই একমাত্র টের পেয়েছিল, ঐ সরলতার পিছনে আছে গভীরতা, আছে উদারতা। কিন্তু নাতাশা তো তখন অল্প বয়েসী মেয়ে। শুধু সে ভাসিয়ার চরিত্রের সমৃদ্ধিই আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু ভাল করে তা মনে মনে অনুভব করেনি। এখন ভাসিয়া তো মাঝে মাঝে ভাবে, নাতাশা যদি এখন আমাকে দেখে ও চিনতেই পারবে না, কখনো কখনো সে ঘাবড়েই যায়, যদি ওরা পরস্পরকে আর চিনতে না পারে। কিন্তু মন বলে, না, তা হতে পারে না। একই আদর্শ নিয়ে তারা বেঁচে আছে, তাইতো দেখা হতেই তারা পরস্পরকে চিনবে। ক'বার সে তাকে চিঠি লিখেছে, যারা 'খোদ রাশিয়ায়' যাতায়াত করতো তাদের কাছে দিয়েছে চিঠি। কে জানে সে চিঠি তার কাছে পৌঁছেছে কি না। দু-দুবার উড়ো জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, তামাক আর খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে গেছে, কিন্তু চিঠিপত্র ফেলে নি। সে কখনো ভেবেও দেখেনি, নাতাশা তার প্রতীক্ষায় আছে কিনা। শুধু সে জানে, মিনস্ক-এর সেই রাতের পর সে আর নাতাশা অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না। প্রতিরোধ-সংগ্রামী দলে কয়েকটি মেয়ে আছে। ভাসিয়ার চারপাশে আসন্ন মৃত্যু অতীতের অঙ্গীকার ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, স্মৃতি মুছে ফেলছে, কিন্তু ভাসিয়া তো অন্য মেয়ের কথা ভাবতে পারে না। শুধু নাতাশা, কতবার সে নিজের অনুভূতির এই

প্রচণ্ডতা অনুভব করেছে—নিজেকে বিদ্রূপও করেছে—কিন্তু তবু যেন নাতাশাই তার কাছে সব—সেই খাদা—নাক নাতাশা—তার প্রিয়া—বিদ্রূপ মিলিয়ে গেছে।

সেনাপতি হিসেবে সে সুদক্ষ, প্রতিটি অভিযানের প্রস্তুতি সে সাবধানে করে, নিজের মনের প্রেরণা সে সাথীদের মধ্যে সঞ্চার করে দেয়। কিন্তু প্রশান্ত কোনো সন্ধ্যায় আসে ভাবনা। শান্তি এলে কেমন হবে আবার সে জীবনধারা? সে নিজের কাজে ফিরে যাবে। চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে রোদে-ঝলা বাড়ির সার; পুরানো খবরের কাগজের উপর সে ভবিষ্যতের নগরগুলির ছক কাটতে বসে যায়। যুদ্ধের আগে সে ছিল কাইস্কেপারে উৎসাহী, এখন তো আকাশ-চুম্বী প্রাসাদ সম্বন্ধে সে মোহ নেই, বরং, সে তাদের উপরে সন্দিহান। বিস্তৃতিকে জয় করবার জন্যই এদের অভিযান শুরু হয়েছিল, কিন্তু যত মোটর এল যত ভূগর্ভের রেলপথের প্রসার হোলো, ততই এক তালার উপর আর-একতালা চাপাবার নিবুদ্ধিতা ধরা পড়লো—বিস্তৃতির বিজয় তো ইটের উল্লম্ফনকে থামিয়ে দিলে। ভাসিয়া এখন স্বপ্ন দেখে উদ্যানময় নগরের, যুগের অভিব্যক্তিকে সে রূপ দিতে চায়—এখনো তাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়নি পাথরে, ইটে। আমাদের শুধু কারখানাই নেই, শুধু কংক্রিটের স্তূপ নিয়েই আমরা কারবার করিনে।···আগে স্থাপত্য শিল্প বলতে শুধু বুঝতো কারখানা গড়া; এখন সে বার বার ভাবে প্রকৃত শিল্পের কথা। দক্ষতা দিন দিন বাড়ছে। হয়তো এর কোনো বিভিন্ন যুগ নেই এক যুগের সঙ্গে গ্রথিত, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়···কিন্তু এখনো এতো এক মোহ, দক্ষতা বেড়েছে, কিন্তু চাই উপাদানে—উপকরণ। এখানে আমাদের বিদ্যুৎশক্তির অভাব, আঠারো শো বারো সালের প্রতিরোধ-সংগ্রামীরা এ অসুবিধে ভোগ করে নি। তাপ নিয়ন্ত্রণের অভাবে মানুষ আজ অসুবিধে ভোগ করে, কই সিলিণ্ডারের আরো সিলিণ্ডার মোটরের জন্য মনটা খুঁত খুঁত করে। দু'বছর আগে জার্মানদের আমাদের থেকে অনেক বেশি যান্ত্রিক উপকরণ ছিল। কিন্তু তবু ওরা মস্কো দখল করতে পারেনি কেন? এখন তো ওরা 'শার্দূল' তৈরী

করেছে, কিন্তু আমাদের ফৌজ তো ওদের জোর পিটছে···ওদের খবরের কাগজগুলো বলছে, ওরা নাকি কি এক 'গোপন অস্ত্র' তৈরী করছে। কিন্তু তাতেও অবস্থা বদলাবে না। মার্কিনদেরও অমনি উন্নত ধরণের যন্ত্র আছে, তারাও হয়তো একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে। সব কিছুই আজব—প্রথমে শুনলে তো হাঁ হয়েই যেতে হয়। কিন্তু ফলাফলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো এ দিয়ে হবে না—সেখানে মানুষের প্রয়োজন। আমরা মানুষের আত্মাকে বিশ্লেষণ করতে পারি না, এ আমাদের একটা মস্ত আপশোষ। ইভান, আভানেসিয়ান বা স্মির্ণভ-এর কথা ধর—আমাদের সোবিয়েতের মানুষদের ভিতরে অসাধারণ কিছু নেই—বলতে গেলে নেহাৎই তারা সাধারণ। ওদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কেউ চেনেই না। যদি বা কাগজে ওদের নাম বেরোয়, দৈবাৎ কোনো ব্যাপারেই বেরুবে। কিন্তু তবু একথা জোর দিয়েই বলব, আমাদের শত্রুদের চাইতে ওরা মনের দিক দিয়ে ঢের বড়।···

একদিন ইভান আর তার সঙ্গে আমাদের আর বিদেশের কি কি জিনিস ভাল এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ভাসিয়া বললে, আমাদের সমাজ—ব্যবস্থা অন্যান্য যে কোনো দেশের চাইতে ঢের ঢের ভাল। আর তারই ফলে আমরা অনেক বিষয়েই অন্য দেশগুলির চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে গেছি। ধর—জাতীয় সমস্যার সমাধান, জনশিক্ষায়—আমাদের জুড়ি মেলা ভার। এখন বল তো, জার্মানদের এমন কি আছে, যা আমাদের চেয়ে ভাল?···ইভান বিদ্রূপ করে বললে, জার্মানদের? জার্মানদের যে কোনো বিষয়ে রুশদের চেয়ে যোগ্যতা বেশি, একথা মানতে সে রাজি নয়, কিন্তু ওরা আগেই ঠিক করে নিয়েছে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবে—আবেগ এসে বিশ্লেষণ বা বিচারকে প্লাবিত করে দিতে পারবে না। সে বললে, ওদের মাসিক পত্রগুলি দেখে মনে হয়, ওরা বেশ ভাল বাড়িই তৈরী করে। ভাসিয়া বললে, ভাল কথা, তোমার কি ওদের স্থাপত্য-শিল্প ভাল লাগে?—আমি আবার ওসব বুঝি না। ছবিও খুব বেশি দেখি নি—আর ওতো তোমার নিজস্ব ব্যাপার···কিন্তু এদিক থেকেও আমি আমেরিকাকে পছন্দ করি,

অবশ্যি শিল্পের দিক থেকে···আমার তো মনে হয় এক্রোপলিসকে এখনো কেউ হারাতে পারে নি।—তবে আমেরিকান মোটর ভাল। —আমাদের গান···সে তো মানুষের অন্তরের ব্যাপার--ঠিকই। ভাসিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কিসের যেন প্রেরণায়। সে বললে, আমাদের দেশের কি ভাল বলি জান—সে হচ্ছে এখানকার মানুষ! আমার মতে মানুষেই সব চেয়ে বড় জিনিস। মানুষ যন্ত্র তৈরী করতে পারে, কিন্তু যন্ত্র মানুষ গড়তে পারে না···

ইভানের মৃত্যুর কিছু আগে এই আলাপ হয়। এখন তো ভাসিয়া ভাবে, আর তো পুরানো সাথীদের মধ্যে বড় কেউ বেঁচে নেই। আমি, স্মির্ণভ, লাণ্টস, রুডনি—এই চারজন মাত্র আছি···আড়াই বছর ধরে এখানে আছি। কিন্তু যখনি মনের কথা বলতে বসি, তখন শান্তির দিনের কথাই আসে। বাড়িতে যারা আছে, তারা ভাবে আমরা বুঝি শুধুই লড়াই-ই করি, আর বুঝি কোনো দিকে আমাদের মন নেই, আমরা যেন মেইন রিড কি ফেনিমোর কুপারের বইয়ের নায়ক হয়ে গেছি। কিন্তু এখানে সবই সহজ, তবু যেন জটিল। এখানে রোমান্স আছে, ভান নেই···ইভান অভিযানের আগে বলেছিল তার নিনোচ্‌কার কথা, তারপরে তার মনে পড়লো 'তিনবোন' সে দেখেছিল। সে বললে, অল্প বয়সে চেখভকে বোঝা ভারি শক্ত···এই তার শেষ কথা। খবরের কাগজ যখন আসে, সবাই ছুটে যায়। মস্কো-এ আবার ভূগর্ভের রেলপথ বাড়ানো হচ্ছে, এ খবরে সবাই খুশি হয়; তারা আবার এও জিজ্ঞেস করে, কোন থিয়েটারে এখন কি হচ্ছে। হয়তো এইখানেই আমাদের শক্তির উৎস, আমরা প্রাণপণ লড়ছি, কিন্তু তবুও আমরা সেই শান্তির দিনের মানুষই আছি···

মনে হয়, আর দেরী হবে না—আমাদের সৈন্যবাহিনী এগুচ্ছে...ভাসিয়ার মনে ভাবনা ফুট কাটছে। সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলো, প্রায়ই তো দেখি অতিরিক্ত আশা করে বসে থাকি। এইতো ভেবেছিলাম, আমাদের ফৌজ বুঝি মাসখানেকের ভিতরেই এখানে এসে পৌছিবে···এখন ওসব না ভাবাই ভাল। ওরা সময় মতো আসবে। আমরা তো এখন বহুদূরে, ১৯৩৯ সালে

এ জায়গা তো ছিল পোলাণ্ডের ভিতরে ..কিন্তু তবু সে হাসলো। ভিতোবস্ক-এর দিকে চল এখন একমাত্র জিগির।

আঠাশে তারিখ রাতে আর এক অভিযানে ওরা সফল হয়ে ফিরে এল। ভাসিয়া খবর পেয়েছিল, উপরওয়ালা জার্মানরা চলেছে এই ট্রেনে। লাণ্টস মাইন পাতার ব্যাপারে পাকা বলেই দলে পরিচিত। সদ্যপড়া বরফের উপর পায়ের দাগ মুছে ফেলতে হোল। জার্মানরা হয়তো হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারে, এই ছিল ভয়। ভাসিয়া আর তার সাথীরা ছিল রেলপথের কিছু দূরে। মাইন যখন বিস্ফূর্ত হয়ে পড়লো, পিছনের গাড়ির জার্মানরা লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগলো। এবার গর্জে উঠলো সংগ্রামীদের কলের কামান। একজন আনকোরা নতুন লোক ছিল অভিযানে। সে পাশা কুটাস।

পথে ভাসিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি ভয় পেয়েছিলে ?

হাঁ, পাশা জবাব দিলে।

তাতে আর কি! প্রথমে অমনি হয়। ক্রমে অভ্যেস হয়ে যায়, এখনো রওনা হবার সময় আমার বুকটা কেঁপে ওঠে, যাহোক, অভ্যেস হয়ে গেছে।

নতুন বছরকে ওরা যথারীতি স্বাগত জানালো: বেতারে কালিনিনের বক্তৃতা শুনে মুখে ফুটলো হাসি—চমৎকার! মস্কোতেও এখন ওরা শুনছে …এবার শোনা গেল ক্রেমলিনের ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ…ওরা স্তালিনের সম্মানে প্রথমে তারপরে লালফৌজের সম্মানে পান করলো, তারপর পরস্পরের স্বাস্থ্যপানের পালা। লোসেভ (ওকে ওরা আমাদের ভাণ্ডারী বলে ডাকতো) আগেই তিন কেস জার্মান রাম এইদিনের জন্য সরিয়ে রেখেছিল।

স্মির্ণভ হঠাৎ উঠে পড়ে বললে,

এস, আমাদের সেনাপতির স্ত্রীর সম্মানে আমরা পান করি—আমাদের সকলের স্ত্রীর সম্মানে চলুক পান।

ভাসিয়ার মুখে হাসি। এই হাসি দেখেই নাতাশা ওর নাম দিয়েছিল, চেশায়ারের বেড়াল। নাতাশা—তোমার নতুন বছর সুখে কাটুক—এই আমার

কামনা। তুমি কি জান নাতাশা—আমি বেঁচে আছি! হৃদয়ে স্পন্দন উঠেছে; অদ্ভুত! এপ্রিলে গোলার একটা টুকরো এসে ওর কবজীতে বিঁধে গিয়ে ঘড়িটা চুরমার করে দেয়—কিন্তু তখনো ঘড়ির বুকে উঠছিল স্পন্দন···রাত বাড়ছে, বছরের সব চেয়ে ছোট রাত, কিন্তু তবু যেন তার কাছে দীর্ঘতম বলেই মনে হচ্ছে জীবনের চেয়েও দীর্ঘতর এই রাত···নাতাশা, আমার প্রিয়া··· আমার বোঁচা নাকি!···

বিশ

রায়া যে পল্টনে ছিল, সেটি বদলী হয়ে গেল। ওসীপের চিঠি দুমাস ধরে পড়ে রইলো যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরে। রায়া বহুদিন ধরেই এই দুঃসংবাদের প্রতীক্ষায় ছিল। নতুন বছরের আগের দিন, একজন সংবাদদাতা এলেন। তিনি ছিলেন কিয়েভ-এ, তিনি এসে বাবী-আর-এর নৃশংসতার বর্ণনা করলেন। তবুও রায়ার আশা ছিল। কতবার সে নিজেকে বুঝিয়েছে, বৃথা আশা—কিন্তু আশা তবু মরে নি—হয়তো তারা চলে গেছে কোনো গ্রামে—হয়তো বা কেউ আশ্রয়ই দিয়েছে। ···ওসীপের চিঠি পড়ে সে জানলে, আলিয়া আর বেঁচে নেই।

সার্জেণ্ট কুজেনৎসভ এই পল্টনের সেরা শত্রু শিকারী; সাইবেরিয়ার মানুষ, চুপচাপ থাকে, যুদ্ধের আগে জীবজন্তু শিকার ছিল তার পেশা। তাকে বুনো জন্তুর মতোই দেখায়, তবে তার চোখ দুটি সরল, গ্রাম্য। একদিন সে রায়াকে বললে, জার্মানদের যে কি বলে ডাকব জানি না। ওদের যদি বুনো জানোয়ার বলি, তাহলে তো ভালুককে অপমান করাই হবে। ভালুক কি ঘিরে না ফেলে মানুষকে আক্রমণ করে? কখনো না? কিন্তু জার্মানরা যা পাবে তাই-ই ছিঁড়েখুড়ে দেবে···রায়ার ওকে ভাল লাগে। লোকটা সরল, ভণ্ডামি জানে না,

মনটাও ভাল। পল্টনে কেউ জানলো না, লেফটেনান্ট আলপেত খারাপ খবর পেয়েছে। শুধু কুজেনৎসভকে রায়া বললে,

আমার স্বামীর চিঠি পেলাম। জার্মানরা তার মা আর আমাদের খুদে মেয়ে আলিয়াকে খুন করেছে। কিয়েভে…

স্বর তাঁর কাঁপলো না। কুজেনৎসভকে সে শুধালে, তার পল্টনের খবর ভাল তো! তারপর চলে গেল। কুজেনৎসভ বহুক্ষণ ঠায় বসে রইল—সে অবাক বনে গেছে। মেয়েটা কি করে এমন শান্ত হয়ে আছে এখবর পাবার পরে?

এক সময়ে ছিল, ওসীপ একটু খারাপ ব্যবহার করলেই রায়া কেঁদে ফেলতো—অকারণেই সে কাঁদতো।—ভালিয়াকে বলতো—কি জানি কেন যে কাদি…হাঁ,—ঘুম, রুটি আর চোখের জল—সবই তখন ছিল প্রচুর। লোকে বলে, অনাবৃষ্টি যেমন মাটি শুকনো করে দেয়, তেমনি দুঃখ দেয় মনকে। কিন্তু রায়ার বুকখানা এখনো শুকনো হয়ে যায়নি, এখনো অনুভূতি তার প্রখর। কিন্তু এখন আর সে কাঁদে না, বাইরে দেখায় না দুঃখ। বাইরের দুঃখের প্রকাশ তো মানুষকে গভীর হতাশা থেকে সুসংবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে যেতে পারে। শুধু তার ভ্রূর নাচন দেখে, নিচু স্বর শুনে কারো বা মনে হয়, রায়া সইছে। তার নিজের কাছে এ ব্যক্তিগত দুঃখের সীমা নেই, তবু তো সে বিশ্বব্যাপী দুঃখের কাছে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। অন্যের কাছে ভয়ংকর যুদ্ধের পর আসে দিবাস্বপ্ন, কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রের রোমান্স জীবনে বৈচিত্র্য এনে দেয়, তাঁবুর আগুনের কুণ্ডের ধারে হাসির লহর বয়ে যায়। রায়া সবার দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন; দুঃখের কালো কুয়াশা যেমন স্মোলেনস্কের জ্বলন্ত গ্রামের উপর ভেসে ছিল, তেমনি দুঃখ তাকে ছেয়ে ফেলে। তার মনে পড়ে তারই রোগী কোস্তিয়া বেলভ কি করে হাঁসপাতালে মারা গেল। তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট ছেলে, নিষ্প্রভ ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসি, চেঁচিয়ে উঠলো, দানিয়েচ্কা, আমি এখুনি আসছি!…রায়ার মনে পড়লো খুদে শিশুর মৃতদেহ সে কবে একদিন দেখেছিল; আর দেখেছিল এক স্ত্রীলোককে বুড়ো গরু দিয়ে

খেত চষতে ; গরুটা তার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে, স্ত্রীলোকটির চোখে জল দেখা দিল। স্ত্রীলোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদলো।...

রায়াকে যদি কেউ বলে, ওদেরও আমরা অমনি শিক্ষাই দেব, রায়া মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। জার্মান মাকে সে তা মনে করিয়ে দিতে চায় না। বেলভ তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, প্রতিশোধ নেবে রায়া? রায়া জবাব দিয়েছিল, না, লড়ব! খবরের কাগজে যাকে ফ্যাসীবাদ বলে, তার সেই সর্বনাশা মতবাদের উৎখাত যতদিন পর্যন্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত সে মনে শান্তি পাবেনা বলেই সে লড়েছে, যুদ্ধের এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন বলেই সে শক্তি পেয়েছে মনে। পুরুষরা অবাক হয়ে গেছে—এক দুর্বলা মেয়ে, অথচ ট্রেঞ্চ-জীবনের সব কষ্ট সহ্য করছে—শক্তিশালী পুরুষের থেকেও এ জীবনে সে যেন বেশি অভ্যস্ত, দুমাস সে ছিল হাসপাতালে। গোলার একটা টুকরো পায়ে এসে বেঁধে, হাড়ে লাগেনি, কিন্তু ক্ষত আরাম হতে সময় লাগলো। এর মধ্যে ওসীপকে সে লেখেনি যে সে আহত হয়েছে। যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, কর্ণেল তাকে অন্যত্র পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আবার শত্রু শিকারীর রাইফেল তুলে নিয়েছে হাতে। সে বলে, বহু সময় গেছে, এখন সেটা পুরিয়ে নিতে হবে। তিপান্ন জন জার্মান এখন তার খাতে জমা।

জুলাইয়ে যে অভিযান শুরু হয়েছিল, এখনো তা অপ্রতিহত গতিতে চলেছে, সীমান্ত বদল হচ্ছে মাত্র। শত্রুর বাধার বাঁধ উছলে পড়ে, সমর-প্লাবন এবার ছুটেছে পশ্চিম দিকে। যখন দক্ষিণে ঝিমিয়ে আসছে, আবার উত্তরে জলে উঠছে। নিপার থেকে ইলমেন, নোভগোরদ থেকে রেভিনো তার গতি। বিরাট যুদ্ধ ক্ষেত্র এগিয়ে আসছে, কিন্তু এতো অগ্রগমন নয়, এক লাফে এসে পড়েছে। শত্রুরা বলতে পারেনা, কাল তারা কোথায় দাঁড়িয়ে বাধা দেবে, রায়ার পল্টন যে অঞ্চলে আছে, সেখানে আজ দু-মাস ধরে তেমন লড়াই চলছে না। প্রতিদিনই গোলন্দাজ বাহিনীর কামান গর্জন করে ওঠে, বোমারুরা তাদের বোঝা নিপুণভাবে খালাস করে দিয়ে যায়, পর্যবেক্ষণকারী বিমান শত্রুর এলাকায় ঘোরাফেরা করে। এক

যেন নিয়ম-বাঁধা ব্যাপার। আবার আসে ফিরতি—ঝিমিয়ে-পড়া প্রহর—শান্ত পথঘাট। শত্রুর হালচাল এমনি করেই জানা হয়ে গেছে। চুবারেভ রায়ার সহকর্মী, সে বলে, এইবার আমাদের মরশুম এল—শিকারীদের মরশুম।···

সেদিন বরফ পড়ছিল, হাওয়াও প্রবল। রায়া আপন মনে ভাবলে, আজ চুয়ান্নটি পুরোতে হবে···ট্রেঞ্চে সে চুবারেভের প্রতীক্ষায় বসে রইল। ওসীপের চিঠিখানা বার করে আবার পড়ে দেখলে। কাল তো চিঠি পেয়ে অবধি আলিয়া ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে পারে নি। এখন সে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ ওসীপ··· হঠাৎ তার মনে হোল, কিয়েভ-এ ওসীপ কি ব্যথাই না সয়েছে; তার দুঃখ আর ভালোবাসা কতখানি, তার যেন হদিশ পেল রায়া। অব্যক্ত সে ব্যথা, সাধারণ—তবু যেন জীবন ছেয়ে দেয়, ভরে দেয়। রায়া তো কোনোদিন একথা ভাবে নি, বোঝে নি। ওসীপের নিঃশ্বাসের উষ্ণতা সে যেন টের পেল তার নিজের দেহে, তার শক্তি যেন সঞ্চারিত হোলো, তার সেই শিরালো হাতের অসহায়তা।

কেন তখন বুঝিনি? ভাবতাম, ও অনুভূতিহীন একটা জীব, কিন্তু আজ তো ওর প্রতিটা কথা যেন ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে।···আমি পুঁথির ভিতরে চেয়েছিলাম প্রেম, কিন্তু প্রেম তো ছিল আমারই পাশে! মানুষ কি অদ্ভুত! সহজ একটা কথা বুঝতে মানুষকে কত সইতে হয়! ওসীপের জন্য করুণা হোলো—অসীম করুণার প্লাবন বয়ে গেল—প্রেমিকাই শুধু শক্ত—সমর্থ প্রেমিকের জন্য এই করুণা অনুভব করতে পারে। ওর কাছে আজ রাতেই চিঠি লিখে সব কথা জানাব, ও যাতে বুঝতে পারে, আমরা একসঙ্গেই আছি। জীবন হয়তো আগের মতো সহজ-স্বচ্ছন্দ হবে না, তবু তো এক সঙ্গে আমরা বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব।···

সাত নম্বর দপ্তর থেকে ক্যাপটেন সিগানকভ এসে ট্রেঞ্চে ঢুকলেন। বরফে ঢেকে গেছে তার গা, অসাড় হাত দুখানা বুকের উপর ক'বার চাপড়ে নিলেন, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়লো, এবার তাঁর ভেড়ার চামড়ার কোটের বরফ গলতে লাগলো, ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ক্যাপটেনের মুখে হাসি। তিনি জানালেন, খুদে বেতার যন্ত্র-

গুলি এসে গেছে। ওতে জার্মানদের 'স্বাধীন জার্মানীর' আহ্বান জানানো হবে, গানও থাকবে সঙ্গে।

কালিনিন সীমান্তে অমনি ধরণের বেতার প্রোগ্রাম শুনেছিলাম, ফ্রিৎসরা গান বাজনা ভালবাসে···এক লেফটেনান্ট ছিল, সে দোভাষীর কাজ করতো। সে নিজেকে হ্যামেলিনের বাঁশী বাজিয়ে বলতো, এক গানও লিখে ফেলেছিল, তাতে ছিল, সে বাঁশী বাজায়, আর জার্মানরা গর্ত থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসে। ভারি মজার ব্যাপার না···

একশো মিটার দূরে জার্মান ট্রেঞ্চগুলি। রাত এখন উজ্জ্বল—চাঁদ উঠেছে, চারিদিকে তুষার, নীরবতা। হঠাৎ শোনা গেল বাজনা। মধুর সুর, হয়তো মাধুর্য একটু বেশি। ষ্টাউসের ওয়ালৎস। রায়া এ সুর বাজিয়েছে। স্মৃতি গুণ গুণ করে উঠলো মনে – কিয়েভ আর সেই সুখের দিন, বরফে সবুজ আভা। ফার গাছটায় ঝুলছে দোলনা। আর একটা সুর। এমন বিষাদ অনুরণিত হয়ে ওঠে, ভাবতেই পারা যায় না যে, ওর সঙ্গে নাচ চলে কি করে। আস্তে আস্তে কাঁদতে ইচ্ছে করে ঐ সুর শুনে। একটি ছোটখাটো আরামের নীড়, আগুনের কুণ্ডের ধারে, হাতে একখানা রুমাল—কাঁদো, কাঁদো···

জার্মানরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করলো। ক্যাপটেন সিগানকভ গাল দিয়ে উঠলো,

আহ্বানটা দেখছি পৌঁছলো না···

আর ওয়ালৎস-এর সুর উঠেছে না, নেই নীরবতা, রায়া দূরে কি দেখতে চেষ্টা করেছে

চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন···

তার হাতের আঙুল অবশ, সাদা হয়ে গেছে বরফে,

ক্যাপটেন শান্ত হতেই চায় না।

এখানকার জার্মানগুলো বর্বর! সট্রাউসের সুর শুনেও ওদের মন গলে না। তাছাড়া আহ্বান তো পাঠানো গেল না···

কুজেনেৎসভ হাসল,

পাঠাতে পার নি তো কি হয়েছে ? আহ্বান ছাড়াও ওদের চলবে।

কিন্তু ওদের যে শেখাতে হবে, দীক্ষা দিতে হবে···

কথায় হবে না। দেখনা, রায়া কেমন দু'টোকে শিক্ষা দিয়েছে।

রায়া ট্রেঞ্চের উষ্ণতায় গা ঢেলে দিয়েছে। মুখখানা যেন পুড়ে যাচ্ছে, ঝিমুনি পাচ্ছে। একজন দূত ট্রেঞ্চে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলো, কমরেড লেফটেনাণ্ট, কর্ণেল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান

আস্তে আস্তে বললে,

আপনাকে তিনি অভিনন্দন জানাতে চান। আপনি বনের ভিতর দিয়েই যেতে পারবেন। এই সময়ে জার্মানরা গুলী ছোঁড়ে না···

রায়া ফার গাছের সারের ভিতর দিয়ে চললো। হঠাৎ ভয়ানক তুষারপাত শুরু হোল। হাওয়া নেই। রায়ার মনে বাজছে এক ওয়ালৎস-এর সুর—বিষণ্ন আবার মামুলি। জার্মান দুটোকে মেরেছে সেকথা সে ভাবছে না, কর্ণেল কি বলবেন সে কথাও না, মনে হচ্ছে, ওসীপের সঙ্গে সে বেড়াচ্ছে বনে। বিয়ের পরে ওরা তো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে নতুন বছরের উৎসব করেছিল···ওসীপ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চলছিল বনে, কথা সে কয়নি।

বরফ ঘুর্ণি তুলে ঝরছে, মগজে পাঁক খাচ্ছে সুর। নীরবতা—এমন নীরবতা বুঝি পৃথিবীতে কোনোদিন নামে নি।

কয়েকটা ফার গাছ ভেঙে চুরে দিয়ে গেল কামানের গোলা। রায়ার পিছনে ছিল দূতটি, সে ছুটে এগিয়ে এল, রায়ার নিশ্বাস পড়ছে না।

কর্ণেল শুনে চেঁচিয়ে উঠলেন, ভাবতো কি এক দুর্ঘটনা !—একেবারে বোকার মতো মরতে হোল।

তারপর নিজের উপরই তার রাগ হোলো—বোকার মতো আসতে বললাম কেন··· এখানে সবই তো বোকামি—আবার সব কিছুরই যুক্তিও আছে—এটা যে যুদ্ধ···কিন্তু ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়।

আহা, চমৎকার মেয়েটি···

রায়াকে কবর দেওয়া হয়ে গেল, ওর রাইফেলটা কুজনেৎসভকে উপহার দেওয়া হোল। সে দৃঢ় স্বরে বললে,

আমি শপথ করছি, এই ঘৃণ্য শত্রুদের আমি আঘাতে আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেব।···

স্বর তার ভাঙা, চোখ একবার বুজে আস্তে আস্তে সে বললে, যেন আপন মনে বলছে,

ভীষণ এক দুঃখ ও সইছিল। ওর খুদে মেয়েটিকে জার্মানরা খুন করে। আমি তো সে কথা ভুলতে পারব না।

রাইফেলটা সে মাথার উপর তুলে ধরে তার উপরে ঠোঁট রেখে সস্নেহে চুমু খেল।

একুশ

ক্রিষ্টিনের মনে এক ভাবনা, তার খুব অসুখ করেছে, সব জিনিসই সে নাকি জুটো দেখে, একবার বুকখানা ধুকধুক্ করে ওঠে, আবার গা বমি বমি করে। বন্দীশিবিরে ডাক্তার কাসনার বললেন, এমন কিছু নয়। স্নায়ু আর বয়সের দোষ। মেয়েদের এ বয়েসটায় এমনি হয়, তার উপরে আছে জার্মানীর এই সংকট···

কাসনারের জিভ আলগা, একটু বেশিই বলেন, এই তো সেদিন ক্রিষ্টিনকে বলেছেন,

দাঁতের ডাক্তাররা ভাবনায় পড়েছে। এবার নাকের ভিতর দিয়ে দাঁত উপড়ে আনতে হবে।

ক্রিষ্টিন বুঝতে পারেনি ডাক্তার কি বলতে চান, তাই ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন,

কেউ আর মুখ খুলতেই চায় না কি না…

ক'দিন আগে ক্রিষ্টিন পুরাণো বন্ধু আনেচেনের ওখানে গিয়েছিল। আনেচেনের ভাই পূর্ব রণাঙ্গন থেকে আহত হয়ে ফিরে আসে, তারই আরোগ্য হবার উপলক্ষ্যে সেখানে এক ভোজ হয়। আনেচেনের আত্মীয় হেলীরা স্বামী-স্ত্রীও এসেছিলেন। ওঁরা সবে বার্লিন থেকে এসেছেন। ফ্রাউ হেলী, মোটাসোটা মানুষটি, তিনি তো বকবক করতে লাগলেন,

সত্যিই ভয়ানক! ফ্রিৎস-এর অসুখ করেছে, এখন রঞ্জন-রশ্মি নিতে হবে, আর এতে অবাক হবার তো কিছুই নেই। ও উপরে উঠছিল, এমন সময় বাড়িতে আগুন লাগে—লিফ্‌টটাও অচল হয়ে যায়। ওরা সবাই ফ্রিৎস-কে বললে, লাফিয়ে পড়! কিন্তু ওর হাত পা তখন অবশ হয়ে এসেছে। সে এক দুঃস্বপ্ন! ওর জন্মদিনে একটা সুন্দর ফুলদানী উপহার দিয়েছিলাম—আজকাল তো আর দোকানে ভাল কিছু কিনতে পাওয়া যায় না। তবু ফুলদানীটা ছিল চমৎকার! একজন লোক ছুটিতে এসেছে, সে ফ্রান্স থেকে নিয়ে এসেছে, লোকটা পাঁচশো মার্ক চেয়ে বসেছিল—তারপর দেড়শো মার্কেই বিক্রি করলো। কিন্তু ওর দাম কমসে কম হাজারটি মার্ক হবে। ডাঃ উইন্টার তো বলেন, এটি যাদুঘরে রাখবার মতো জিনিস। আর ভাবতে পার, সেই ফুলদানীটা কিনা চুরমার হয়ে গেল!…

ক্রিষ্টিন বললে, কেন যে এমনি হামলা ওরা করতে দেয়! একটা অন্তত রীতি তো আছে…এই তো হের্ কারফে কালই আমাকে বললেন, তার সম্বন্ধী ছিল নিচের তলায়, ছাদ ধসে পড়লো; তিনি নিজেই তার নিচে চাপা পড়লেন।

রিচার্ড কেমন অদ্ভুত হাসি হাসলোঃ

চাপা পড়লো বলছ? হাঁ, কখনো কখনো তা হয় বটে!…আমার কথা যদি বল, যত ইচ্ছে বোমা ফেলুক না কেউ, কিন্তু রুশ কামান চললেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়।

যুদ্ধে কি হবে, এই নিয়ে কথা উঠলো, হের হেলী বললেন,

খবর খারাপ, কিন্তু মনমরা হলে চলবে না···ফ্যুরার বলেছেন, তাঁর স্নায়ু তেমনি মজবুতই থাকবে, আর সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

ফ্লাউ হেলী রুমাল চোখে দিয়ে কেঁদে উঠলেন,

আমার স্নায়ু তো গেছে···

রিচার্ড আবার তেমনি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো,

ফ্যুরার বললেন, এটা হবে কি হবে না? সেই তো প্রশ্ন···যুদ্ধের আগে হ্যামলেট দেখেছি, ভাল লাগেনি। কিন্তু শেষটা কি হবে জানবার কৌতূহল জাগে···

হের হেলী জবাব দিলেন, ভালয় ভালয়ই শেষ হবে। রুশরা দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য দিন গুনছে, কিন্তু তাদের হতাশ হতে হবেই। এ বছরও মিত্রশক্তি নামবে না; এই ছ"মাস ধরে ওরা তো নেপল্‌স্ আর রোমের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

ডাঃ কাসনার শুয়োরের মাংস খেতে তখন ব্যস্ত, তাই আলাপে যোগ দিতে পারেন নি, হাত দিয়ে গোঁফ পুছে নিয়ে এবার হেসে বললেন,

আপনারা কি মনে করেন, রুশদের এখনো দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দরকার আছে? মোটেও না?···

সেদিন একজন ব্যবসায়ী কি বললেন, শুনবেন? তিনি বললেন, লাল ফৌজ এখানে আসার আগে ওরা নামবে এই আশাই করি···

কি লজ্জা! হের হেলী চেঁচিয়ে উঠলেন।

রিচার্ড মুচকি হাসলেন, ক্রিষ্টিনের মনে হোল, গলা বুজে আসছে। সে ছুটে হল ঘরে চলে গেল।

আঠারো মাস ধরে সে বন্দী-শিবিরে কাজ করছে। রুশদের মুখ দেখে দেখে আর গান শুনে সে অস্থির। যদি তার নিজের ক্ষমতা থাকতো, সে সবাইকে খুন করে ফেলতো···ওদের মধ্যে কেউ কেউ পোষ মানার ভানও করে; একজন তো ক্রিষ্টিনকে বলেও ছিল, যুদ্ধের পরে সে জার্মানীতেই থেকে যাবে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে নি। সে একটা রুশ মেয়েকেও বিশ্বাস করে না—ওরা সবাই জার্মানীর পরাজয় চায়। ওরা বিমান হানা হলে কেমন খুশি হয়ে ওঠে!···ক্রিষ্টিন সব রকমই করে দেখেছে

—মুখে চড়-চাপড় মেরেছে, আবার মিষ্টি কথাও বলেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। ওরা ওকে ঘৃণাই করে। আর সে ওদের ভয়ও পায়। লালফৌজ যদি জার্মানীতে এসে ঢোকে, ঐ বেশ্যাগুলো তার গলা টিপে মারবে।

ক্রিষ্টিন গালিয়াকে সব চেয়ে ঘৃণা করে। ঐ গাইয়ে মেয়েটা দলের সর্দারনী। অন্য মেয়েরা তার কথা শোনে, আর সে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। ওর মতো অবস্থায় পড়লে যে কেউ গলায় দড়ি দিত, কিন্তু মেয়েটা এরই মধ্যে যখন-তখন হেসে ওঠে। আবার এমনি ব্যাপার, মরদগুলোরও ওকেই পছন্দ···

একদিন ক্রিষ্টিন কারখানায় গিয়েছিল—হের্ কাউফ তাকে বললেন, সে যেন লাল চুলওয়ালা মেয়ে অলিয়াকে পাঠিয়ে দেয়– কাপড়-চোপড় কাচতে হবে। তখন দুপুরের টিফিনের সময়। গালোচকা একটা বাক্সের উপর বসেছিল, ফরাসীটিও বসেছিল, তার পাশে ক্রিষ্টিনের তাকে ভালই লাগে। একেবারে ছবির মতো দেখতে—চমৎকার লম্বাটে মুখখানা, রোমের ধরণের নাক, কালো চকচকে চোখ। ওরা এতই আলাপে বিভোর যে ক্রিষ্টিনকে দেখতেই পেল না। ফরাসীটা কি বলছে, সে বুঝতেই পারলো না, কিন্তু এমন আবেগভরে বলছে যে সে থেমেই পড়লো। লোকটা নিশ্চয়ই ছুঁড়িটাকে প্রেম জানাচ্ছে উঃ ফরাসীগুলো যে কি মানুষ!···ওরা সত্যিই ক্ষ্যাপা! একজন জার্মান কি অমনি কথা বলতে পারে? আমরা যখন বিয়ের কথা দিই, তখনো গুস্তাভ শান্ত স্বরে মাপা-জোপা কথা বলতো···

মেয়েটার বরাত ভালো। ওর ভিতরে ওরা এমন কি পেল? বোতামের মতো একটুখানি তো নাক। ক্রিষ্টিন চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো!

এই—এখানে কি হচ্ছে?

এটা টিফিনের সময়, গালোচ্কা জবাব দিলে।

ক্রিষ্টিন তার গালে এক চড় কষাতে গেল, আবার কি ভেবে থেমেও গেল: রুশরা ঘৃণা করে তাই তো যথেষ্ট, আবার ফরাসীদের চটিয়ে লাভ কি?···

গ্যালোচ্কা তার কঠোর কৌমার্য নিয়ে বহুবার ভেবেছে, পিয়ের-এর সঙ্গে

তার সম্পর্কটা কি—বন্ধুত্ব-না-তার চেয়েও বেশি কিছু ?···কখনো এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নি ; লোকের ভিড়েই তারা পরস্পরের দেখা পেয়েছে, কখনো বা পিয়ের চুপি চুপি গালোচ্‌কার হাত চাপড়ে দিয়ে ডেকেছে—প্রিয়া ! গালোচ্‌কা তাকে পেতিয়া বলে ডাকে। পিয়ের রুশ ভাষা শিখেছে ; উচ্চারণে ভুলই করে, কিন্তু অনর্গল বলে যায়। রোববারে নদীর ধারে ওদের দেখা হয়। ছোট্ট নদী, ঘোলা তার জল, এখানো ওখানে রামধনুর রঙ। তেল ভাসে সেই জলে। গাছপালা, পাখী নেই সেখানে—শুধু ইটের দেয়াল আর কালিঝুলি ; কিন্তু তবু নদীর পার তাদের কাছে স্বর্গ। সোমবারে আবার ভাবতে শুরু করে, সামনের রোববারে দেখা হবে কিনা।

পিয়ের জানে, গালোচকার সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে। আরো সে জানে, বেশিদিন আর বাঁচবে না। ফরাসী ডাক্তার তো খোলাখুলি বলেছিলেন, একটা ফুসফুস গেছে। এই অবস্থায়...বন্দী-শিবিরে তো বহু মানুষের ভিড়, মৃত্যু তো এখানে শান্তি ; কিন্তু পিয়ের তো মরতে চায় না—জীবন কি সে তা সবে বুঝতে শিখেছে।

যুদ্ধের আগে চারদিকে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে সে ভাবতো না। কেউ যদি সমাজ-ব্যবস্থা ঢেলে সাজবার কথা বলতো, সে একটু বিদ্রূপভরেই হাসতো। বাপের প্রিয় কথাটাই সে আবৃত্তি করতো ঃ—যতই সব কিছু বদলাতে থাকে, ততোই সব কিছু আবার ঠিক জায়গায় মতো চলে যায়। ডাঃ মোরিলো তার ছেলেদের মধ্যে এই অবিশ্বাস এনে দিয়েছেন। তাঁর মতে এই হচ্ছে মানুষের পরিণতির লক্ষণ। যারা ভদ্র মানুষ, তাঁরা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে ঘৃণা করেন, কিন্তু তাঁরা বোঝেন-এর চেয়ে উন্নত সমাজ আর আসবে না।

বড় ছেলে রেগে কখনো কখনো বাপের সঙ্গে তর্ক করতো ; কিন্তু পিয়ের এসব কথার ধার ধারে নি। যখন যুদ্ধ এল তখনো সে স্বপ্নবিলাসী, আমোদপ্রিয় তরুণ। এমন কি যুদ্ধও তার কাছে প্রথমটা এক মূর্খতা বলেই মনে হয়েছিল, কেউ বা তখন জোর দিয়ে বলতো, দালাদিয়ের মনুষ্যত্বের মূল্য রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছেন,

কেউ বা বলতো, এসব বাজে কথা। এটা বাজার আর কাঁচা মালের লড়াই।

বন্দীশিবির হোলো পিয়ের-এর জীবনের শিক্ষাক্ষেত্র। কঠোর তার বিধান। শিবিরের মানুষগুলো অবনতির চরম ধাপে ধীরে ধীরে নেমে চলেছে। যাকিছু মন্দ তাইই এখন উপরে ভেসে উঠেছে। অসুস্থকরা বলে, এখন বড় কথাই হচ্ছে, বেঁচে-বর্তে ফিরে যাওয়া। পেঁতা বা গণতন্ত্র—যাই হোকনা—ওতে কিছু যায় আসে না। আবার পাজি যারা, তারা যেন সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য তৈরী হয়েই আছে। আবার স্বপ্নবিলাসীও আছে—তারা শীতার্ত ক্ষুধাভরা রাতে যুদ্ধের আগের ফ্রান্সের বিলাস নিশার স্বপ্ন দেখে—মানের কুঞ্জ, সেখানে জেসমিন ফুল তোলে, প্রেমিক প্রেমিকেরা ঘন হয়ে বসে খাবার যায়। আবার কারো বা ভাবনা চিন্তার বালাই নেই। তারা রেডক্রসের মারফতে বাড়ি থেকে আসা সসেজ খায়; অথবা জার্মান প্রোষিত ভর্তৃকাদের আলিঙ্গনে ধরা দেয়। ওদের স্বামীরা এখন রণাঙ্গনে, তাই তাদের ভুতযুগল ব্যাকুল হয়ে বন্দীদের জড়িয়ে ধরতে চাইছে। বন্দীদের মধ্যে খুব কম লোকই সত্যিকার লড়াই দেখেছে, যুদ্ধের ওরা কিছুই জানে না, শুধু জানে শিবিরের কাঁটাতারের বেড়া।

গালোচকা পিয়েরের জীবন। এই গর্বিত, নম্র মেয়েটির স্বতস্ফূর্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যখন গালোচকা তাকে বললে, কেমন করে কিয়েভএ একখানা ছেঁড়া ইশতেহার পেয়ে সে নকল করে নিয়েছিল, সে ভাবলে, হাঁ, এই জীবনই বাঁচবার মতো জীবন···কখনো কখনো মেয়েটি অনুরোধ করে, আমাকে কিছু বল না...তুমি তো এত জান···অনেক পড়েছে পিয়ের, আবার তা মনেও রেখেছে, যে সব উপন্যাস পড়েছে, তার গল্প সে বেশ করতে পারে; নানা দেশের গল্পও করে, সেগুলো যেন সে দেখে এসেছে, কখনো কখনো গালোচকার মনে হয়, সে নিজে ছাত্রী, পিয়ের অধ্যাপক। যদিও সে পিয়ের-এর থেকে পাঁচ বছরের বড়ই হবে। একদিন সে বললে,

তুমি আমার থেকে কত বেশি জান।

সে জবাব দিলে,

হয় তো···কিন্তু তুমি যা জান, তাতো ঢের ঢের বেশি।

সেই ঘোলা নদীর ধারে ওরা বেড়াচ্ছিল। এক তীক্ষ্ণ তীব্র শীতের হাওয়া বইছিল। পিয়ের বিষণ্ণ, কাসছে সে মাঝে মাঝে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে গালোচকা বললে, পেতিয়া, তোমাকে পেয়ে আমি সুখে আছি।

মুখখানা তার লাল হয়ে উঠলো। পিয়ের জবাব দিলে, আমারও ভাল লাগে···

সোমবারে সে কাজে এল না, গালোচকাকে সে বলেনি তার রোগের কথা। গালোচকা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছে, তার কি হয়েছে। সে কাসে কেন, ভার তুললেই ঘাম দেয় কেন তার শরীরে? পিয়ের জবাব দিয়েছে, ব্রঙ্কাইটিস আছে তার।···পরদিনও এল না। গালোচকা বুঝতে পারলো, কতখানি ভালবাসা তাদের। কি হোল তার? কি অসুখ? জার্মানরা কি তাকে অন্ত বন্দী-শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছে?

ক'দিন পরে পিয়েরের বন্ধু রোজের বললে,

পিয়ের হাসপাতালে আছে। আমি ওকে দেখে এলাম। তোমাকে ওর জন্যে ভাবতে বারণ করে দিয়েছে।···

রোজের নিজেও যেন কেমন উসখুস করছে। গালোচকা বুঝতে পারলো, পিয়ের-এর খুব অসুখ। গালোচকার মন বিষাদে ছেয়ে গেল। সেই রাতে, যখন সে নিশ্চিন্ত হোল, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, বালিসে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো। অন্যকে সে তার দুঃখ দেখাতে চায় না; নিজেকে সে সবসময়ে হাসিখুশি রাখে। যদি হাসিখুশি মেয়ে কাঁদে, তাহলে আর সকলের কি হবে?···

দু'বছরের বন্দী-জীবন তিলে তিলে তার কাজ করে যাচ্ছে: ব্যারাকে বহু মুখে আজকাল চোখের জল দেখা যায়। গালোচকা মেয়েদের বোঝাতে চেষ্টা করে, আর দুঃখের দিন বড় বেশি নেই; কিন্তু সবই বৃথা হয়ে যায়। এই তো সেদিন পর্যন্ত বহু মেয়ে বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছে, কিন্তু এখন ইউক্রাইনের সমস্ত অঞ্চল

লাল ফৌজ মুক্ত করে দিয়েছে, যোগসূত্র তাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বাড়ি যেন এখন আরো দূরে।

একদিন অন্তর একদিন ফ্রয়েলিন ষ্টসেনরুটার বলে একটি জার্মান স্ত্রীলোক ব্যারাকে আসে। তার নাকটা মস্ত। সে মেয়েদের বলেছে, ইউক্রাইনে আর একটা বাড়িও আস্ত দাঁড়িয়ে নেই। সে বলে, বোলশেভিকরা তো সাবাড় হয়ে গেছে।

পিয়ের-এর অসুখের আগে, গালোচকা রোজই মেয়েদের নানা খবর বলতো। ফরাসী ডাক্তার লণ্ডন থেকে বেতারে খবর শুনতেন। এখন তো খবর পাওয়া শক্ত। রোজের অন্য কারখানায় কাজ করে, আর সে রুশ সহরগুলির নাম মনে রাখতে পারে না। গালোচকা তাকে একদিন রুক্ষ স্বরেই বললে,

ভাল করে জানবে। তুমি যদি পিয়ের-এর বন্ধু হও, তাহলে···

ক্রিষ্টিনকে এই ক'দিন আর সহ্য করা যাচ্ছে না। একদিন সে মেয়েদের সুন্দর সুন্দর প্লাষ্টিকের বোতাম উপহার দিলে ; চোখে জল এনে সে বললে, মেয়েদের সে ভালবাসে। কিন্তু সেদিন রাতেই সে ভারিয়ার কাছে গিয়ে হাজির। সে তার পাউডারের কৌটো চুরি করেছে বলে তাকে বেধড়ক পেটালে। শেষে সেই কৌটো পাওয়া গেল তার নিজের ঘরে। কিন্তু এই বিশ্রী ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য গালোচকাকে ডেকে বললে,

এবার যেদিন ছুটি পাবে, একটু গান বাজনা কর না। আর সব ব্যারাক থেকেও মেয়েদের ডেকে আনতে পার। আমি আপত্তি করব না। গান করবে,··· কোনো মেয়ের জন্মদিনের উপলক্ষে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে।

গালোচকা অমনি জবাব দিলে,

বেশ তো !

সে মেয়েদের ডেকে বললে, এস লালফৌজ দিবসের উৎসব আমরা করি !

ভারিয়া বললে, ক্রিষ্টিন যে ক্ষেপে যাবে।

ও জানতেও পারবে না। আমরা যে ঐ উৎসব করছি, একথা বলব না। আমরা শুধু ঐ দিনটিতে গান-বাজনার আসর বসাব।

ব্যারাক ওরা সাফ করে নিলে। জলসা বসলো। কয়েকটা গানও গাওয়া হোল, ক্রিষ্টিন বসে বসে শুনলো, মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে তারিফও করলে। গানগুলি যেন শোকে ভরা, ওর মনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়েও গেল। তার মনে তখন এক ভাবনা ফুট কাটছে, আমি খুন হব, কেউ আমাকে এক ফোঁটা করুণা দেখাবে না।...

গালোচকা অন্য ব্যারাকগুলির মেয়েদের জানাতে চাইল, লালফৌজের অভিযান শুরু হয়েছে—রোজের তাকে সেদিন এ খবর জানিয়ে গেছে। তাই আবৃত্তি করলে,

এক আছে মানচিত্র, আর সে মানচিত্রে আছে
নোভগোরোদ, পুশকিন, লুগী, গাটচিনা
আছে গোভ্ শহর পেইপুস হ্রদের ধারে।
উৎসব চলছে এখন কিরোভোগ্রাদে
মজিরে, সার্নিতে—আরো বহুস্থানে।
সমিয়েলা, রোভনো, লুৎস্ক এখন আনন্দে মুখর;
এখন উৎসব চলছে ভিন্নিৎসার কাছে
শীগ্‌গিরই তো সে উৎসব শুরু হবে ওদেশায়।

মেয়েরা হেসে উঠলো। একজন আর খুশি চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠলো, আমার মা তাহলে এখন মুক্ত...

ক্রিষ্টিন বুঝতে পারলো না, কি হচ্ছে। মেয়েদের আনন্দোজ্জ্বল মুখ ওকে রাগিয়ে দিলে। এই ভয়ংকর মুহূর্তে ওরা এত খুশি হয় কেন? আনেচেনের ভাই নিজে একজন সৈনিক, তবু সে সেদিন রেল ষ্টেশনে ঝর্‌ঝর করে কেঁদে ফেললে।...গালোচকা ছুঁড়িটা কি ওদের আবার হাসাচ্ছে! ছুঁড়িটার তো ভারি আস্পর্ধা!

কি আওড়ালি তুই ?

জন্মতিথির কবিতা।

কার জন্মতিথি ?

কয়েকটি মেয়ে হেসে উঠলো, গালোচকা সোজা হয়ে জবাব দিলে,

আমার জন্মতিথি।

ক্রিষ্টিন বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখলে। সন্ধ্যেটা বেশ ভালোয় ভালোয় কেটে গেল, কিন্তু রাতে তার চোখে ঘুম এল না। ঐ ছুঁড়িগুলো আমাদের দুর্দশা দেখে হাসছে।···আর ওদের সঙ্গেই আমাকে ঘর করতে হচ্ছে···কি ভয়ানক ! বুকখানা যেন রাগে দুঃখে ফেটে যেতে লাগলো। দুদিন পরে বইলো ঝড়।

হঠাৎ ক্রিষ্টিন নাস্তিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নাস্তিয়া খোঁড়া, লাঠি ভর দিয়ে চলে। ওকে জার্মানীতে কেন নিয়ে আসা হোল কেউ বলতে পারে না। যখন মেয়েরা কাজে যায়, ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে যায় সবার শেষে। ক্রিষ্টিন চেঁচিয়ে ওঠে—এই ছুঁড়ি, জলদি ! নাস্তিয়া আস্তে আস্তে বলে, আমি তো জলদি চলতে নারবো। এমনি রোজই হয়। আজ হঠাৎ ক্রিষ্টিন তার লাঠি কেড়ে নিয়ে তাকে পেটালো। রাগে ক্ষেপে গিয়ে গালোচকা ছুটে এসে ক্রিষ্টিনের গালে এক চড় কসিয়ে দিলে।

গালোচকাকে গারদে পোরা হোল। অন্ধকার ডিগ্‌রীতে বসে সে ভাবতে লাগলো, পিয়ের সেরে উঠবে, লালফৌজ আসবে, আমরা আবার কিয়েভ-এ ফিরে যাব দুজনে···সে তো জানলনা কি আছে তার ভাগ্যে। জেলের প্রধান রক্ষী এসে চেঁচিয়ে জানিয়ে গেল, গালোচকাকে গুলী করা হবে। রক্ষিণী ঠাট্টা করে বললে, এখানে যে নিকেশ হওনি এই আপশোস তোমার থেকে যাবে···বেশি দিন ওকে গারদে থাকতে হোল না। ওকে ওরা নিয়ে গেল বধ্যভূমিতে। সেখানে বহু বন্দী ভিড় করে আছে। রোজেরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। হাতে তার হাতকড়া। সে তবু কোনো রকমে জানিয়ে দিলে,

আমি কিছুদিন আগে গ্রেফতার হয়েছি। ওদের এক উপরওয়ালাকে কষে গাল দিয়েছিলাম···পিয়ের ছাব্বিশ তারিখে মারা গেছে। মরার আগের দিন দেখা করতে গিয়েছিলাম, সে অনুরোধ করলে, দেখা হলে যেন তোমাকে বলি, তোমার কথাই সে ভাবে, সে বাড়ি ফিরে যেতে চায়। তারপরে জানালে, রুশরা একটা বড় শহর দখল করে নিয়েছে। কোন শহর—নামটা ভুলে গেছি···

গালোচকা জানলো না, মৃত্যুর মুহূর্তে পিয়ের বার বার তার নাম ধরে ডেকেছিল—শেষে জড়িয়ে গিছলো উচ্চারণ—তবু ফিসফিসিয়ে বলেছিল—গ্যালিওশকা···গ্যালিওশকা···

বাইশ

অধ্যাপক দ্যুমা ওলন্দাজ কোষ্টারকে বললেন, জার্মানদের আমি দ্বি-শাব্দিক জাতই বলব।

দেখনা হাইল হিটলার, য়ুডেন এরচিবেন—এমনি সব কথাই ওদের মূলধন—এরাই হচ্ছে নতুন জাতি! দশ বছরের ভিতরে এই জাত গজিয়ে উঠেছে। হাতে থাকবে রবারের খেটো, আর খাবে দাবে, হস্ত-মৈথুন করবে, নিজেদের ভাববে উপ-দেবতা, আর দু'কথায় নিজেদের স্বর্গীয় চিন্তাধারা ব্যক্ত করবে।

কোষ্টার উৎরেক্ট-এ চুরুটের ব্যবসা করতো। একজন ইহুদীকে বাড়ীতে ঠাঁই দিয়ে সে গ্রেফতার হয়েছিল। দ্যুমার দিকে তাকিয়ে সে তারিফ করে: সরবোনের একজন অধ্যাপক, কিন্তু যখন লোকে চেঁচিয়ে উঠবে ভয়ে, তখন তিনি কিনা ঠাট্টা-তামাসা করতে পারেন!···

লাঁসিয়ে যখন শুনলেন দ্যুমাকে জার্মানীর এক বন্দীশিবিরে চালান দেওয়া হয়েছে, তিনি নিজে গিয়ে নিভেলের সঙ্গে দেখা করলেন।

হ্যমা তো কমিউনিষ্টও নন, ইহুদীও নন। আর বন্ধু, আটষট্টি বছর বয়েসটায় তো আর এ ধকল পোষায় না! পুরানো দিন আর মার্সেলিনের দোহাই পেড়ে বলছি…

নিভেল জবাব দিলে, আমি এ ব্যাপারে অক্ষম। হ্যমা অসম্ভব বাড়াবাড়ি করছিলেন। উনি যখন আমাকে অপমান করেন, আমি ভুলে যেতেই চেষ্টা করেছি। কিন্তু সবাই তো আর এমন উদারচেতা নয়…তবে কোনো আশংকা নেই, ওরা ওকে হবাইমারে পাঠিয়েছে। ওই শহর তো গ্যেটের জন্মভূমি, চমৎকার জায়গা!

লাঁসিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মার্থাকে বললেন,

তাহলে হ্যমা খুব একটা খারাপ ভাবে নেই। ডাঃ মোরিলো সব ব্যাপারেই একটু রং চড়ান। লিওর হয়তো খুব দুঃখেই দিন কাটছে। ওর এমন বরাত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু উপায় কি বল! ওদের কাছে ও যে একজন অনার্য।…

লম্বা ব্যারাক, লম্বা চওড়া তার উঠোন। সেখানে লোকদের চাবুক মারা আর ফাঁসি কাঠে ঝোলানো হয়। তার উপরে কবরখানার চোঙগুলো উঠে গেছে। চিমনী দিয়ে ঝলকে ঝলকে উঠছে কালো ধোঁয়া।

ওরা এর নাম দিয়েছে—তিলে তিলে মৃত্যুর শিবির। এখানে বন্দীরা গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় না; ওরা খনি বা ভূগর্ভের গোলা-বারুদের কারখানায় খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, গ্রীষ্মে শীতে আমাশায়, ক্ষয় রোগে রক্ত হীনতায়, বা রবারের খেটো বা চামড়ার চাবুকে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ওরা চালান হয়ে আসে মিনস্ক, প্রাহা, বেলগ্রেড, পারী, অসলো, ভারসৌ থেকে—জার্মানদের দখল-করা শহরগুলি থেকে। ওরা কেউবা প্রতিরোধ-সংগ্রামী, কেউবা বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ, কেউবা কমিউনিষ্ট, কেউবা পাদ্রী—কেউবা অন্তরালের যোদ্ধা, পুরানো গাথার ভক্ত, ডিনামাইট দিয়ে কেউবা উড়িয়ে দিয়েছে সেতু, কেউবা কিছুই করেনি—ভবঘুরে হয়ে দিন কাটিয়েছে। ওদের মধ্যে জার্মানরাও আছে।

এই শাসন ব্যবস্থার ওরা শত্রু—ওরা অপরাধী—ওরা ক্ষ্যাপা মানুষ—নিরাশ সমর্থকের দলও আছে। ওরা সবাই কয়েদীর ডোরা-কাটা কোতা পরে, খেটে খেটে হয়রান হয়ে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। ঝঞ্চাবাহিনীর যুবকেরা তাদের পাহারা দেয়—আর দেয় ভীষণ সব শিক্ষিত কুকুর। যখন কোনো বন্দী মরে যায়, তাকে কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ওক আর পাইন গাছে ঘেরা গ্যেটের লীলাভূমি, যার উপরে শার্কের হুকুমে লিখেছিলেন নিভেল—সেখানে কালো ধোঁয়ার আস্তরণ ভেসে-ভেসে বেড়ায়—মানুষের মেদ পুড়ে পুড়ে যায়···

এও ভাল যে মারী দেখতে পায় না।—অধ্যাপক এক মরচে-ধরা পাত্রে আলুর চোকলার সুরুয়া নিয়ে খেতে বসে যান। এতো শুয়োরেরই খাদ্য! আবার দড়ি পাকান, পায়খানা সাফও করেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য হ্যমা এখনো পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন, ভেঙে পড়েন নি।

ওঁর শরীরের মজবুত কাঠামোটা এখনো ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, হ্যমার পরিবারের সবাই দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে তাঁর ঠাকুর্দা তো আবার সবার সেরা। নেপোলিয়ানের সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল, আর তিনি বিংশ শতাব্দীকে এক পাত্র শাম্পেন দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন। এক সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে বলেছিলেন, মেয়েদের পক্ষে আমি বুড়োই বটে, ওরা আর আমার দিকে ফিরেও তাকাবেনা, কিন্তু খবরের কাগজের পক্ষে এমন বুড়ো নই যে, আমার কথা কাগজে লেখা চলবে না। হ্যমা তো ফ্রান্সের প্রাচীন বনস্পতিদের মনে পড়িয়ে দেন। কিন্তু তাহলেও তিনি অনেকদিন আগেই ভেঙে পড়তেন, কিন্তু শেষটা কি হয় দেখার কামনাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ব্যারাকের মানুষদের তিনি ডেকে ডেকে বলেন, এখন মরা তো বাজে ব্যাপার। তার মানে তো হার মানা। যতদিন পর্যন্ত না এই দ্বি-শাব্দিক জীবরা না হারে, ততদিন টিকে থাকতে হবেই···

সব সময়েই তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, কিন্তু ঘুম চোখে তাঁর বড় কম। মাঝ রাতে

যখন কুকুর ডেকে ওঠে, তাঁর মনে পড়ে দূর অতীতের স্মৃতি। উনিশ শতক··· উচ্ছৃঙ্খল, আনন্দ—বিহ্বল বীরপ্রসবিনী পারী আর তার 'উপেক্ষিত কবি'র দল, য়্যানার্কিষ্ট, কম্যুনার্ডরা এল সিঁয়ে থেকে, ফিয়েকার আর দ্রেফুসবাদীর দল। পাস্তরের বক্তৃতা মনে পড়ছে, ঝোরের উদাত্ত বক্তৃতা, জোলা প্যাঁসনে নাকের উপর ঠেলে দিতে দিতে তরুণ ছাত্র দ্যুমাকে উপদেশ দিচ্ছেন। দ্যুমারা বস্তুবাদী উপন্যাস লিখতে তখন ব্রতী। তিনি বললেন, যুবক বন্ধুগণ, সাহিত্য প্রধানত হচ্ছে সত্যের দাস। দ্যুমা নিজের জীবনের আদর্শ করে নিয়েছিলেন যাঁদের, তাঁদের পথেই তিনি চলতেন! এরা ক্যুরি, বার্থেলো, মেচনিকও, বেক্লো; সারা জীবন ধরে তিনি জ্ঞানের বিজয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু জীবন্ত শব্দকোষের দলের জায়গা নিয়েছে দ্বি-শাব্দিক প্রাণীরা। মানুষ তার জীবনের দিন বাড়াবার স্বপ্ন দেখছে, অথচ তার চোখের উপর ভাসছে তিলে তিলে মৃত্যুর শিবির।··· দ্যুমা মুক্তির দিন দেখে যেতে চান—তা না হলে জীবন যে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, সে হবে এমন একখানা বইয়ের মতন, যার শেষ পাতাখানা ছিঁড়ে গেছে।

দ্যুমা প্রতিদিন প্রতিমূহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, একটুও নুয়ে পড়লে চলবে না। সবার সঙ্গেই তিনি ভদ্র ব্যবহার করছেন, কাপড় কাচার ব্যাপারেও পাকা হতে চাইছেন, কিন্তু তা অসম্ভব। নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষার কথা ভাবছেন। কোনো বই কাছে নেই এই তাঁর দুঃখ। তাই বহুদিন আগে যা পড়েছেন, তাই-ই মনে মনে আউড়ে নিচ্ছেন। প্যাস্ক্যালের কথাগুলি মাঝে মাঝেই আওড়ান :—মানুষ তো বড় দুর্বল, যেন শর গাছটি, কিন্তু সেই শর গাছ ভাবতে পারে···এক ফোঁটা জল তাকে হত্যা করতে যথেষ্ট, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি তাকে পিষেও ফেলে, তবুও মানুষ সেই হত্যাকারীর চেয়ে অনেক মহানই থাকবে। মানুষ যে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে, আর অন্ধ শক্তিগুলি তো তা পারে না। তাই, আমাদের সমস্ত সম্মান, সমস্ত গৌরব নিহিত রয়েছে চিন্তাধারায়···তিনি তার বন্ধুদের দুঃখ-দুর্দশায় সান্ত্বনাও দেন, তিনি জানেন কোষ্টারকে একটু চাঙা করা দরকার তাই তাকে মার্সেঈ-এর গল্প শোনান, চেক

ফ্রানৎসকে তিনি নৃতত্ত্বে দীক্ষা দিয়েছেন। পারীর হুক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্লাস দ্য ইতালী থেকে প্লাসদ্য এতোইল অবধি যত টিউব ষ্টেশন আছে, তার নাম আউড়ে যান. জটিল জীবনের উপযোগী যা কিছু সব তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন। ইরেস্তিয়ামানেয়েভ নামে একটি রুশ অফিসারও বন্দীশিবিরে আছে। সে হু-হুবার পালাতে চেষ্টা করেছে। হ্যমা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে রুশ ভাষা শিখতে লাগলেন। যৌথ খামারে দিন-মজুরি কত জেনে নিলেন, নেনসির রীতিনীতি, মস্কোর ব্যালে—কিছুই তাঁর অজানা রইল না। সব কিছুতেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের কৌতূহল। যুদ্ধের আগে দেলার তুলেঁ্যর কাছে খরগোসের কারবার করতো। হ্যমা তার কাছ থেকে খরগোসদের ক'রকম রোগ হয় তা জেনে নিলেন। এমন কি কোষ্টার যখন সুমাত্রার তামাক পাতার কথা বলে তিনি জীবনে চুরুট না খেলেও—তামাক পাতার গল্পেই মশগুল হয়ে যান। নিজের অন্তরের আনন্দে তিনি সবাইকে জীইয়ে রাখছেন। রিসচিন তো তাই বলে—শিবিরের এক প্রান্তে কবরখানা—অন্য প্রান্তে আছেন অধ্যাপক হ্যমা—তিনি জীবনেরই প্রতীক।

প্রথম বসন্তের একটি দিন ঘনিয়ে এল। সূর্য এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে, তবু ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে পাহাড় থেকে। ব্যারাকে যারা মারা গেছে, তাদের দেহ কবরখানায় নিয়ে যাবার হুকুম হোল হ্যমা আর কোষ্টারের উপর। হ্যমা মৃতদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওদের আনন্দ, রক্তস্রোত, জীবন, তিলে তিলে শুষে নিয়েছে ওরা। ওদের মধ্যে আছে ফরাসী, রুশ, সার্বিয়ার মানুষ, পোল— তামাটে আর সাদা মুখের সার—ওদের প্রায় সবাই-ই তরুণ।···হ্যমার হঠাৎ মনে হোল, তিনি বুঝি মূর্চ্ছা যাবেন···নাড়ি ক্ষীণ হয়ে আসছে ; মুখে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম···এমন সময় এরিক ছুটে এল। সে একজন জার্মান কমিউনিষ্ট—উনিশ শো একচল্লিশ সাল থেকে শিবিরে বন্দী। সে এসে কানে কানে বললে,

রুশরা রুমানিয়ায় ঢুকে পড়েছে !···

হ্যমার মনে হোল, জীবন আবার তিনি ফিরে পেলেন। ওরা যদি ভোলগা থেকে প্রুৎ অবধি এসে থাকে, তাহলে এখানে তো শীগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে। ওদের জন্যই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে…

এরিককে একদিন আনার কথা বললেন, তিনি বলতে চাইলেন, হাঁ, সেরা জার্মান আমি দেখেছি। এরিক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে,

আমাদের মতো লোকের সংখ্যা এখন খুবই কম…

হ্যমা আনাকে সান্ত্বনা দিতেন. এরিককেও তেমনি দিলেন,

এমনি লোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে। সব চেয়ে এখন বড় কথা হচ্ছে, তোমরা বেঁচে আছ…এখন তো আর এমন কোনো সীমান্তের বাধা থাকবে না, যাতে বিংশশতাব্দী কোথাও তার অধিকার কায়েম করবে, কোথাও বা থাকবে দশম শতাব্দীর অন্ধকার। যুদ্ধ এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। এই দ্বি-শাব্দিক প্রাণীর দল তো ঘায়েল হয়ে এসেছে। তার মানে কি জান, জার্মানরা আবার ভাবতে শিখবে…

হ্যমা হেসে উঠলেন। রুশরা আচ্ছা করে সাজা দিচ্ছে, কিন্তু এরিককে সে কথা বললেন না। এই একগুয়ে জার্মানটিকে তাঁর ভালো লাগলো, আপন মনে ভাবলেন, ওরা সংখ্যায় কম, কিন্তু যারা ভোটপত্র ব্যালেট বাক্সে ফেলে দিয়ে বাড়ি গিয়ে খেতে বসে—তাদের হাজার জনের চেয়ে ওদের এক জনের দাম তো ঢের বেশি। কমিউনিষ্টদের মনে শক্তি আছে। কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না, লোকটি কমিউনিষ্ট—দেখলেই চেনা যায়। ওরা নিজেরা সব সময়েই চাঙা আছে, বন্দী সাথীদের জন্য করেও খুব, নিরাশ কখনো হয় না—প্রথম যুগে খৃষ্টানরা ছিল এমনি—তখন গীর্জেয় গিয়ে মোম জ্বেলে কাজ সারতো না—বাঘের মুখোমুখি তাদের দাঁড়াতে হোত ক্রীড়াক্ষেত্রে…রুশরা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষ যখন নিজের আদর্শে বিশ্বাস করে, তখন তারা কতখানি করতে পারে।

ঝঞ্ঝাবাহিনীর হেগেনের মেজাজ ভাল নেই, সে খবর পেয়েছে, ডেপুটি-ফ্যুরার রুস

তাকে ফ্রান্সে পাঠাচ্ছেন। অবশ্য, ফ্রান্স তেমন বদখৎ জায়গা নয়, কিন্তু সবাই বলছে, গ্রীষ্মে সেখানে লড়াই শুরু হবে···

নাম ডাকা শুরু হোল। যারা অক্ষম বন্দী তাদের এক পাশে সারবন্দী করে দাঁড় করানো হোল। অধ্যাপক হ্যমা প্রথম সারের একেবারে ডান দিক ঘেঁসে দাঁড়ালেন। হেগেন তাঁর কাছে সোজা গিয়ে রবারের খেটো দিয়ে আঘাত করলো। হ্যমা একটুও নড়লেন না। হেগেন তাঁকে আঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলো,

টু'শব্দটি করছিস না যে? তোকে যে আঘাত করা হচ্ছে, তারও তোর বোধশক্তি নেই!

হ্যমা শান্তস্বরে বললেন, আমি তো আঘাতে ভ্রূক্ষেপ করি না। অনেক দিন বেঁচে আছি, অনেক ভেবেছি। অমন একটা তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দিয়ে কি হবে?

হেগেন তাড়াতাড়ি চলে গেল। সে ভাবলে, বুড়ো ক্ষেপে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই পাগলকে তার ভয়।

সেদিন রাতে কোষ্টার অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলো,

কি করে চুপ করেছিলেন?

ও যদি একশোবার আঘাত হানত, তা হলেও টু শব্দটি করতাম না। চীৎকার আমি করবো না —করতে চাই না। তিনশো বছর আগেই প্যাস্কাল একথা টের পেয়েছিলেন। তিনি তাই তো বলেছিলেন, ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু আমি যে ভাবুক—আমি তো তাই ওদের অক্ষম বলেই জানি।

তেইশ

চমৎকার দিন। কুঁড়ি-ধরা বাদাম গাছের দিকে তাকিয়ে লাঁসিয়ে আসন্ন বিষাদের কথা ভুলে যেতে রাজিই ছিলেন। কিন্তু খবরের কাগজ, বেতারবার্তা আর তার পরিচিতরা তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলেন। মিত্রশক্তি যে কোনোদিন

এসে নামতে পারেন। ওরা যখন নামবেন, জার্মানরা সবগুলো পুরুষকে ধরে বন্দীশিবিরে চালান দেবে···রাতদিন বোমাও পড়বে···মার্থা এমনি শান্তশিষ্ট মানুষটি, কিন্তু এখন তো মাঝেমাঝেই কেঁদে ওঠে। লাঁসিয়ে সাহস দেখাচ্ছেন, আবার ভাহ্ৰ্নের কথা মনে পড়েছে, বলছেন, যখন বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে ততো যুদ্ধটা তোমার কাছে ভয়ানক হয়ে উঠবে—যুদ্ধক্ষেত্র তো তার চেয়ে ভয়ানক নয়। কিন্তু তবু ভয় তো যায় না। ওরা যদি কালো তালিকায় আমার নাম তুলে দেয়? ওর এই শেষ মুহূর্তে আমাকে ফাঁসাতে পারে বই কি—ওরা বলে বসতে পারে, লুই আছে ইংলণ্ডে, মাদো কোথায় না কোথায় সন্ত্রাসবাদীর দলে ভিড়েছে, আমার আগের অংশীদার ছিল ইহুদী—আমি কমিউনিষ্ট এমন কি রুশদেরও বাড়িতে ভোজে ডেকেছি···এতেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলী করবার পক্ষে যথেষ্ট···কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর উদ্বেগ অন্য ব্যাপারে দেখা দিল। জার্মানদের তো লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে, তারপর যত পাজি রিভলভার উঁচিয়ে এসে বলবে: তুমি লিও আলপের্তের বখরা মেরেছ, এই হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে পয়লা অভিযোগ। দোসরা অভিযোগ, বার্তির মৃত্যু নিয়ে তুমি এক প্রবন্ধ লিখেছ। পিনাউদ আর জার্মানদের সঙ্গে মিলে কাজ করেছ—এই হচ্ছে তেসরা নম্বর অভিযোগ। ব্যাস, তারপরে ওরা আমাকে গুলী করবে···আঁরিয়োর বক্তৃতায় কেউ বিশ্বাস করতে না পারে, কিন্তু সবাই জানে, অর্ধেক মার্কিই হচ্ছে ডাকাত। আর অর্ধেক হচ্ছে ক্ষ্যাপা···লাঁসিয়ে ভয়ে কাবু হয়ে ভাবলেন, এখন যা হয় তাড়াতাড়ি হোক! দেরীটা যে আরো ভয়ানক! বাদাম গাছে ফুল ধরেছে, আসছে বসন্ত, কিন্তু আমি তো জানিনা ক'দিন আর বেঁচে থাকব···

পিনাউদকে এখন সয়ে গেছে। মানুষের সব কিছুই সয়ে যায়···সত্যি কথা বলতে গেলে, সবাই এখন জার্মানদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অবশ্য পিনাউদ আর রয়ের মতো লোক নয়! ভাল লোক, কিন্তু এখনো আদিম বর্বরতা যায় নি। সেই যুদ্ধের আগের দিনের বছরগুলি—করবেইয়ের সান্ধ্য ভোজ, লিওর হাসি ঠাট্টা, প্রথম রজনীর অভিনয়, শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনীর কথা—এখন তো লাঁসিয়ে সে

স্বর্গ থেকে বিচ্যুত। সে এক হারানো স্বর্গ। পিনাউদ কি ভালেরীর কবিতা বুঝতে পারবে? হয় তো, নামও শোনে নি···আমার কাছে জার্মানীর এই বিজয় তো এক জটিল বিয়োগান্ত সমস্যা ;—লুই যে চলে গেল, কত ব্যথা বাজলো আমার বুকে। কিন্তু পিনাউদ সবকিছুই বস্তুবাদীর চোখে দেখে! জার্মানদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করা সম্ভব—এই তার উক্তি।···পিনাউদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে বলে হয় তো আমার মৃত্যুও হতে পারে, কিন্তু টাকা ছাড়া তো অন্য কোনো সম্পর্ক তার সঙ্গে নেই···

এমনি ভাবনায় তলিয়ে আছেন এমন সময় পিনাউদ এসে হাজির। তার আসার পক্ষে এ অসময়। লাঁসিয়ে তাই অনুমান করে নিলেন, জরুরী কোন কাজেই সে এসেছে। কিন্তু পিনাউদের তাড়া নেই, সে আসন্ন অবতরণের গুজব নিয়ে নানা কথা বললে, পিঠে একটু ব্যথা হয়েছে তাও জানালে, তারপর এল চমৎকার দিনের কথা। লাঁসিয়ে চটে গেলেন: এত দেরী করছে কেন লোকটা?···

এক বছর হোল তারা অংশীদার, এখনো কোনো সংঘর্ষ বাধেনি। পিনাউদ লাঁসিয়েকে এখনো ছিটগ্রস্ত বলে ভাবে, তাই মাঝে মাঝে মুরুব্বীর স্বর তার কথায় ফুটে ওঠে। এতে লাঁসিয়ে ক্ষুব্ধই হন, কিন্তু আবার ক্ষোভ ভুলে যেতে দেরীও হয় না। ব্যবসার বাইরে তাদের দেখাশুনা খুব কমই হয়, পিনাউদ আজ হঠাৎ যখন বন্ধুত্বের কথা পেড়ে বসলো, লাঁসিয়ে একটু ঘাবড়েই গেলেন।

আমার তো মনে হয়, ক'মাসের ভিতরেই নানা অদল-বদল হবে। কিন্তু আমাদের কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না, আমরা দুঃখের দিনে দুজনেই তো এক-সঙ্গে ছিলাম···

আপনার কি মনে হয় ক'মাসের ভিতরেই কিছু একটা ওলট-পালট হবে?

হাঁ।

ডাঃ ভের্নেউল আপনাকে একথা বলেছেন?

না, এখন তাঁর সঙ্গে খুব কমই দেখা হয়,সত্যি বলতে গেলে, এখন আমাদের মত আর পথ আলাদা···

লঁাসিয়ে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, ভাবতো একবার, পিনাউদ তার নিজের জামাইয়ের সম্পর্কে একথা বলছে !···এ এক জবর ব্যাপার তো ! তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জার্মানরা এখন আচ্ছা বিপদে পড়েছে···

পিনাউদ বলে চললো,

আপনি তো জানেন, জার্মানীর এই দখল করাটা আমি অবশ্যম্ভাবী মন্দ বলেই ধরে নিয়েছিলাম, কিন্তু সয়তানকে সহ্য করা এক, স্বেচ্ছায় তার দাসত্ব করা আর এক কথা। ভের্ণেউল তো দাস, সে যে খেলা খেলছিল, তা সাঙ্গ হয়ে গেছে···

লাঁসিয়ে আর চেপে রাখতে পারলেন না,

কিন্তু আমাদের কি হবে? আমরা তো ভয়ানক অবস্থায় পড়েছি, জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য ওরা তো আমাদের ক্ষমা করবে না।

কারা ক্ষমা করবে না ?

এই সন্ত্রাসবাদীরা।···জার্মানরা যে নামে ওদের ডাকে, সেই নামেই ডাকছি। তার মানে মাকিরা—দেশপ্রেমিকরা—ঐ নামেই তো লোকে ওদের ডাকে।

পিনাউদ হাসলো,

ওদের কথা কি ধরতে আছে ! দেখছি, জাঁরিয়োর বক্তৃতা আপনাকে কাবু করে ফেলেছে। আপনি তো জানেন, কমিউনিষ্টদের আমি দেখতে পারি না। ওদের শত ভাল বললেও, বিপজ্জনক কল্পনাবিলাসী ছাড়া ওরা কিছুই নয়। কিন্তু ওদের ব্যবস্থা কায়েম করতে কে দেবে ? সুখের বিষয় যে, আমরা পোলাণ্ডে নেই। রুশরা এখানে ছুটে আসবে না। মার্কিনরা আসবে, তারা আপনার আমার মতো স্বাভাবিক মানুষ। জানি না, দ্য গল কি ভাবছেন, কিন্তু ওঁর দলে অনেক মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ আছেন। আপনার আমার মতো মানুষদের লোকে ভালো লোক বলেই জানে— হাঁ একথা আমি জেনেছি···নাম আমি বলবো না—জার্মানরা

এখনো পারীতে আছে···আপনাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যই বললাম, সতর্কও করে দিতে এসেছি···এটা উনিশ শো বেয়াল্লিশ নয়···আপনাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনার পরিচিতের দল থেকে কিছু ছাঁটাই করে দিন।

কিন্তু আমি···

জানি, রাজনীতিতে আপনার মন নেই, কিন্তু নিভেলকে আপনার বাড়িতে আমি দেখেছি। ও ভার্নেউলের মতোই লোক, ওর গায়েও এখন বদগন্ধ, ওর সঙ্গে দেখা না করলেই ভাল হয়। অবশ্য, সাবধানে করবেন···ওদের মতো মানুষরা শেষ মুহূর্তেও আপনার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। আপনি লোককে বড় বিশ্বাস করেন, তাই আপনাকে বন্ধুভাবেই একথা বলছি। সময় খারাপ···আসুন আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই, কোনো রকমে বেঁচে যাব···

পিনাউদ চলে যেতে লাঁসিয়ে ভাবতে বসলেন, লোকটার উপর অবিচারই করেছি। কিন্তু আসল বিপদ হচ্ছে, আমি একজন রসিক মানুষ। শিল্পের নেশায় পাগল। তাই মানুষের মুখ দেখেই তার চরিত্র বিচার করি। পিনাউদের উপরটা ব্যবসায়ীর, কিন্তু ভিতরে সে খাঁটি ফরাসী···

লাঁসিয়ের মনটা চাঙা হয়ে উঠলো, তিনি পুরানো বন্ধুদের আবার নিমন্ত্রণ করবেন ভাবলেন। ডাঃ মোরিলো, সাঁবা—এদের ডাকবেন রাতের ভোজে। তাদের নিমন্ত্রণ চিঠি দেবার সময় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, নিভেল এখানে থাকবে না। সাঁবা সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ নিয়ে নিলে, কিন্তু মোরিলোকে পেড়াপীড়ি করতে হোল। ইদানীং ডাক্তার বড় অসামাজিক হয়ে পড়েছেন। পিয়ের বন্দীশিবিরে মারা গেছে, রেনে বন্দী—এতেই তিনি যেন দলে পিষে গেছেন। তবু ভাল রেনের মিথ্যে ছাড়পত্র খাঁটি ভেবে তাকে পূর্ব-প্রুসিয়ায় চালান দিয়েছে। তিনি পিয়েরের মৃত্যুর সরকারী বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন। পরে একজন বন্দী অসুস্থতার জন্যে ছাড়া পায় ; সে এসে বলে, দেশে যাদের ফিরে পাঠানো হচ্ছিল, তাদের তালিকায় ছিল পিয়েরের নাম, কিন্তু তালিকাটা ছ'মাস ধরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। যুদ্ধবন্দী আরো বললে, মৃত্যুর আগে পিয়ের ভালোবেসেছিল একটা রুশ মেয়েকে—তারপর

সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তার বড় খাকি রুমালখানা দিয়ে চোখের জল মুছলো।

লঁাসিয়ে সাদাসিদে খাবার জোগাড় করেছেন, সঙ্গে আছে ক'বোতল পুরানো বোর্দ্যো। লঁাসিয়ে এখন বোর্দ্যোই পছন্দ করেন। বলেন, বারগণ্ডি ছোকরাদের জন্যে—উত্তেজনাময় অভিযান আর অক্ষত লিভারের জন্য এ মদ ভাল। কিন্তু যারা ষাট বছরে পা দিল, তাদের হৃৎপিণ্ড চাঙা রাখতে বোর্দ্যোর জুড়ি নেই।

আসন্ন গ্রীষ্মের উদ্দেশ্যে আসুন আমরা পান করি, সে গ্রীষ্ম তো ঝড় নিয়ে আসবে—লঁাসিয়ে বললেন।

গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি হোল, লঁাসিয়ে ভাবাবেগে উদ্‌বেল! আবার পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে মিলন হোল!…বেচারী মার্সেলিন আজ আর নেই। কে যুদ্ধে জিতবে—না—জিতবে, তা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না—কিন্তু সে তো আর ফিরবে না। ছেলেমেয়ের খবরও জানেন না। হয় তো মরেই গেছে! হ্যমা এখানে নেই; কি হোল তাঁর? নিভেলকে বিশ্বাস কি? ওতো স্বেচ্ছায় জার্মানদের তাঁবেদারী নিয়েছে…লিও হয় তো এ পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারে নি।

ঐ তো আলোর নিচে, ঐ কোনে ছিল তার বসার জায়গা…

লঁাসিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, আসুন যারা চলে গেল, তাদের স্মরণ করি… আমরা বেঁচে আছি—প্লাবনে যেন এখানে আর্ক ভাসছে—তাতে আমরা তিন জন…

মোরিলো এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন,

মারী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে এখনো বিশ্বাস করেনা যে হ্যমাকে বন্দীশিবিরে পাঠানো হয়েছে। সে সদর দপ্তরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, পেড়াপীড়ি করছে, একটা পুলিন্দা সে হ্যমাকে পাঠাবেই…কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন—না-মরে গেছেন কে জানে!

নিভেল তো বলে, তাঁর কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমি নিভেলের কথায় বিশ্বাস করি না। সে খুব খেলছিল, তার এবার লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল। মার্থা

স্বামীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে লাঁসিয়ে লজ্জাই পেলেন, হাঁ, ওকে আমি বিশ্বাস করতাম। ভদ্র বলে জানতাম। শিল্পকলা আমাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কি বলছি। সাঁবা তুমি বোঝ নি ?

না। নিভেল একটা বিকৃত অনুকৃতি মাত্র। আর তাছাড়া, শিল্পকলার উপর আমার শ্রদ্ধা নেই।

আমি তো ভাবতাম, ওরই পায়ে নিজেকে তুমি উৎসর্গ করেছ···

হাঁ, তা করেছি বটে, তবু আমি ঘৃণা করি। এমন কি প্রকৃত শিল্পও আমি ঘৃণা করি। আমরা দৈবজ্ঞ হবার ভান করি, কিন্তু কাজটা কি করি? গান করে যাই। কিন্তু অন্যে জোগায় সুর···

লাঁসিয়ে ভাবলেন, সাঁবা বোধ হয় অনেকখানি বোর্দ্যো টেনে বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তর্ক করতে তিনি চান না—সব কিছুই এখন এক মৃদু শোকের সুরে যেন ছেয়ে আছে—কিন্তু এ সুরে মাধুর্য তো রিন্ রিন্ করছে। লাঁসিয়ে তাই বললেন,

এই ঘরে তোমার আঁকা দৃশ্যচিত্র নিরাশার প্রহরগুলিতে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই তো মাদোর সেই বুনো ফুলের টব। সে কোথায় গেল?···হয় তো মারাই গেছে। লাঁসিয়ের স্বরে অশ্রুর রেশ। দেখ, দেখ, ঐ সূক্ষ্ম রঙের কাজ দেখ! না, বন্ধু—শিল্প পৃথিবীতে মস্ত জিনিস। যখন বলি, শিল্প আমাকে বিপথে নিয়ে গেছে, তার মানে তো সম্পূর্ণ আলাদা···আমি বহু জিনিসের বাইরেটা দেখেই বিচার করেছি। এ আমার এক মহা দুর্বলতা।···নিভেলকে শুধু কবি বলেই বিশ্বাস করতাম, সূক্ষ্ম অনুভূতিময় মানুষ বলেই তার উপর শ্রদ্ধা ছিল, বিসঙ্গত সত্যের রূপে একটা ভাবধারাকে প্রকাশ করতে সে পারে। কিন্তু এখন তো তার সে মহিমা খসে পড়েছে···পিনাউদকে তার বাইরের স্থূল ব্যবহারের জন্য অনুভূতিহীন মানুষ বলেই মনে করতাম—তাকে জীবজন্তুর ব্যাপারী বলেই মনে হোত। পরে দেখেছি, সে ধূর্ত, নিজের তাস সে খেলতে জানে, কিন্তু কখনো তো ভাবিনি যে তার মনটা উঁচু। এখন তো দেখলাম, সে একজন খাঁটি ফরাসী

দেশের মানুষ—মুক্তির পথ চেয়ে বসে আছে। আমাদেরই মতো বসে আছে। আজ সন্ধ্যেয় ওকে ডাকি নি তার কারণ—আমরা পুরানো মিতারা একসঙ্গে মিলতে চাই—অন্তরঙ্গ হয়ে আলাপ করতে চাই।

সাবা বললে, তাকে নিমন্ত্রণ না করে ভালই করেছেন।

মোরিলো হাসলেন,

পিনাউদ—খাঁটি ফরাসী? হা ভগবান। যদি তাই হয়, নকলটা কে—পাজীটা কে?

এক জার্মানদের আমলে যা টাকা করেছে, জীবনে তা পারে নি।

উপায় কি? সবাই তো আমরা এক নৌকোয় ভেসেছি···কিন্তু পিনাউদ ওদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। সে নিজে তো সব আমাকে খুলে বলেছে।

আমি হলেও অমনি ধারা বলতাম। এখন আমরা আছি উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালের মে মাসে। দু বছর আগে ওর মুখে অন্ত বুলিই ফুটতো। কিন্তু এখন হের্ সিমিডিট্ তার তোরঙ গোছগাছ করছেন, এখন হাওয়া খেলতে দিতে হবে ঘরে, বিছানার চাদরও বদলাতে হবে বইকি—কেন না, শীগ্‌গিরই তো মিঃ স্মিথ এসে হাজির হচ্ছেন। কি আমি ঠিক বলি নি?

অত্যাচারী আর মুক্তিদাতাকে তুমি একই দলে ফেলতে চাও?

আমি? না।···কিন্তু পিনাউদ তাই করবে···নোটের রঙ কি হবে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কি লাগে জানেন? আমি ওর চিকিৎসা করছি। ওর পাকস্থলীতে কি হয়েছে। কিন্তু সাবা বল তো, যাকে আমি ঘৃণা করি—তাকে আরাম করতে যাব কেন? আমি টোকা দিয়ে দেখি, ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিই, ওরা যখন আরাম হয়, আমারও আনন্দ হয়। হাঁ, হাঁ, ঐ পাজিটাও সেরে উঠুক—এই আমি চাই!

সাবা হাসলো,

অমন রোগীকে সারাতে যাবেন না। অন্য ডাক্তার তো বহু আছে।

তাহলে কার চিকিৎসা করবো? পিয়েরের? সে তো বেঁচে নেই···বুড়ো

হওয়া খারাপ, আর সবচেয়ে খারাপ—সেই বুড়ো বয়সে যদি আবার কোনো বিশ্বাস না থাকে···মাদাম লাঁসিয়ে, আপনার নার্শিশাস ফুলগুলো তো চমৎকার···

ডাঃ মোরিলো তাঁর মস্ত মুখখানা ফুলগুলোর ভিতরে গুঁজে দিলেন।

চব্বিশ

বসন্তের বর্ষাময় দিন। পৃথিবী যেন এখন অসমাপ্ত বলেই মনে হয়। হয় তো সৃষ্টির দিনে যখন ভূভাগ আর জল-ভাগের বিভাগ হয় নি, তখন এমনিই দেখতে ছিল। এই অক্লান্ত মানুষরা যেন কাদায় ডুবে আছে, কাদা যেন তাদের গ্রাস করবার ভয় দেখাচ্ছে। টেনে নিয়ে চলেছে কামান, গুলির বাক্স তাদের কাঁধে। জার্মান ক্যাপটেন কোনো কিছু জানবার আগেই বন্দী হোল। মিনায়েভকে সে জিজ্ঞেস করলো,

এমন পথে এগুচ্ছ কি করে?···

মিনায়েভ হাসলো ঃ

তোমরা বুঝি জান না, আমরা কাদাভরা রাস্তা খুব ভালবাসি। যখন শুকনো থাকে, তখনি আমাদের এগোনো মুশকিল। আমরা ভারি অদ্ভুত লোক···

ওসীপকে সে বললে, কি করে পাঁকে আটকে-যাওয়া জার্মান ক্যাপটেনকে তারা বন্দী করেছে। মিনায়েভ হেসে বললে,

ওকে বললাম, এবার সাফ সুফ হয়ে নাও, কিন্তু ও হবে না। ও বললে কি, এক বছরে এ কাদা যাবে না···ওরা বেশ আরামে লড়তে চায়, মোটরে পথে ছুটলো পদাতিক দল। ডানে নির্দেশ ফলক—ভারতের পথে। আবার আর একটা নির্দেশ ফলক এল—সম্পূর্ণ বিজয়। বিজিত দেশ দেখ, গান বাজনা, আমোদ-আহ্লাদ চলুক!

না থেমে এগিয়ে চললো ওরা, এগিয়ে চলতে আর ভালো লাগছেনা, তাই অমনি ধারা ছুটছে। কাদা, আসপেন ঝোপঝাড়, মাটির দেয়ালওয়ালা কুঁড়েঘর পার হয়ে ওরা ছুটছে। যে ধূসর বৃষ্টির ধারা পর্দা হয়ে ঘিরে আছে—তারই ভিতর দিয়ে দেখা যায় বার্লিন ; ছোটার শেষ করে দিতে চায়। বাড়ি থেকে আসছে চিঠি। তাতে কামনার আকুতি···আর তো ক'দিন পরেই পুরবে তিনটি বছর···মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে, তারই ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে ; আবার হয় তো বইছে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া। ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে, তবু শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে—ভাবছে—এবার কাপড় শুকিয়ে নেব ; কিন্তু আবার বৃষ্টি চেপে এল, ঘামের সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে মুখে, কাদা থেকে ঠেলে তুলছে কামান। আরো এগিয়ে চলেছে, উত্তেজনা নেই, নেশা নেই, আছে দৃঢ় এক ইচ্ছাশক্তির তাগিদ—আছে স্বস্তি। এ স্বস্তি তখন আসে, যখন মানুষ ভাবে তার দীর্ঘ দিনের কাজ শেষ হয়ে এল।

এক বছরে তেমন কিছু বদলায় নি। আগে আগে যেমন করেছে, এবারেও ওসীপ ঝোপঝাড়, গর্ত, জলা দেখে বেড়ালো, যদি শত্রুর আত্মরক্ষার প্রাচীরে কোনো রন্ধ্র আবিষ্কার করতে পারে। ঠিক একই ভাবে সার্জির স্যাপারের দল গাছের গুঁড়ি টেনে তুলে ছোট ছোট সাঁকো তৈরী করছে, ঠিক তেমনি স্বরে মানুষ আত্মা আনছে। ওলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আওড়াচ্ছে, রোসেট, এই আমার মিগ্‌নোনেট ফুল ! ঠিক সেই ভাবেই বিভাগীয় খবরের কাগজের পিটুগিন নিজের কবিতা আওড়াচ্ছে। ক্রাইলভ মানুষের দেহের ভিতর থেকে বার করছেন লোহার টুক্‌রো। জেনারেল জাইকভ মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ঠিক সেইভাবে গাল দিচ্ছেন। মানচিত্র নানা রঙের পেন্সিলের রেখায় ভরে উঠেছে। তিনি গজরাচ্ছেনও :—ওরা চাড়ুসকিনকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিলে, এদিকে আমাকেই মীলেৎসী দখল করতে হবে···তেমনি এগুচ্ছে বিরাট সেনাবাহিনী—এ যেন এক জাতি অন্য দেশে চলেছে আবাস খুঁজতে —যেন যাযাবর জীবন যাপন করছে তারা—একটা গোটা দেশের মানুষ যেন মার্চ করে চলেছে পথে বিপথে। কিন্তু গত গ্রীষ্মের পর বহু

পরিবর্তনও হয়েছে। তখন অগ্রগতি ছিল হঠাৎ উল্লম্ফনের মতো, লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে এগুনো মাত্র ; সবাই তখন ভাবতো, হয়তো রুদ্ধ হয়ে যাবে এ গতি—খন ? কিন্তু এখন অগ্রগতির প্রবাহ অবিরাম গতিতে চলছে, এ যেন দৈনন্দিন কর্তব্য। সবারই স্থির বিশ্বাস—ওখানে না পৌঁছে আমরা থামবো না। কিন্তু তবু এ অভিযান তো একরকম অসম্ভব, শক্ত। পা পাঁকে ডুবে যাচ্ছে, চোখ ক্লান্তিতে বোজা। সঙ্গীদের পাশাপাশি চলতে চলতে জেনারেল জাইকভ আপন মনে ভাবছেন : আমাদের ঘুম নেই, সত্যিই চোখে ঘুম নেই! আর ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছেন কাদা ঠেলে···

সার্জেন্ট গুবেনকভ আহত হোল ; সে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আবার লাইনে ফিরে এল। মিনায়েভ বললে,

হাসপাতালে চলে যাও। এটা উনিশ শো একচল্লিশ সাল নয়···

গুবেনকভের অঙ্কের নেশা আছে। তার টোক্ বইয়ে সে যেখানে যা পড়েছিল, লিখে রেখেছে—সে সব আশ্চর্য খবর। একটা বোতলে কত গমের দানা রাখা যায়, জুপিটার আর ভেনাসের মধ্যে দূরত্ব কত ; সে মোটামুটি সংখ্যায় খুশি নয়—যখন শোনে, কেউ বলে জায়গাটা অমুক শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে, অমনি সে বাধা দিয়ে বলে, তাতো নয়, সাড়ে এগারো কিলোমিটারই হবে! একদিন মিনায়েভ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা বলতো, তোমার মাথায় কগাছা চুল ? গুবেনকভ অবিচলিত স্বরে উত্তর দিলে, কমরেড, ও-গুলো এখনো গুনে দেখা হয় নি।

মিনায়েভ রেগে বলেছিল, হাসপাতালে কেন গেলে না ?

তা হয় না ক্যাপটেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে,

স্তালিনগ্রাদ থেকে এই গর্তে আমাদের সাহসী পল্টন মার্চ করে এসেছে এক হাজার চারশো বাইশ কিলোমাটার পথ, তারা এই জলায় এসে হাজির হয়েছে। বার্লিন আর সাতশো আশী কিলোমিটার দূরে।

একবার জার্মানরা তাড়াতাড়ি পিছু হটছে, আর একবার জোর বাধা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এবার বোধ হয় ঘুরে দাঁড়ালো দৃঢ় হয়ে ; কিন্তু এক সপ্তাহের উন্মাদনার পর আবার হঠাৎ পিছু হটতে লাগলো। বন্দীরা হতাহতের সংখ্যার কথা বলে, অফিসারদের নির্বুদ্ধিতার দোষ দেয়। মানুষের অসন্তোষ বেড়ে উঠছে, তবু জার্মানরা যুদ্ধ চালাচ্ছে প্রাণপণে। সাত নম্বর বাহিনীর এক অফিসার যখন জানালে, জার্মান বাহিনীতে চেতনার উদ্রেক হয়েছে. মিনায়েভ হেসে বললে,

কমরেড লেফটেনাণ্ট, আমার কিসের ভয় জান? ওদের চেতনার উদ্রেক হবার আগেই আমরা বার্লিনে পৌঁছে যাব।···

জার্মানরা সীলেৎসী রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এ হয়তো ওদের সামরিক পরিকল্পনা, অথবা ওরা হয়তো শত্রুর ক্লান্তির উপর ভরসা করে আছে। ছোট শহর সীলেৎসী, পাহাড়ের উপর শহরটি। সেখান থেকে জার্মানরা সমস্ত ভূভাগ দেখতে পায়।

জেনারেল জাইকভ ক্ষেপে গেছেন, যখন-তখন সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ফোন করেছেন, কোনো সম্ভাষণ না জানিয়ে দাবী জানাচ্ছেন, সীলেৎসীর কি হোল?··· ওসীপের উপরে শহর দখলের ভার। ডান দিকের ঢালটাই তার পছন্দ—এ জায়গাটা শুকনো, কামানগুলো ঠেলে তোলা যাবে। পাহাড়ের বাঁ দিকে আছে জলাভূমি—সেখানে ঝোপঝাড়। মিনায়েভকে এদিকে পাঠানো হোল, জার্মানদের সে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে স্থির লক্ষ্য থেকে। সকালে, তিনটি পল্টন শহরের পথে আক্রমণ চালালো। জার্মানরা ডানদিক থেকে আক্রমণ আশা করছিল, তারা জানতো, এই দিক দিয়েই আসা যায় শহরে। আমাদের পদাতিকরা যেই এল, অমনি এক ঝাঁক গুলী এসে পড়লো। চার-চারবার পল্টন জলাভূমির ভিতরে লুকিয়ে রইল। ঝোপঝাড় ঘন থাকায় তারা ছিল অদৃশ্য হয়ে, জার্মানরা ভাবতেই পারেনি যে ওখানে এক পল্টনের বেশি আছে। দুপুরের দিকে মিনায়েভ বুঝতে পারলে, লিওনিজ আর পলিশচুক বিপদে পড়েছে। ওসীপের সঙ্গে তার আর কোনো যোগাযোগ তখন নেই। সে কি আরিন্দা পাঠাবে? পাঠালে তো

তিন-চার ঘণ্টা নষ্ট হবে। তাই সে ঠিক করলো, এবার আমাদের পালা এল। ওদের এখন দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে—লাল আঁটালো কাদায় পা থেকে মাথা অবধি মাখামাখি। মিনায়েভ খাড়া পিছল ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলো তার সঙ্গীদের সঙ্গে। এক ঘণ্টা পরে, শহরের ভিতরে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

জেনারেল জাইকভ ওসীপের ছাউনিতে ছিলেন। যে মুহূর্তে রাইফেলের গুলীর শব্দ থেমে গেল, তিনি সীলেৎসীতে এসে ঢুকলেন। তার জীপ গাড়ির চাকা কাদায় বসে গেল। মিনায়েভকে দেখে তিনি হাসি চাপতে পারলেন না। ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাকে ঃ লাল মুখ, উর্দিতে কাদা। কাদা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এখন সিন্ধুঘোটকের ফাটা চামড়ার মতো দেখাচ্ছে। জাইকভ হাত বাড়ি দিলেন। মিনায়েভ বলে উঠলো,

জেনারেল, আমি বড় দুঃখিত, আমার এ হাত হাতই নয়, এদের বরং বাঁধাকপির ক্ষেত বলতে পারেন।

কিন্তু জেনারেল তার কাদামাখা হাতখানা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন,

তুমি জান কি, তুমিই এই অভিশপ্ত শহর সীলেৎসী দখল করেছ? কাল রাতে সর্বাধ্যক্ষ আমাকে ফোনে ডেকে বলেছিলেন, যারা বীরত্ব দেখাবে, তাদের খেতাবের জন্য আমি সুপারিশ করব, আর যদি দখল করতে না পার

একমাস পরে ওরা বিজয়ের উৎসব করলো। মিনায়েভকে দেওয়া হোল লেনিন-সম্মান। পৃথিবী এখন স্ফুটনোন্মুখ ফুলের সুগন্ধে ভরপুর, পাপড়ি তুষারের মতো উড়ে উড়ে পড়ছে।

খোলা জায়গায় তারা খেতে বসলো। নিরুপদ্রব দিন কাটছে, কামান-বন্দুক আনা হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রস্তুতি শেষ। সবার মনেই আনন্দ। তাদের সাথী পেয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান, এসেছে সুন্দর সন্ধ্যা, আসন্ন হয়ে এসেছে শেষের দিন। মিনায়েভের দিকে তাকিয়ে ওসীপের সেই স্তেপের টীলার কথা মনে পড়লো। তখন তো ভাবতেও পারি নি পোলাণ্ডের কাছে বসে খাব, হাসবো...

শুধু আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে ক'জন মাত্র আমরা বেঁচে আছি—এই যা দুঃখ···

কয়েক বোতল ফরাসী মদ আনানো হোল—এগুলি জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। মিনায়েভ এক ঢোক মদ খেয়ে বললে,

এর স্বাদ ভাল, কিন্তু জিভের উপরেই এ স্বাদ লেগে থাকে···

পলিশচুক মদ খেতে নারাজ, সে ভোদ্‌কা চাইলে,

এ মদে আমাদের চলবে না, এতো জল···

ওসীপ আর লিওনিজ বললে, তাদের ভালই লাগছে। শারিকভ কিছুই খেতে চায় না। শেষে সে বললে,

আমি মদ খাই না, তবে আজকে এই বিশেষ দিনে···

পুরো এক গেলাস ভোদ্‌কা ঢেলে নিয়ে সে এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

ওসীপ, মিনায়েভ, লিওনিজ, পলিশচুক, শারিকভ, ওলিয়া আর সম্পাদক চেলি···পরস্পর পরস্পরকে তারা জানে, একসঙ্গে মিলেমিশে আছে ; ওরা ক'পাত্র পান করে স্বপ্ন দেখতে লাগলো। যুদ্ধের পরে কি হবে তাই নিয়েই কথাবার্তা চললো। ভবিষ্যৎ তাদের কাছে এপ্রিলের সন্ধ্যার মতোই উজ্জ্বল। পলিশচুক স্বপ্ন দেখলো, সে আবার তার নিজের কাছে ফিরে গেছে—যে কাজ সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে - তাই করছে। সে নিয়েঝিনে অঙ্কের শিক্ষক ছিল। চেলি ভাবল, যুদ্ধের পরে একখানা মস্ত বই লিখলে কেমন হয়ে—একখানা উপন্যাস কি স্মৃতি-কথাই লিখবে। শুধু তার ভয় ছিল, সে ক্ষমতা বুঝি তার নেই। তাছাড়া অন্যে আগেই লিখে ফেলবে। কিন্তু এখন তো আর ভয় নেই। তার স্থির বিশ্বাস, সে সে সুন্দর করেই লিখবে। যারা পড়বে, তারা হাসবে আর কাঁদবে। লিওনিজ তার তরুণী স্ত্রীর কামনায় অধীর, টিবলিসির আলো জ্বলছে জোনাকির মতো।·· আর বইয়ের কথা? লড়াই যখন বাঁধে, তখন তো সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

মিনায়েভ বললে,

মা কত যে খুশি হবেন! কিন্তু বড় কড়া মানুষ। আমাকে চিঠি লিখবেন, অতো গর্ব কোরোনা! টীলায় চড়েছ বটে, কিন্তু গড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ!...

সে ভাবছিল, মাকে কি করে দু হাতে জড়িয়ে ধরবে, ওলিয়েঙ্কাকে কি করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। মা হয়তো বলবেন, এবার নাতি-নাতনীর পালা...

শারিকভ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। নিজের কাজের উপর তার অনুরাগও খুব। কিন্তু এখন কি কারণে যেন. যুদ্ধের পরের প্রথম ভোরের ছবিতে যন্ত্রের গর্জন ভেসে উঠছে না। তার ভোরের ছবিতে ভেসে উঠছে নদী-তীর, মাছির ভনভনানি। কবিতা সে জীবনে পড়েনি ; কিন্তু এখন যেন কাব্য তাকে এসে ভর করেছে ; কি মধুর এই নিস্তব্ধতায় কান পেতে থাকা। সে কান পেতে থাকবে, শুনবে নিস্তব্ধতার সুর সপ্তাহ ধরে। নিজেকে সে এক সপ্তাহ তারই মাঝে ডুবিয়ে রাখবে...

ওসীপের স্নিগ্ধ হাসি। হাসি তামাসায় সে মসগুল। পলিশচুকের ইস্কুল থেকে তার ভাবনা এখন ছুটে গেছে মার কান্নায়। নিজের তার কোনো স্বপ্ন নেই। একমাস হোল রায়ার পল্টনের অধ্যক্ষের চিঠি পেয়েছে, তিনি জানিয়েছেন রায়া নিহত। কাউকে সে বলে নি. মিনায়েভকেও না। তাকে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু গলায় যেন বেঁধে গেছে কথা। রায়াকে যখন সে বুঝলো, জানলো রায়া তার জীবনে কতখানি, তখনি সে অন্তর্হিত হোলো। কিয়েভ দখলের পরে সে যে চিঠি লিখেছিল, সে চিঠি রায়া পেয়েছিল কিনা তাও সে জানে না। তাদের দেখা হবার কথা ছিল, তারা বলতো কত জরুরী কথা – কিন্তু মৃত্যু এসে বাধা দিলে। যখন সে একা থাকে, ওসীপ রায়ার ফোটোর দিকে তাকিয়ে সময় কাটায়। রায়া রেঝেভ থেকে পাঠিয়েছিল ফোটোখানা। তোমার কাছে আমি তেমনিই আছি—কিয়েভ-এর রায়া। কখনো বা সে ভাবে, দুঃখ যেন এল শান্তি হয়ে। সে সুখ কাকে বলে জানতো না, সত্যিকার রায়াকে সে দেখেনি, সে ছিল কঠিন কঠোর মানুষ। এমন কি তার মাও তাকে ভয় করে চলতেন...কিন্তু এতো

যুদ্ধ—রায়া সৈনিকের মৃত্যু বরণ করেছে। মেজর লিখেছেন—সে বীরাঙ্গনার মতো লড়াই করেছিল···দীর্ঘ—দীর্ঘ যুদ্ধ।—এ যুদ্ধ এই বিশ্বযুদ্ধের আগেই শুরু হয়ে ছিল, তাই তো সে সময় পায়নি···এখন তো নিজের মনকে সে চিনতে পেরেছে··· হয়তো গত গ্রীষ্মের আগে সে জীবনকে উপভোগ করে নি বলেই মনকে বোঝেনি। তখন তারা পশ্চিম দিকে এগুচ্ছিল, মন সুখের কামনায়, উষ্ণতার কামনায় তখন অধীর। সে অধীরতা রায়ার জন্যে। ···এখন তো কিছু নেই—শুধু বাবী-আর-এর বালি আর স্মোলেনস্ক-এর কাছে একটি সমাধি। এখন তার সমস্ত স্নেহ পল্টনে কেন্দ্রীভূত। পল্টন যেন তার পরিবার। তার মনে হয়, মিনায়েভের মা যেন হানা, ওলিয়া যখন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে মিনায়েভের খুনসুটিতে, তার মনে পড়ে রায়ার কথা। যখন যুদ্ধ শেষ হবে, এসবও শেষ হবে···কিন্তু ওসীপও আর সবার মতোই উন্মুখ অধীর হয়ে আছে অবসানের দিনের জন্য—দুঃখ, ক্লান্তি, আর অন্তের আশা আকাঙ্ক্ষা দাবী জানাচ্ছে—তাড়াতাড়ি শেষ হোক যুদ্ধ !

শারিকভ মন্তব্য করলে কথায় কথায়, এই গ্রীষ্মেই বোধ হয় শেষ হবে।

পলিশচুক জবাব দিলে (তার বিশ্বাস শীতেই শেষ হবে যুদ্ধ, কিন্তু সে তা বলতে চায় না। মনে আছে কুসংস্কার)

···এইটাই শেষ হবার আগের গ্রীষ্ম।

ওসীপ হঠাৎ হেসে উঠলো !

মিতিয়া, তোমার মনে আছে, যখন তুমি বিশ্বাস করতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়েছে ? বড় দুঃসময় ছিল তখন। স্তেপ···আমরা সেখানে···

মিনায়েভ জবাব দিলে, আমি প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম ওরা সত্যিকার ভদ্রলোক।·· এখন ওরা সেই যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করতে বাধ্য—নইলে যে ওদের সমূহ বিপদ—হয়তো সুযোগও হারাতে পারে···মা যেমন বলেন, খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তারপরে এল রাই সরষে—এও যেন তেমনি···

ওরা আসুক না আসুক, আমরা শীগ্গিরই সব শেষ করে ফেলব, ওসীপ বললে,

এ ব্যাপারেও পান চলতে পারে। যারা আমাদের দিশী জিনিস চায়, খাক, আমি একটু কাসই (একরকম রুশ মদ, এতে উগ্র নেশা হয়না) খাব···

পরদিন ওসীপ একটা গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। সে দেখলে এক কুঁড়ে ঘরের সামনে সার্জেণ্ট নিকিটেঙ্কো একটি সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওসীপ হাসলো !

নতুন আলাপী জোটালে বুঝি ?

না, না, কমরেড মেজর !···আমার বৌকে খুঁজে পেয়েছি—যুদ্ধের ঠিক আগে সে আমাদের বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে বোনের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল। ওতো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি। নাম ধরে ডাকলাম, তবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমি যেন পরলোক থেকে এসেছি আর কি !

মেয়েটি সার্জেণ্টের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর প্রদীপ্ত চোখ, চোখের পক্ষ্মে চক্‌চক্ করছে জল।

সে বললে,

মেজর আমার বাড়িতে আসুন—আমার মেয়েকে দেখুন এসে !

বাচ্চার পাঁচ বছর বয়েস। কয়েকটা কার্তুজের খোল নিয়ে খেলা করে ওসীপ তাকে কোলে তুলে নিয়ে চারদিকে নেচে নেচে বেড়ালে। এমনি সে করতো আলিয়াকে কোলে নিয়ে। ওকে সে একটা রূপকথা শোনালে, কিন্তু মাঝখানে গেল ভুলে। কিন্তু মেয়েটি হাঁ করে শুনছে, তন্ময় হয়ে গেছে। ওর বুকের তকমা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আর বলছে :

এই তো সুয্যি···এই তো তারা···

একা ধুলোভরা উত্তপ্ত পথে ঘুরে বেড়ালো ওসীপ, মুখে তার হাসি। আনন্দের চেতনা এসেছে তার, এমন অনুভূতি তো আগে সে উপলব্ধি করে নি। হয় তো অন্যের সুখেই আজ তার হাসি যেন আরো মধুর, তার শান্ত চোখ যেন আরো উজ্জ্বল।

রাতে জেনারেল তাকে ডেকে বললেন,

আমরা বাইলোরুশিয়ায় তৃতীয় রণাঙ্গনে বদলি হলাম। ওদের এবার আমরা এমন আঘাত হানব, ওরা আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

পঁচিশ

বসন্ত আবার জেগে উঠলো তার রিক্ততা থেকে। এমনি জাগে ফ্রান্সের বন। এমন বুঝি আর সে জাগেনি। শুধু কোকিলের স্বর নয়, নানা স্বরগ্রামে কুহুতান তুলেছে কত পাখী ; মানুষের স্বরেও মুখর। বীর সংগ্রামীদের দলে যোগ দিতে রোজ আসছে কতশত মানুষ—বীর সংগ্রামীদের দুঃখের দিনের এই আশ্রয়ে। শহরে এখন গ্রীষ্মের খরা নেমেছে, মাঝে মাঝে বজ্র বিদ্যুৎ আর ঝড়। মানুষ ফিসফিসিয়ে বলছে আসন্ন অবতরণের কথা। জনসাধারণের উপর জার্মানরা এর শোধ তুলবে—সেকথাও শোনা যাচ্ছে। ছোট ছোট ইশতেহারে ভরে গেছে দেয়াল—যেন সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ আর কি! আর মাকিদের কাছে ট্রাকের পর ট্রাক আসছে। তাতে মজুর, দোকানী, ডাক্তার, আমীন, আঙুর চাষী আর ছাত্রদের ভিড়।

দিদে যে দলের অধ্যক্ষ তারা এপ্রিলে শেষ আক্রমণের তোড়জোড় করছিল। প্রধানকেন্দ্র থেকে হুকুম এসেছে, যখনি অবতরণের সংকেত আসবে, জার্মানদের যান-বাহন-ব্যবস্থা পঙ্গু করে দেবার সবরকম ব্যবস্থা করতে হবে। দিদে আর ভালুক তিরিশটা জায়গা ঠিক করে রেখেছে, ওখানে আঘাত হানা সহজ হবে। সবকিছু দেখে শুনে ভোরনভ বললে, ফ্রিৎসদের একহপ্তা যাবে এগুলি মেরামত করতে।

সারা মে মাস ধরে সংগ্রামীরা অভিযান চালাচ্ছে, লিমোসে তারা শখানেক গ্রাম মুক্ত করেছে। এখনো তাদের একমাত্র অসুবিধে হাতিয়ারের। হাতিয়ার খুবই কম।

নিকোল খবর নিয়ে ফিরে এল। ভালোমন্দয় মেশানো খবর।

ক'দিনের ভিতরেই ওরা নামবে। গুস্তাভ আমাকে সংকেত জানিয়ে দিয়েছে। লণ্ডন থেকে বেতার মারফৎ এ সংকেত জানানো হয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে সৈন্যরা যাতে স্থানান্তরিত হতে না পারে সে ব্যাপারে বাধা দেওয়া। হাতিয়ারের কথা যদি ধর—খুব খারাপ খবর। এক আবেদনে স্পষ্ট জানিয়েছে যে, লণ্ডনবাসীরা প্রতিরোধ সংগ্রামীদের হাতিয়ার সরবরাহ করতে নারাজ। গুস্তাভের মনে হচ্ছে, এর মধ্যে উপরওয়ালাদের কারসাজি আছে···আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরের প্রতিনিধি ভাওবাঁকে বলেছে, আমরা তোমাদের সরবরাহ করব, তবে এফ, টি, পি-দের নয়—ওখানে বড় বেশি কমিউনিষ্ট···

দিদে হেসে উঠলো,

আমি ভাওবাঁকে চিনি। সে কলেজের অধ্যাপক। সোশালিষ্ট। সবই তো পরিষ্কার বোঝা গেল। জার্মানগুলোর দিন শেষ হয়ে এসেছে, তা না হলে এই ভদ্রলোকেরা এত সরল হতে পারতেন না। ···যাই হোক, আমাদের যা সাধ্য তা করবো।

মাদোর সে সন্ধ্যার কথা বেশ মনে পড়ে। দিদে ভালুকের সঙ্গে কথা বলছিল। সে এক কোনে বসে খাচ্ছিল বুনো জাম। ভারি টক! ভালুক তার কাছে এগিয়ে এল। বহুদিনের তারা বন্ধু। ভালুক এখন অনর্গল ফরাসী ভাষা বলে যেতে পারে। মাদো তাকে প্রায়ই রাশিয়ার কথা জিজ্ঞেস করে, সেও উত্তর দেয় উৎসাহে। ভালুকের মনে হয়, কথাগুলো যেন গিলে খাচ্ছে মাদো। শেষ হয়ে এল দিন—তাই চরম দুখের দিনের কথা ভালুকের মনে পড়লো। তখন উনিশ শো বেয়াল্লিশের গ্রীষ্মকাল। ডনের তীরে তারা। সার্জির সঙ্গে সে আলোচনা করছিল, যখন তারা ফিরে আসবে—কোথায় কোথায় গড়বে সেতু। এর আগে বহুবার মাদোকে সে বলেছে পশ্চাদপসারণের গল্প, কিন্তু সার্জির নাম এই সে প্রথম বললে। ক্যাপটেন ভ্লাসভ ছিলেন তার সঙ্গে। মাদো বহু কষ্টে চেপে রাখলো চীৎকার, শুধু বললে,

ওর আসল নামটা কি ?

উত্তেজিত হয়ে মাদো ঘাস ছিঁড়তে লাগলো।

কেমন দেখতে ?

ভোরোনভ হেসে উঠলো।

সে কথা আমি বলতে পারবনা বাপু।···ওসব মেয়েদের ব্যাপার···তবে সুশ্রী, লম্বা, রং ফরসা···চেহারার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

সবুর কর ! আগে বল তো—আমি যার কথা ভাবছি সে কি না ? ও যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মাথাটা হেলিয়ে দেয়—এই এমনি করে—দেখছো তো ?

হাঁ। তাহলে তুমি তাকে চেন। অদ্ভুত কিন্তু !

অদ্ভুত কিছুই নয়। ও পারীতে ছিল, সেখানেই দেখা হয়।

পারী সম্বন্ধে ও একেবারে পঞ্চমুখ। খুব ভালবাসে।

এখন ও কেমন আছে ? বুড়িয়ে গেছে নাকি ?

তুমি তো হাসালে ফ্রান্স। আমি কি করে জবাব দেব ? আমি লড়াইয়ের আগে তাকে কখনো দেখি নি। তবে আমার চেয়ে অনেক ছোট। ও বলছিল, ওর বৌ আছে, সন্তান নেই। দলের কর্তা হিসেবে চমৎকার, আর সাথী হিসেবে তো বটেই !

···ভালুক ভেবে পেলে না, কেন এত খুশি হয়ে উঠলো মাদো। সে হেসে হেসে ছুটে এসে একটা ডেইজি তার মিলিটারি টুপিতে এঁটে দিয়ে বললে,

ফুল মাথায় ভালুক !

দিদে এবার ওদের ডাকলো। আর্থারের দলে যেখানে আছে সেখানে ছুটলো ওরা।

একটা রেলের সেতু ওড়াতে হবে।

মাদো হাসছেই। সত্যি-এ যেন জাদুর খেলা ! জাদুর খেলা ! আমার কেন যেন মনে হোত, ও বেঁচে আছে···(ওর মনেই হোল না যে, ভালুকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর ওতো মারাও যেতে পারে, এরই মধ্যে যে স্তালিনগ্রাদ,

আর কাক্স-এর যুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর আবার অভিযান শুরু হয়েছে না। ওকথা তার মনেও হোল না। তার মনে হোল, সবে কাল যেন সে পেয়েছে সার্জির তার।) ওর কথা মনে পড়ে মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো। ওর থেকে আলাদা জীবন কাটাচ্ছে সে। আছে বহু বহু দূরে। কিন্তু তবু কত কাছে, কত প্রিয় সে! বাদাম গাছের নিচে পাশাপাশি ওরা বসেছিল সেদিন, তার চেয়েও যেন আজ কাছে আছে।···ও ঈর্ষিত হোল না, সে বিবাহিত শুনে ব্যথা পেল না। এক মুহূর্ত ভাবলে, কেমন বৌ ও পেয়েছে? ভালো মেয়েই হবে··· আবার সার্জিকে ঘিরেই তার ভাবনা শুরু হোল। যখন ভালুকের সঙ্গে সে স্তেপ পার হয়ে চলছিল, তখনো পারীর স্মৃতি ছিল তার মনে। আর মাদো ছিল সেই সুদূরের শহরের এক অংশ—একটা যেন পুরানো সড়ক, অথবা মেলার যেন এক নাগর দোলা, অথবা লুক্সেমবর্গ বাগিচায় দুষ্টু ছেলেমেয়েরা যে খেলনা জাহাজ ভাসায়—তেমনি এক স্মৃতি। সময় অক্ষম এ স্মৃতি মুছে ফেলতে—অবাকই লাগে! আর বিশাল বিস্তৃতিও তো অক্ষম। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, আর হয় তো আমাদের দেখাই হবে না, দেখা হওয়া উচিত কিনা কে বলবে! হয় তো নয়। কিন্তু এখন তো দেখা হয়ে গেল! ওকে আমি জড়িয়ে ধরেছি, বনের ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলছি, প্রিয় শোন, এ তো বাদাম গাছ নয়, ওক। এ তো সে গ্রীষ্ম নয়, সে মাদোও তো নেই তোমার পাশে।

আমার নাম ফ্রান্স। বহুদিন ইজেল দেখিনি, তুলি ছুঁই নি। এখন বন্দুক ধরি, ওরা বলে, লড়িয়েও আমি ভাল।···কিন্তু এসব তো কথা নয়। আমি তোমার মাদো। আমি যে তখন শিল্পী ছিলাম, তাতে কি এল গেল! আবার যে দেখা হোল, এইটেই তো আসল কথা। আবার পরস্পরকে আবিষ্কার করলাম। একটা নক্ষত্র আবিষ্কারের চেয়েও এ বড় ব্যাপার, একটা দ্বীপ আবিষ্কারের চেয়েও···সার্জি, যা হয়ে গেছে, তাতো আর মুছে যাবে না। আমার ভালবাসা তো তেমনি আছে।···

তুমিই আমাকে রক্ষা করেছ। হয়তো তুমি নও, তুমি তো চলে গেছ।

তোমার প্রতি আমার ভালোবাসাই করেছে। কিন্তু সে তো একই কথা।… তুমিই আমাকে এনেছ এই বনে…আমি তো এ মত, এ পথ ছাড়তে পারবো না—এতো এক আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন আশ্চর্য ব্যাপার হোল, ভালুক আমাকে তোমার নাম বললে, সে তো না বললেও পারতো; ছ'মাস তো বলেনি। অন্য দলের সঙ্গেও তো ওর যোগাযোগ হতে পারতো।…এ এক আজব কাণ্ড! এও এক আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি এখনো আছ আমার কাছে! এই ডেইজি ফুটে আছে, সে তো তোমার। নিজের ভাগ্য আর গনি না। আমি তো জানি কি আছে ভাগ্যে। পার্থিব দিক থেকে দেখলে, সুখ তো আর পাবনা, কিন্তু তবু তো সত্যিকার সুখ আমি পেয়েছি। এখন তো তা জানি, আর চিরদিন ধরে এই কথাই জানব। ওগো আমার সার্জি, আমি তো জেনেছি সুখ—সে সুখ যেমন বিরাট, তেমনি তিক্ত, কঠোর আর পবিত্র।

দিদে আর ভালুক সন্ধ্যে হতে ফিরে এল। রেডিয়ো-অপারেটর মেয়েটি ওদের প্রতীক্ষায় ছিল।

আমি একটা সাংকেতিক খবর ধরেছি। সবুজ বাগানে আছে এক মস্ত গাছ… দিদে বলে উঠলো,

সব জায়গায় সংকেত পাঠাও—রেলপথ আর সাঁকো ওড়াতে হবে। আর্থারকে প্রথমে খবর দাও। সবাইকে তৈরী থাকতে বল…

সে ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়ে ভালুককে বললে…

কাল ওরা নামবে… এই তো সময়…

দলের সবাই জানলো, হাতিয়ার ধরবার নির্দেশ এসেছে। মাদোর মুখে হাসি—এ এক আশ্চর্য দিন! আজ তারিখটা কি? পাঁচই—মনে রাখতে হবে তো…

মিকিকে পাঠানো হোল আর্থারের পল্টনে। পথে বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সে গান ধরলো:

আমরা তো থাকতে চাই তোমাদের সাথে
কিন্তু এমনি ভাগ্যের নির্দেশ

আমাদের যেতে হবে মৃত্যুর মুখে
প্রথম মোড়গ ডাকার আগেই।
অন্য সবাই সূর্যকে জানাবে সম্ভাষণ
হাসবে, পান করবে গাইবে,
হয়তো বা ভুলে যাবে একথা—
আমরাও ভালবাসতাম জীবনকে,
আমরাও হাসতাম।...

নিচে উপত্যকা এখনো ভোরের কুয়াশায় ঢাকা। সেখান থেকে এল অস্ফুট গর্জন—দূরাগত বজ্রের নির্ঘোষের মতো! ভ্যালো-পারী রেলপথের সাঁকো উড়ে গেল—তার ইটকাঠ আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়লো।

ভোরে এল আর্থার। তার দলকে জার্মানরা ঘেরাও করেছিল। শুধু সে একাই পালাতে পেরেছে।

মিকি তিনটেকে গুলী করে ; তারপর সে নিজে নিহত হয়...সাঁকোটা গেছে।
